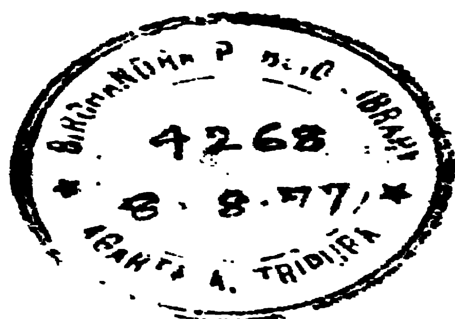
কয়েদখানা

প্রলয় সেন



সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫/৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

KAYEDKHANA
A Bengali Novel
by
Pralay Sen
Rs. 12·00

প্রথম প্রকাশ :
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
১৫।৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ :
সুনীল গুহ

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ রায়
সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫১, কামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

॥ বারো টাকা মাত্র ॥

উৎসর্গ

শ্রীজয়ন্তী সেনগুপ্ত

প্রিয়তমাসু

এই উপন্যাসের যাবৎ ঘটনা ও চরিত্র লেখকের কল্পনাসৃষ্ট। নিছক আখ্যান-ভাগকে অন্তরঙ্গ করে তোলার উদ্দেশ্যেই একটি পরিপ্রেক্ষিতকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এই লেখকের :

তালপাতার বাঁশি

পটভূমি

সীমাবর্গ

এক

বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে সবে এসে মাঝের ঘরে বসেছে প্রিয়তোষ। এমন সময় সুহাসিনী এলেন।

মাঝের ঘরে মা বাবা আর রেখা থাকে। এবাড়িতে সকলের আগে ওঠে ললিতমোহন আর সুহাসিনী। খবরের কাগজটা তাই সকালের দিকে এঘরেই থাকে। খুটিয়ে খুটিয়ে কাগজ পড়াটা ললিতমোহনের প্রাতকৃত্যের একটা অঙ্গ।

নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে প্রিয়তোষ। কাল রাতে অবশ্য বারোটার পরে কোন কাজই করতে হয়নি। কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিদ্যুতাভাবে। হালআমলের চলতি কথায় যাকে বলা হয় লোড শেডিং।

একাত্তর সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়। এবার বছরের গোড়া থেকে জোর বর্ষা হওয়ায় রাতের দিকে অল্প অল্প ঠাণ্ডা পড়ে। কারখানা বেহালায়। ফাঁকা জায়গায়। দুটো টেবিল জড়ো করে তোফা ঘুমিয়েছিল প্রিয়তোষ। রাত সাড়েএগারটা থেকে পরের সিফ্‌ট শুরু হবার আগ্‌ পর্যন্ত। অর্থাৎ সকাল ছ'টা অব্দি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ -এর মধ্যে ইলেকট্রিক আসেনি।

কারখানার ক্যান্টিনে পরপর দুবার গরম চা খেয়ে ঝরঝরে হয়ে উঠেছিল প্রিয়তোষ। ফলে, অন্যান্য দিন, নাইট ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার সময় যে ক্লান্তি শরীর আর মনের ভেতর জেঁকে বসে—আজ সেটা ছিল না। সুহাসিনী বলব না বলব না করেও বলে ফেললেন, একবার থানায় যাবি নাকি প্রিয়। অনুর যদি কোন খবর থাকে—

অন্যদিন হলে প্রিয়তোষের গলায় সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি ঝরে পড়ত। আজ কোন শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য নেই। অবসাদ নেই। সকালটা

শুয়ে গড়িয়ে আলসেমিতে কাটিয়ে দেওয়া ছাড়া হাতে কোন কাজও নেই।

প্রিয়তোষ তবু বলল, এইতো, গত রোববারও একবার থানায় গিয়েছিলাম মা—

অনুর ব্যাপারে যেটুকু খোঁজখবর প্রিয়তোষই নেয়। সে জেনে-শুনেই কথাটা বলল। এতে সুহাসিনী নিরস্ত হবেন না। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রিয়তোষের ওপর তিনি যতটা জোর খাটাতে পারেন—অন্য কারুর ওপরে ততটা পারেন না।

সুহাসিনী বললেন অনুনয়-সিক্ত গলায়, তবু, আজ একবারটি ঘুরে আয়। যদি কোন খবর থাকে।

অনুর খোঁজখবর নেওয়ার ব্যাপারে সুহাসিনীকে এতটা প্রশ্রয় একদা প্রিয়তোষই দিয়েছিল। অনুতোষ একবারই ধরা পড়েছিল। মাঝরাতে পুলিশ ঘেরাও করেছিল বাড়ি। দরজা ধাক্কিয়ে সব কটা ঘর তচনচ করে অনুকে ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সেটা সত্তর সালের কথা। একাত্তরের মাঝামাঝি অনু নিজেই নিরুদ্দেশ হয়েছিল; পুলিশ অবশ্য মাঝে কয়েকবার এসেছিল। প্রথমবার ধরা পড়বার পর সতর্ক হয়ে গিয়েছিল অনু। রাতের দিকে বাড়িতেই থাকত না।

সেবার চেষ্টাচরিত্র করে অনুকে থানা লক্‌আপ থেকে খালাস করে নিয়ে এসেছিল প্রিয়তোষ। সেই থেকে অনুর ব্যাপারে সুহাসিনীর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মাশুল দিতে হচ্ছে প্রিয়তোষকে। সে-ই হাঁটা-হাঁটি করছে এখানে সেখানে। যদি অনুর কোন সন্ধান মেলে।

ললিতমোহন ঘরে নেই। বেরিয়েছেন অনেকক্ষণ। চা জলখাবার খেয়ে কাগজ পড়া শেষ করে তিনি বের হয়ে পড়েন। অবকাশের জীবন। ঘরে কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যায়। তাই দশটা সাড়ে দশটা অব্দি এবাড়ি সেবাড়ি ঘুরে সময় কাটান।

রেখা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রিয়তোষ বলল, চা খাব নারে। নিয়ে যা—

রেখা বলল, সে কিরে মেজদা ! অমৃতে অরুচি।

চা-সিগারেটে বেজায় নেশা প্রিয়তোষের। ঘরে থাকলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা না হলে চলে না।

প্রিয়তোষ বলল, নারে, সকালে দুবার খেয়েছি।

রেখা বলল, স্বাস্থ্যচর্চ্চা আবার কবে থেকে নতুন করে শুরু করলি ! ভাল বুঝছি না কিন্তু।

ভাইবোনদের মধ্যে রেখার সঙ্গেই প্রিয়তোষের সবচেয়ে সহজ সম্পর্ক।

প্রিয়তোষ কথা না বাড়িয়ে খবরের কাগজে চোখ রাখল। প্রতিদিন একই ধরনের খবর থাকে কাগজে। দেশনেতাদের যুবকদের প্রতি শুকনো আদর্শের বুলি। খাদ্যাভাব। বেকারসমস্যা, খরা। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ। ময়দানে মুণ্ডহীন নারী দেহ। কয়লা চিনির দাম বাড়ছে।

গোটা কাগজটা জুড়ে বিস্বাদ খবরের ভিড়। কোথাও কোন আশার বাণী নেই। শুধু মন খারাপ করা। তবু, একবার চোখ না বোলালে ভাল লাগে না।

রেখা চলে যেতে ফের সুহাসিনী বললেন, কিরে প্রিয়, যাবি একবার—·

মার করুণ কথাগুলো প্রিয়তোষকে নরম করে ফেলে এইখানেই মার জয়। মা যখন নিবেদনের ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ায় তখন আর ওর কথা ঠেলতে পারে না প্রিয়তোষ।

মাঝের ঘর ছেড়ে পাশের ঘরে যাবার আগে প্রিয়তোষ বলল, যাচ্ছি মা। আগে অফিসের জামাকাপড়টা ছাড়তে দাও।

সুহাসিনীর করুণ মুখখানা ছেলের কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পাশাপাশি দুখানা খাট। জানালার দিকেরটা অমুর। দেয়ালের দিকেরটা প্রিয়তোষের। মাঝখানে একখানা টেবিলের ব্যবধান।

টেবিলে অনুর বই খাতা। অনুর বিছানাও পাতা। কাচা ধপধপে বেডকভার, বালিশের ওয়ার। সকাল-সন্ধ্যা দুবার অনুর বিছানা গুছিয়ে রাখে সুহাসিনী। কখন হুট করে ছেলেটা ফিরবে—এই আশায়।

থানা লক্ আপ থেকে প্রিয়তোষ ওকে সঙ্গে করে বাড়িতে আসার পর বারান্দায় পা দিতেই সুহাসিনী অনুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে-ছিলেন। বলেছিলেন, এই সর্বনাশের পথে তুই গেলি কেন অনু!

অনু অকম্প্র গলায় উত্তর করেছিল, সর্বনাশের পথ কাকে বলছ মা। আমি তোমার ছেলে না! তুমি একথা ভাবলে কি করে যে আমি খারাপ হয়ে যেতে পারি—

বারান্দায় গোটা পরিবারটা তখন ছবির মত দাঁড়িয়েছিল।

পুরো ছত্রিশটা ঘণ্টাও যায়নি তখনো, থানা লক্আপে ছিল অনুতোষ,—এই সময়টুকুর ভেতরে ওর কি পরিবর্তন! লাজুক মুখচোরা ছেলে। অথচ, তখন ওকে পূর্ণবয়স্কের মত লাগছিল।

মহীতোষ জিজ্ঞেস করেছিল, মারধোর করেনি তো তোকে?

অনুতোষ মুহূর্তে একখণ্ড ইস্পাত হয়ে গিয়েছিল। চোখ থেকে ওর আগুন ঠিকরে উঠেছিল, মারবে, আমাকে! এত সাহস আছে ওদের!

সে-কথায় সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন ললিতমোহন। মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন অনুর কথায়, সত্যিই তো, মারবে কেন।

অথচ, এই অনু ছেলেবেলা থেকেই চিররুগ্ন। হাতেপায়ে রোগা। নিত্য অসুখে ভুগত। প্রায়ই স্কুল থেকে ছেলেদের হাতে মার খেয়ে ফিরত। কথায় কথায় চোখে জল আসত ওর। একবার মনে আছে প্রিয়তোষের, মহীতোষ অফিসের এক কলিগের কাছ থেকে একটা বিলিতি কুকুরের বাচ্চা চেয়ে নিয়ে এসেছিল। অনু সেটাকে সেবা-যত্ন করত। খেতে দিত। রাতে বুকের কাছে নিয়ে শুত। তা নিয়ে কম অশান্তি হয়েছে! সুহাসিনীর অন্নবিস্তর বাতিক আছে। তিনি রাতদিন ক্যাট-ক্যাট করতেন। অনু সংসারের সব

বিরোধিতা উপেক্ষা করে কুকুরটার পালন-পোষণ করত। কিন্তু, কুকুরটাকে শেষপর্যন্ত বড় করে তুলতে পারেনি। মাস দুয়েক যখন বয়স, একদিন বারকয়েক পায়খানা পেচ্ছাব করে বাচ্চাটা মারা গেল। খুব ছেলেবেলা থেকেই, বয়স যখন ছয় কি সাত, অনু এ ঘরে চলে আসে। পাশের খাটে শুত। সে রাত্তিরে প্রিয়তোষের ভাল ঘুম হয় নি। যতবার প্রিয়তোষের ঘুম ভেঙে গেছে ততবারই লক্ষ করেছে পাশের খাটে বালিশে মুখ ডুবিয়ে অনু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

সুহাসিনী নাছোড়বান্দার মত ফের কঁকিয়ে উঠেছিলেন, ওসব কথা আমি শুনব না অনু। তুই বল্ আমার গা ছুঁয়ে —আর ও পথে যাবি না।

অনু হেসে ফেলেছিল, তোমায় ছুঁয়ে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না মা। আমি যদি কোন অন্যায় করতুম

রেখা একটা নতুন প্রশ্ন করেছিল, তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

অনু বলেছিল, অনেক কিছু। তিনবার দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চার পাঁচ জন একসঙ্গে জেরা করেছিল —

রেখা বলেছিল, কি কি প্রশ্ন করেছিল রে?

অনু বলেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল তুমি অমুক অমুককে চেনো? তোমাদের দলে কে কে আছে? তোমার সঙ্গে যাদের ধরে নিয়ে আসা হয়েছে তাদের মধ্যে কারা কারা তোমাদের দলের। বললে ছেড়ে দেব তোমায়।

রেখা বলেছিল, তুই কি উত্তর দিলি?

অনু বলেছিল, কি আর দেব। কখনো বলেছি —না। কখনো বলেছি —চিনি না। এইরকম আর কি। তবে সবচেয়ে মুসকিলে পড়েছিলাম —যখন একটা ফটো এনে বলল —এটাকে পা দিয়ে মাড়াও তো।

এবার মাধুরী প্রশ্ন করেছিল, ফটোটা কার?

অমু সে প্রশ্নে একটু থেমে গিয়ে বলেছিল, একজন মহান বিপ্লবী নেতার।

মহীতোষ শুধিয়েছিল, তুই কি করলি ?

অমু বলেছিল, আমি একটা বুদ্ধি খাটালাম। বললাম--ফটো আমি মাড়াতে পারব না। ওরা বলল, কেন ? তুমি ওর আদর্শে বিশ্বাস করো। আমি বললাম ঘুরিয়ে - কারোর ফটোই আমি পা দিয়ে মাড়াতে পারব না। সেটা যার-ই হোক না কেন। সে শিক্ষা আমি পাইনি।

অমুর কথায় সবচেয়ে পুলকিত হয়েছিলেন ললিতমোহন। তিনি একগাল হেসে বলেছিলেন, ঠিক উত্তর দিয়েছিস অমু।

সেদিনই প্রথম অমু সম্পর্কে প্রিয়তোষের ধারনা পাল্টে গিয়েছিল। পুরুষ মানুষ হিসেবে মুখচোরা লাজুক অমুকে নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে হয়েছিল তার। যে রাতে অমু ধরা পড়ে তার পরের দিন বলতে গেলে সকাল থেকে সন্ধ্যা অব্দি থানায় ধর্না দিয়েছিল প্রিয়তোষ। ফলে, অমুর মত তাকেও পুলিশ অফিসারের প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কয়েকবার।

তবে, প্রিয়তোষকে জেরা করার রীতিটা ছিল অন্যধরনের। অমুর মত নয়। আপনার ছোট ভাই ? ওর পুরো নামটা বলুন। বয়স কত, উনিশ। কি করত। কলেজে পড়ত। কোন ইয়ার। কি বললেন—এক বছর নষ্ট হয়ে গেছে। কেন। পড়াশুনো ঠিক মত হয়নি বলে গতবার পার্টওয়ান দেয়নি। এই তো বললেন—হায়ার সেকেণ্ডারীতে দুটো লেটার নিয়ে পাশ করেছিল। কলেজে খোঁজ নিয়েছিলেন ? চমৎকার, ভাইয়ের কথাটাই ঠিক ধরে নিলেন। রাতে কখন বাড়ি ফেরে। পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করত। ওর কোন্ কোন্ বন্ধু বাড়িতে আসত। তাদের নাম। একই ঘরে থাকেন। আপনি বড় ভাই। ওর চলাফেরার ব্যাপারে কখনো আপনার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি ! আশ্চর্য !

প্রিয়তোষের উত্তরগুলো এতই জড়তাপূর্ণ ছিল যাতে পুলিশ অফিসারের সন্দেহ বাড়ার কথা। আসলে প্রিয়তোষ কেমন ভড়কে গিয়েছিল সেদিন। সত্যি বলতে কি, সেদিন প্রিয়তোষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় কিছুতেই অনু খালাস পেত না। পেছনে মুরুব্বি ছিল বলেই অনুকে বের করে আনা গিয়েছিল। এককালের ডিভিশনের প্লেয়ার প্রিয়তোষ। কলকাতার কোন এক নামকরা ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারীর সঙ্গে থানার ও-সির দহরম-মহরম ছিল। সেই ভদ্র-লোককে দিয়ে ফোন করিয়ে অনুরোধ উপরোধ করিয়ে প্রিয়তোষ কাজ হাসিল করেছিল।

মজার কথা, যার ভড়কে যাবার কথা—সেই অনুতোষ কিন্তু সেদিন আগাগোড়া নির্ভয় ছিল। প্রিয়তোষ দুপুরে বাড়ি ফিরতে অনুর জন্য টিফিন ক্যারিয়ারে করে সুহাসিনী ডালভাত-তরকারী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। থানায় ফিরে পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করতে তিনি বলেছিলেন—আমরা ওদের খাবার আরেঞ্জমেণ্ট করেছি। তাছাড়া, লক্আপে বাইরের খাবার দেবার কোন আইন নেই। -প্রিয়তোষ মুখ কাচুমাচু করে বলেছিল, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাই নিয়ে এলাম। পুলিশ অফিসারটি গাঁইগুঁই করে শেষপর্যন্ত কি জানি কেন প্রিয়তোষের প্রতি সদয় হয়েছিলেন। বলেছিলেন, নিয়ে যখন এসেছেন—দিয়ে আসুন। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতে আর এরকম আনবেন না। আইনের বেড়া প্রিয়তোষ ডিঙোলেও শেষপর্যন্ত অনু ফিরিয়ে দিয়েছিল। একজন সেপাই'র সঙ্গে লক্আপের সামনে হাজির হয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রিয়তোষ। লক্আপ না যেন হাঁস মুরগীর খোঁয়াড়। ছোট প্রায়ান্ধকার ঘর। ছেলে ছোকরায় গিজগিজ করছে। সেই ভিড়ের মধ্যে দুটি মেয়েও ছিল। প্রিয়তোষকে দেখে অনু ভিড় ঠেলে গরাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রিয়তোষ ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। বলেছিল সংক্ষেপে, কেমন আছিস ? অনু সরল উত্তর করেছিল, ভালই মেজদা।—প্রিয়তোষ বলেছিল,

তোদের কিছু খেতে দিয়েছে ?—অনু বলেছিল, হ্যাঁ, সকালের দিকে চা আর বিসকুট দুখানা—।—অনেক কথা জিজ্ঞেস করার ছিল প্রিয়তোষের। মনে মনে সাজিয়েও রেখেছিল। কিন্তু অনুর মুখোমুখি হতে সব কথা কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত টিফিন ক্যারিয়ারটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ বলেছিল, নে, ধর্ এটা, মা পাঠিয়ে দিয়েছে।- অনুতোষ জিজ্ঞেস করেছিল, ওতে কি আছে মেজদা ? —প্রিয়তোষ বলেছিল, ডালভাত- -এইসব আর কি।—অনুতোষ সে-কথায় স্মিত হেসে বলেছিল, তা হয় না মেজদা। ওটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও তুমি। আমরা এতগুলো ছেলেমেয়ে আছি কাল রাত থেকে এখানে। এদের ভেতর আমি একলা বাড়ির রান্না ভাত খাব, অসম্ভব। তুমি মাকে বুঝিয়ে বলো । অনুর কথায় এমন একটা জোর ছিল যে আর উচ্চবাচ্য করতে পারেনি প্রিয়তোষ।

প্রিয়তোষ কারখানার প্যাণ্টশার্ট ছাড়ল। পাঞ্জাবী পাজামা পরল। ডিউটির সময় ছাড়া আটোসাটো পোশাক পরতে ভাল লাগে না। সুহাসিনীর অনুরোধে এককথায় রাজী হত না প্রিয়তোষ। ইদানীং সে খানিকটা আরামকাতুরে হয়ে উঠেছে। কারখানার কাজ। তার ওপর যাতায়াতের ধকল। কাজের সময়টুকু ছাড়া বেশির ভাগ ঘরে শুয়ে-বসে বই ম্যাগাজিন পড়েই কাটায়। আগের মত বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় তেমন একটা যায় না। আজ সে এককথায় রাজী হয়ে গেল তার কারণ- -কাল রাতে ফ্যাক্টরীতে বেশ ঘুমিয়ে নিয়েছে। শরীরটা ঝরঝরে। তাছাড়া, রিনার সঙ্গেও দেখা হচ্ছে না আজ এক সপ্তাহ হয়ে গেল। রিনা বড় অভিমানী। বেশিদিন দেখা সাক্ষাৎ না হলে ও চটে যায়। প্রিয়তোষ ঠিক করল- -কোন রকমে বুড়ি ছোঁওয়ার মত করে একবার থানা ঘুরেই রিনার সঙ্গে দেখা করবে। থানা থেকে রিনাদের বাড়ি কাছে। অনুর ব্যাপারে সুহাসিনীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মাত্রাতিরিক্ত।

কেননা সুহাসিনী মা। থানায় গিয়ে ফয়দা কিছুই হবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার করে সে যাচ্ছে। অফিস ঘরে যে ছোকরা পুলিশ অফিসার বসে, ঘন ঘন যাতায়াতে তার সঙ্গে পরিচয়টা গাঢ় হয়েছে প্রিয়তোষের। গেলেই কাঠের আলমারী থেকে একটা ফটোর অ্যালবাম বের করে টেবিলে রেখে বলে, দেখুন একবার, যখন এসেই গেছেন। —অ্যালবামটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নেয় প্রিয়তোষ। বেশির ভাগ ফটো আগেই দেখা। নতুন মুখগুলোও অপরিচিত। প্রতিবার প্রিয়তোষ একই কথা বলে, না, পেলাম না। ছোকরা অফিসার হাসে, মিছিমিছি ঘোরাঘুরি করছেন। তেমন কোন ইনফরমেশন থাকলে আমরা আপনাদের বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসব।—প্রিয়তোষ জানে, কথাটা সত্যি। কিন্তু একথাটা সরাসরি বলতে পারে না সুহাসিনীকে। বারবার থানায় গিয়ে কি লাভ মা। কোন খবর থাকলে ওরাই বাড়িতে এসে জানিয়ে যাবে। প্রিয়তোষ মাকে বলতে পারে না এই কারণে যে—তাহলে মা কষ্ট পাবেন। অনুর ব্যাপারে তার যে উদ্বেগ রয়েছে সেটাকে উপেক্ষা করতে পারে না প্রিয়তোষ। সে ভাবে: সপ্তাহে একদিন একবার করে থানায় গেলে খবর কিছু থাকুক কিংবা না-ই থাকুক—তাতে যদি মা স্বস্তি পান—তাহলে এইটুকু পরিশ্রমই বা সে করবে না কেন।

সেবার থানা থেকে ছাড়া পাবার পর আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল অনুতোষ। আগে যা করত যথাসম্ভব বাড়ির সকলের অগোচরে। এরপর থেকে সেই আবরণটুকুও আর রাখেনি। দিনেদুপুরে দলের বন্ধুদের নিয়ে ঘরে বসেই গল্পসল্প করত, পোস্টার লিখত, আলোচনাচক্র বসাত। আর সেইসঙ্গে সুহাসিনীর ওপর চলত নানান ধরনের জুলুম। হঠাৎ ভরদুপুরে সঙ্গে দু'তিনটি ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে হাজির হয়ে চেঁচিয়ে মাকে ডাকত। বলত, ভাত চাপাও মা। আমার বন্ধুরাও কিন্তু খাবে। তখন উনুন নিভে গেছে। ফের কাঠকুটো দিয়ে উনুন জ্বালাতেন সুহাসিনী। দলের ছেলেগুলোও ছিল অনুর মত। বেআক্কেলে।

আত্মভোলা। সুহাসিনীকে ঘিরে ওরা নাচত। আর চেঁচিয়ে বলত, থি চীয়ার্স ফর মাদার, যুগযুগ জিও। —ওরা সুহাসিনীকে 'মা' বলেই ডাকত। এক একদিন সুহাসিনী রেগে যেতেন। বলতেন, তোরা সব কেমন ছেলেরে। তোদের ঘরবাড়ি নেই! মা-বাপ নেই! —ছেলের দল সে কথায় হাসত। বলত, ঘরবাড়ি! গোটা পৃথিবীটাইতো আমাদের ঘরবাড়ি। আর তুমিইতো আমাদের মা!—সুহাসিনীর চোখের জল উবে যেত ওদের কথায়। মুহূর্তে মুখ ঝলমলিয়ে উঠত। তবু তিনি বলতেন, এভাবে জীবনটা নিয়ে কেন ছিনিমিনি খেলছিস। ভাল হতে পারিস না তোরা! -সে কথার উত্তর দিত অনু। বলত, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলোতো মা, আমরা কি খারাপ। আর ছিনিমিনি খেলছি বলছ কেন মা। আমরা সুদিন আনতে চাইছি মা। তোমার জন্যে, আমার জন্যে, দুঃখী মানুষের জন্যে। অনুর কথা শেষ হবার আগেই ছেলের দল সমস্বরে গান গেয়ে উঠত, কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল করবে লোপাট। শিকল পূজার পাষাণ ভেদী -'

ওরা এলে, বাড়িতে থাকলে প্রিয়তোষ, মহাতোষের ঘরে চলে যেত। ওখান থেকে ওদের সব কথাবার্তাই তার কানে পৌঁছত।

•

বাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে প্রিয়তোষ সিগ্রেট ধরাল একটা। হেমন্তের মিঠে রোদ। পরপর চারদিন হয়ে গেছে। আরো দুটো দিন আছে নাইটডিউটি তার। এসময় সকালের দিকে বেরুতে পারে না। রাত্রিজাগরণের পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা অব্দি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। আজ সকালের দিকে পথে নামতে ছুটির মেজাজে প্রিয়তোষের মনটা ভরপুর হয়ে উঠল। বিশেষ করে রিনার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা ভেবে।

থানায় যাবার প্রেরণা আদৌ ছিল না প্রিয়তোষের। খামাকা মাইল খানেক পথ দৌড়ঝাঁপ করা! অনুর খবর পাওয়া গেলেই বা

কি লাভ। ওকি আর ঘরে ফিরবে। ঘরের আকর্ষণ অনেকদিন হল হারিয়ে ফেলেছে ও। ওর রক্তের ভেতরে খ্যাপামি আছে। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় প্রিয়তোষের—অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও চারদেওয়ালের জীবনযাত্রা আর কোনদিনই ওর ভাল লাগবে না।

নিরুদ্দিষ্ট হবার কয়েকমাস আগে অনু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। দলের দুতিনজন পুলিশের গুলিতে কিংবা দলীয় সংঘর্ষে মারা যাবার পর ও একরকম ঘর ছেড়েই দিয়েছিল। আসত হঠাৎ হঠাৎ। ধূমকেতুর মত। তা-ও খালি হাতে নয়। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকত। তখন ওদের দলের দুর্দিন। কেন্দ্রীয় ঐক্য ভেঙে পড়েছে। এলাকাভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা যুঝে যাচ্ছিল। তখন ওদের শত্রু এক নয়, বহু। বেশিক্ষণ ঘরে বসত না। সুহাসিনীর সঙ্গে দুচারটে কথা বলেই সরে পড়ত।

শেষ যেদিন অনু বাড়িতে এসেছিল—সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে প্রিয়তোষের। দিনটা ছিল রবিবার। বাড়িতে সবাই ছিল। এসেছিল দুপুরবেলা। সেদিন প্রিয়তোষদের বড়মামাও এসেছিলেন তাদের বাড়িতে। বড়মামা থাকেন পাইকপাড়ায়।

সুহাসিনী অনুকে টেনে মাঝের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। কেঁদে ফেলেছিলেন অঝোরে। বলেছিলেন, তুই আমাকে আর কত কষ্ট দিবি অনু।

অনুর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। শরীরটা যেন পুড়ে ঝলসে গেছে। চোখমুখ বসে গেছে। দেখেই মনে হয়েছিল—কতকাল ঘুমায় না ছেলেটা।

অনু বলেছিল, মা তুমি কাঁদছ কেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। যতক্ষণ দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আর হাত দুটো আছে ততক্ষণ কারুর সাধ্যি নেই তোমার অনুর ক্ষতি করে—

অনুকে তখন অন্যরকম মনে হয়েছিল। যেন পোড়-খাওয়া একখণ্ড দগদগে ইস্পাত।

সুহাসিনী আজও অনুর সেই কথার ভরসায় আছে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।...কারুর সাধ্যি নেই তোমার অনুর ক্ষতি করে।

অনুকে বোঝাবার ব্যাপারে সেদিন বড়মামাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এরকম গোয়ার্তুমি করে লাভটা কি হবে অনু। বুঝতাম—তোরা সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিস - আমার বলার কিছুই থাকত না। তোরা এখন দুর্বল হয়ে পড়েছিস। তোদের নেতারাও কোন সঠিক পথ বাৎলে দিতে পারছে না। অযথা প্রাণ দেওয়ার মধ্যে কোন মহত্ব নেইরে অনু। যে সাচ্চা বিপ্লবী সে দীর্ঘদিন বাঁচবে। বাঁচতে হবে তাকে সকলের স্বার্থে। দেশের মানুষকে সে জাগ্রত করবে, প্রেরণা জোগাবে। জনসাধারণের জন্যেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে।—অনু অত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। ও বলেছিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি একথা ঠিক। তাই বলে কাপুরুষের মত আমরা পালাব! আদর্শচ্যুত হব!

বড়মামা বলেছিলেন. আমি কি সেকথা বলছি। পালাবি কেন. আত্মগোপন কর কিছুদিনের জন্য। তারপর. পরিস্থিতি অনুকূলে এলে আবার কাজে লেগে পড়বি।

ঘরভর্তি তখন লোক। মহীতোষ, মাধুরী, রেখা, ললিতমোহন সকলেই ছিল। সকলের দৃষ্টি অনুর দিকে। মহীতোষ বড়মামার কথায় সায় দিয়েছিল, বড়মামা তো ঠিক কথাই বলছেন অনু। ভাল করে ভেবে ছাখ্। আমরা সকলেই তোর মঙ্গল চাই

দাদার কথায় অনুতোষের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল, মঙ্গল অমঙ্গল নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই না দাদা। সারা দেশটা যখন জ্বলে যাচ্ছে—তখন নিজের কথা আলাদা করে ভাবতে চাই না। - বড়মামা বলেছিলেন, তবু একবার ভেবে ছাখ্। যদি রাজী হোস তো আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমার এক বন্ধুর ছেলে রাঁচীতে আছে। হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কাজ করে। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

ওর কাছে চলে যা। আদর যত্নে থাকবি। তারপর অবস্থা পাল্টালে ফিরে আসবি—

মাধুরী বলেছিল, এতো ভাল কথা।

রেখা এবং সুহাসিনীও সে-কথায় সায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু, অমুতোষকে কিছুতেই মচকানো যায়নি সেদিন। সে বলেছিল, রাঁচীতে গেলে নিরাপদে থাকব—একথাই বা কে বলল। ওখানে কি কোন গণ্ডগোল হচ্ছে না ?

বড়মামা আমতা আমতা করে উত্তর করেছিলেন, হচ্ছে। তবে এখানকার চেয়ে কম—

অমু বলেছিল, কম তো এখন। কিন্তু বেড়ে যে যাবে না একথাও তো নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাছাড়া, আজকাল অন্যপ্রদেশে বাঙালী ছেলে উটকো গিয়ে পড়লে পুলিশের নজর নাকি বেশি করে পড়ে। এইরকমই তো শুনেছি—। মিছামিছি যার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেব তাকে বিপদে ফেলা হবে—

একথার পর বড়মামা চুপ করে গিয়েছিলেন।

কলোনীর রাস্তা থেকে পীচঢালা বড় রাস্তায় এসে পড়তে সুবোধের সঙ্গে দেখা। সুবোধ থাকে গরফার দিকে। একসঙ্গে ওরা স্কুলে পড়েছে। ওর হাতে একটা গীটার। সুবোধ ভাল গীটার বাজায়। পাড়ার ফাংশনে ওর খুব খাতির।

প্রিয়তোষ বলল, কোথায় যাচ্ছিস ?

সুবোধ বলল, টিউশনিতে।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, আজকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করিস নাকি ?

সুবোধ হতাশস্বরে বলল, কি আর করব বল্। যা দিনকাল। গরফার দিকে কেউ আসতেই চায় না। তা তুই কোথায় চললি ? আজকাল তো তোকে দেখাই যায় না—

প্রিয়তোষ বলল, কেন আমি তো বাড়িতেই থাকি—

সুবোধ বলল, বাজে কথা। দু তিন দিন তোর খোঁজে গিয়েছিলাম। পাইনি তোকে। আসলে চাকরী পেয়ে তুই পাল্টে গেছিস প্রিয়। সবাই যেমন যায়—

কথাটা মিথ্যে নয়। চাকরী পাবার পর থেকে সে বন্ধুবান্ধবদের এড়িয়ে চলছে। সেটা যে তার আন্তরিকতার অভাবজনিত কিছু তা নয়। আসলে সংসারের চাপ এবং সময়াভাবই এর কারণ।

প্রিয়তোষ এ প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল, তারপর বল্, ফাংশন-কেমন করছিস ?

সুবোধ বলল, ফাংশন ! সে-সব পাট কবে চুকেবুকে গেছে। লোক-জন রাস্তায় এখনো নিশ্চিন্তে বেরুতে পারছে না।—তায় ফাংশন -

কথায় কথায় ওরা বাজারের কাছাকাছি আসতে একটা চায়ের দোকান থেকে কে একজন তারস্বরে চেঁচিয়ে ডাকল, এই প্রিয়, প্রিয়—

প্রিয়তোষ তাকাতে দেখল—পুরোণ বন্ধুর দল দোকানের ভেতরে চাক বেঁধে গুলতানি করছে।

সুবোধ বলল, চলিরে, একটু তাড়াতাড়ি আছে। সুবোধের দল বেশ আছে। গিলে করা পাঞ্জাবী পরে, সঙ্গে পাটভাঙা জড়িপাড় ধুতি, হরিণের চামড়ার চটি, মাথায় কেয়ারী করা চুলের বাহার, গা থেকে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘাড়ে গলায় পাউডারের প্রলেপ, দু ঠোঁট পানের রসে লাল--দিব্য মেতে আছে গানবাজনা নিয়ে। চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই। বরং, একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা আছে। নিজেকে নিয়েই মশগুল ওরা।

প্রিয়তোষকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বন্ধুদের মুখোমুখি যখন পড়ে গেছে তখন আর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। উপেক্ষা করলে ওরা কদর্য খিস্তি-খাস্তা শুরু করে দেবে।

প্রিয়তোষ দোকানের কাছে এগিয়ে আসতে একজন হাঁক পাড়ল, জীবনদা, ছ' কাপ চা, প্রিয়'র নামে। বেশ জম্পেশ করে করো।

জীবন পাড়ুই চায়ের দোকানের মালিক। একসময় প্রিয়তোষও এ দোকানের নিয়মিত খদ্দের ছিল। ছিল এই আড্ডার একজন। তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। চাকরী জুটল। তারপর থেকেই এই আড্ডায় আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

একজন বলল, কিবে গুরু, তোমার চাঁদ বদনখানা তো আর দেখাই যায় না। আমাদের ভুলে গেলে নাকি!

প্রিয়তোষ ওদের এড়িয়ে চলে– একথা ঠিক। সেটা এদের প্রতি অশ্রদ্ধার বা অবজ্ঞার কারণে নয়, বরং ওরা কেউ এখনো চাকরি বাকরি পায়নি, এখনো বেকার চায়ের দোকানে বসে সময় নষ্ট করে যাচ্ছে— একথা মনে হতে ওদের জন্য সমবেদনায় তার বুক মাটির মত নরম হয়ে ওঠে। আসলে--তার চাকরী হল—ওরা এখনো যেই তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইল—এই বোধটা প্রিয়তোষকে পীড়িত করে বলেই সে ওদের এড়াতে চায়--

আরেকজন, হাবুল তার নাম, ছেলেবেলায় একসঙ্গে চাঁদা তুলে সরস্বতীপূজো করেছে, এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে প্রিয়তোষের দুই পকেট পাখোয়াজের মত চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, কিরে, সাধু হয়ে গিয়েছিস নাকি। সিগ্রেট-টিগ্রেট খাস না আজকাল!

প্রিয়তোষ বলল, না, খাই। বাড়ি থেকে প্যাকেটটা আনতে ভুলে গিয়েছি। দাঁড়া--

পাশের দোকান থেকে সিগারেট কিনে এনে প্রিয়তোষ হাবুলের হাতে দিল।

ততক্ষণে টেবিলে চা এসে গেছে।

চায়ে চুমক দিতে দিতে হাবুল বলল, চাকরী পেয়ে গেলি! আমাদের একটা খ্যাটন দেবার কথা ছিল না, ভুলে গেলি।

সামনের বেঞ্চের একবারে কোণায় বসেছিল রবি। হাতে একটা রেসের বই। দেখছিল নিবিষ্টমনে। হাবুলের কথায় সজাগ হয়ে উঠে বলল, ঠিক বলেছিস। সত্যি প্রিয়, তুই কথার খেলাপ করেছিস।

কদ্দিন হয়ে গেল—রেস-জুয়া-তাস আর এই চায়ের দোকানে বসে নরক গুলজার—জীবনের এই ছোট বৃত্তের মধ্যে বদ্ধ জলের মত আটকা পড়ে আছে এরা। ফলে এদের মনের সতেজ ভাবটা আর নেই। পচন ধরেছে। অথচ, আলাদা আলাদা করে দেখলে এরা কেউই খারাপ নয়। সকলের কিছু না কিছু সম্ভাবনা ছিল।

প্রিয়তোষ বলল, ভুলে যাব কেন। কাজে ব্যস্ত থাকি। তোদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ-ও হয় না ঠিকমতো। বল্না, কি খেতে চাস তোরা—

গোষ্ঠ, দলের মধ্যে সবচেয়ে বড়, স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে সে আজ দশ বারো বছর হয়ে গেল, এখনো ভেরেণ্ডা ভাজছে, চুক্চুক্ করে গলায় এক অদ্ভুত শব্দ তুলে বলল, কতদিন মাইরি পেটে একটু অমৃত পড়ে না। ছুবোতল ভুন্ড মঙ্ক, আর সেইসঙ্গে কষা মাংস রুটি ভরপেট—এটুকু হলেই চলে যাবে আমাদের। কি বল্ হাবুল ?—হাবুল বলার কোন সুযোগই পেল না। চায়ের দোকানে যেন বোমা ফাটল। সবাই একযোগে টেবিল চাপড়ে বিকট চিৎকার করে গোষ্ঠর প্রস্তাবে সমর্থন জানাল।

এর কিছুক্ষণ পরেই, চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ ওদের হাত থেকে ছাড়া পেল। বলতে গেলে আশাতীত তাড়াতাড়ি। থানায় যাবার কথা জানাতেই ওরা আর জোরাজুরি করল না। নইলে জীবনের চায়ের দোকান থেকে বেরুতেই বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা হয়ে যেত।

থানায় যাওয়া মানে নিয়মরক্ষা। কোন খবরই ছিল না। ফটোর অ্যালবামটা নাড়াচাড়া করতে কতটুকুই বা আর সময় লাগে। মিনিট পনেরর মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকে।

রিনারা থাকে ঢাকুরিয়ায়। বাস রাস্তার কাছাকাছি। ওর মামাতো দাদা অমল প্রিয়তোষের বন্ধু। একই সঙ্গে সাউথ ক্যালকাটা লীগে একই দলে খেলত ছুজনে। সেই সুবাদে অমলদের বাড়ি প্রিয়তোষের

যাতায়াত। অমল কয়েক বছর হল চাকরী পেয়ে দুর্গাপুরে চলে গেছে। গত অগ্রাণে ওর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। বিয়ের ব্যাপারে বাড়িতে এসেছিল। রিনা ছেলেবেলা থেকেই মামাবাড়িতে মানুষ। ওর বাবা আছে মা নেই। মা অল্প বয়সে মারা যায়। বাবা থাকেন মধ্যপ্রদেশে। কলিয়ারীর হেড ক্লার্ক। ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর মামারা রিনাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে। বাবা নতুন সংসার পাতার পর রিনার তেমন একটা খোঁজখবর নেয় না।

অমলের সঙ্গে প্রিয়তোষের যখন প্রথম পরিচয় ঘটে তখন রিনা খুবই ছোট। ফ্রক পরত। পাতলা চেহারা। সজল দুটি চোখ। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও একটা শ্রী আছে রিনার। সেই রিনা ভাল—বেসেছিল প্রিয়তোষকে। প্রিয়তোষ সেটা প্রথমে টের পায় নি। যখন টের পেয়েছিল তখন আর প্রিয়তোষের পক্ষেও ফেরার পথ ছিল না। সে অনেককরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। রিনা কোন কথাই শুনতে চায় নি। বলেছিল, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ না করো তাহলে আমি আত্মঘাতী হব।

রিনাদের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে কলিংবেল টিপতে দরজা খুলল রিনার ছোট মামিমা। নাম অঞ্জলি। অঞ্জলি এ পাড়ারই মেয়ে। অমলের ছোটকাকা বয়সে অমলের চেয়ে কিছু বড় হবে। ভদ্রলোক লভ্ ম্যারেজ করেছিলেন। অঞ্জলিকে বিয়ের আগ্ থেকে চিনত প্রিয়তোষ।

অঞ্জলি বলল, কি ব্যাপার। অনেকদিন যে এদিকে আসেন না। অসুখটসুক করেছিল নাকি ?

বয়সে অঞ্জলি প্রিয়তোষের ছোট। বেশ হাসিখুশি মহিলা। রিনার সঙ্গে প্রিয়তোষের ঘনিষ্ঠতার কথা এবাড়ির কারুরই আর অজানা নেই। এব্যাপারে প্রথম থেকেই অঞ্জলির সঙ্গে প্রিয়তোষ খোলাখুলি কথাবার্তা বলে আসছে।

ভেতরে ঢুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল প্রিয়তোষ, রিনা বাড়িতে আছে ?

অঞ্জলি রসিকতা করল, আপনি তো আচ্ছা মানুষ! ঘরে ঢুকে প্রথমেই রিনার খোঁজ। কেন, আমরা কি মানুষ নই?

প্রিয়তোষ অঞ্জলির কথার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল, সে কি কথা। আপনি হলেন আমাদের কাণ্ডারী। আর আপনাকেই তাচ্ছিল্য করব! সে হয় কখনো--

অঞ্জলি বলল, বসুন।

প্রিয়তোষ চেয়ারে বসতে অঞ্জলি এগিয়ে ভেতরের দরজার পর্দা তুলে একবার কি যেন লক্ষ্য করল। তারপর ফিরে এসে খাটো গলায় বলল, একটা কথা বলবো। কিছু মনে করবেন না তো।

প্রিয়তোষ বলল, মনে করবার মত হলে নিশ্চয়ই করব -

অঞ্জলি বলল, ঠাট্টার কথা নয়। সিরিয়াসলি বলছি -

প্রিয়তোষ বলল, আগে বলুন তো কথাটা। তারপর না হয় ভেবে দেখা যাবে।

অঞ্জলি সরাসরি বলল, মেয়েটাকে আর কদ্দিন ঝুলিয়ে রাখবেন মশাই—

প্রিয়তোষ ঢোঁক গিলল, তার মানে!

অঞ্জলি বলল, আমার তো মনে হয়—আর দেরী করা উচিত নয়।

প্রিয়তোষ প্রশ্ন করল, হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

অঞ্জলি বলল, কারণ ঘটেছে বলেই বলছি—

প্রিয়তোষ বলল, কারণটা কি জানতে পারি?

অঞ্জলি বলল, কেন, রিনা কিছু বলেনি আপনাকে?

প্রিয়তোষ বলল, না তো।

অঞ্জলি বলল, তাহলে ওর কাছ থেকেই জেনে নেবেন।

প্রিয়তোষ বলল, আপনার বলতে কি কোন আপত্তি আছে?

অঞ্জলি বলল, আপত্তি নেই। তবে সেসব কথা আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।—এর ওপর আর কোন প্রশ্ন চলে না। প্রিয়তোষ বলল, রিনা কোথায় গেছে?

অঞ্জলি বলল, কাছাকাছি কোথাও। এক্ষুণি আসবে। এই যাঃ, আজে বাজে কথায় আসল কাজটাই ভুলে গেছি। বসুন, চা নিয়ে আসছি—

অঞ্জলি ভেতরের ঘরে চলে গেল।

ফাঁকা ঘর। বসে থাকতে অস্বস্তি হচ্ছিল প্রিয়তোষের।

একসময় পাশের ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে রিনার বড়মামিমার কথোপকথন সুরু হয়ে গেল। রিনার বড়মামা বছরখানেক হল এবাড়িতে এসেছেন। পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের বড় চাকুরে ছিলেন। ভাইদের মধ্যে তার আয়ই ছিল বেশী। এবাড়িটা তারই পয়সায় তৈরি। প্রবাসে ছিলেন বহুকাল। রিটায়ার করে এখানে এসেছেন।

ওদের কথাবার্তা সব স্পষ্ট শুনতে পেল প্রিয়তোষ।

বড় মামিমা এইভাবে শুরু করলেন, কে এসেছে রে ছোট বউ?

অঞ্জলি উত্তর করল, প্রিয়তোষ বাবু।

বড় মামিমা : অমলের সেই বন্ধুটি?

অঞ্জলি : হ্যাঁ।

বড় মামিমা : রিনা কোথায়?

অঞ্জলি : কি যেন কিনতে বেরিয়েছে।

বড়মামিমা : ছেলেটি এভাবে যখন তখন এসে হাজির হয়। অমলের বন্ধু, কিছু বলাও যায় না— । পাড়ায় আর আমাদের মান-সম্মান রইল না।

অঞ্জলি : একথা বলছেন কেন বড়দি। প্রিয়তোষ ভাল ছেলে—

বড়মামিমা : ভাল না কচু! ভাল হলে কেউ ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে?

অঞ্জলি : ফষ্টিনষ্টি তো কিছুই করেনা। তাছাড়া, ওতো রিনাকে বিয়ে করবে—

বড়মামিমা : প্রিয়তোষ তোকে বলেছে একথা?

অঞ্জলি : হ্যাঁ বড়দি, বলেছে।

বড়মামিমা : তাহলে বিয়ে করলেই পারে। আমরা কি তাতে বাধা দেব ?

অঞ্জলি : বাধা দেবার কথা উঠছে না বড়দি। বাধা দিলেই কি ওরা শুনবে। রিনাকে ঘরে আটকে রাখতে পারবে ! আসলে, পারিবারিক কারণে প্রিয়তোষ এক্ষুণি কিছু ঠিক করে উঠতে পারছে না।

অঞ্জলির কথাটা ঠিক। বাড়িতে রিনাকে নিয়ে যেতে তার ইচ্ছে নেই। অভাব আর অশান্তির মধ্যে সে টেনে নিয়ে যেতে চায় না মেয়েটাকে। এর মধ্যে একবার রেজিষ্ট্রি করবার তোড়জোড়ও করেছিল। সেইমত অফিসে আর্নলিভের জন্যে দরখাস্ত করা, কসবার দিকে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে বের করা এবং এক মাসের ভাড়াও অ্যাডভান্স করেছিল প্রিয়তোষ। সব যখন ঠিকঠাক এমন সময় হঠাৎ অনুটা বেপাত্তা হল। সংসারের সেই বিপদের দিনে বিয়ে করে আলাদা হয়ে যাবার মত নিষ্ঠুর প্রিয়তোষ নয়। তাই, সেবারের পরিকল্পনাটা মাঝপথেই ভেস্তে গিয়েছিল।

বড় মামিমা বললেন, তুইও দেখছি তলে তলে ওদের দলে ভিড়ে গেছিস। পারিবারিক কারণটারণ সব বাজে অজুহাত। আসলে ছেলেটা রিনাকে কিছুদিন নাচিয়ে শেষকালে কেটে পড়বে। এ তুই দেখে নিস ছোটবউ—

অঞ্জলি বলল, আমি যদ্দুর জানি—প্রিয়তোষ এতটা নীচ নয়।

বড়মামিমা প্রায় ধমকে উঠলেন, কে ভাল আর কে মন্দ বাইরের [illegible] দেখে কি চেনা যায়। ওরকম ভাল ছেলে আমি ঢের ঢের [illegible]ছি—

এমন সময় বাইরের দরজা ঠেলে রিনা এসে ঘরে ঢোকায় প্রিয়তোষ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রিনা কাছে এগিয়ে এসে উজ্জ্বল গলায় বলল, [illegible] ! কতক্ষণ হল এসেছ ?



প্রিয়তোষ ঝাপসা গলায় বলল, এই তো কিছুক্ষণ। তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

রিনা বলল, কুরুশ কাঁটা আর ক্রসেড সুতো কিনতে গিয়েছিলাম। ঘরে বসে বসে সময় কাটতে চায় না। তাই ভাবছিলাম—সেলাই ফোঁড়াই করব।

কোন কথা ঠাণ্ডা মাথায় শোনার মত ধৈর্য ছিল না প্রিয়তোষের। সে বলল, চলো, বাইরে যাই। কিছু জরুরী কথা বলার আছে—

প্রিয়তোষের ভাবান্তর লক্ষ্য করেনি রিনা। সে চোখ পাকিয়ে বলল, খুব যে মিলিটারী মেজাজ দেখছি! কদ্দিন বাদে এলে খেয়াল আছে ?

রিনাকে ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছিল। পরনে আকাশীরঙের ফুল ভয়েলের শাড়ি। একরাশ এলোচুল। তার খানিকটা কাঁধের একপাশ দিয়ে বুকের দিকে লকলকিয়ে নেমে এসেছে। ভেজাভেজা সাবান ঘষা ঝকঝকে মুখ। সারা শরীর থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ ফুটে বেরুচ্ছিল।

প্রিয়তোষ বলল অনুনয়ের সুরে, প্লীজ রিনা, চলো। এখানে সব কথা বলা যাবে না—

রিনা হাসল, বললেই কি বেরুনো যায় ? পুরুষজাতটা বড় অবুঝ। দাঁড়াও আগে ছোটমামিমার কাছ থেকে পারমিশনটা নিয়ে আসি।

মেয়েরা প্রেমে পড়লে যে রাতারাতি সাবালিকা হয়ে ওঠে রিনা তার বড় প্রমাণ। যেদিন থেকে ওর সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতার স্তরে এসে পৌঁছেছিল সেদিন থেকেই রিনা আগাগোড়া পাল্টে গেছে। আগেকার কথাবার্তায় একটা হাল্কা চাল ছিল। এখন বেজায় ভারিক্কি। প্রিয়তোষ ভাবে হয়ত এটাই নিয়ম। কোন পুরুষ মানুষের ওপর অধিকারবোধ জন্মালেই বোধহয় মেয়েরা হঠাৎ কেমন প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে ওঠে।

রিনা ভেতরে গিয়ে সময় নিল না। একটু পরেই এসে বলল, চলো।

রাস্তায় নেমে রিনা বলল, তোমার সব কাণ্ডই অদ্ভুতধরনের। বিয়ের পর তোমাকে কি করে যে সামলাব তাই ভাবছি। বেলা এখন এগারটা। এই সময় কেউ কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে আসে?

প্রিয়তোষ সে-কথার কোন উত্তর করল না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল—রিনা মিটিমিটি হাসছে। প্রিয়তোষ অসময়ে আসাতে ও মোটেই অখুশি নয়। বরং, ছেলেরা খানিকটা উড়নচণ্ডে হোক মেয়েরা সেটাই পছন্দ করে।

রিনা বলল, কোনদিকে যাবে? আমায় কিন্তু আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। বড় মামিমা কদিন ধরে রণচণ্ডী হয়ে আছেন

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, কেন?

রিনা বলল, ছেলেমেয়েদের বেশি শাসনে রাখেন যে! অতনুদা কদিন হল মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে। অতনু রিনার বড়মামার ছেলে। অমলের জ্যাঠতুতো দাদা। বাবার পয়সা আছে। কাজকর্ম কিছুই করেনা। দিনরাত লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়ায়।

প্রিয়তোষ বলল, বুদ্ধ মন্দিরের দিকে চলো।

ঢাকুরিয়া ওভার ব্রিজের কাছাকাছি আসতে রিনা পেছন থেকে প্রিয়তোষের জামা টেনে ধরে বলল, এই, এদিকে যাব না। অন্য কোথাও চলো—

প্রিয়তোষ বলল, কেন?

রিনা ইশারায় সামনের দিকে চোখ রাখল। প্রিয়তোষ সেদিকে তাকাতে দেখল - ব্রীজের নিচে একজায়গায় তিন-চারটি ছেলে চাক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। অনুদের বয়সী হবে ওরা। প্রত্যেকের ঠোঁটে সিগারেট। পরনে চিত্রবিচিত্র পোশাক। এক একজন যেন হিন্দী ফিল্মের মূর্তিমান ষ্টার। এ অঞ্চলের অনেককেই চেনে প্রিয়তোষ। কিন্তু, এদের চেনেনা। এরা বয়সে এতই ছোট যে চেনার কথা নয়।

রিনা বলল, চাপা ধমকের সুরে, বলছি, চলো অন্য কোন দিকে। দেখছ না ভুট্টা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, ভুট্টা, সে আবার কে ?

রিনা বলল, ভুট্টাকে চেনো না। এ পাড়ার মস্তান—। সাংঘাতিক ছেলে

প্রিয়তোষ লক্ষ্য করল—ওদের মধ্যে কাউকেই ভয়ঙ্কর বলে মনে হচ্ছে না। সবকটা ছেলেই রোগা লিকলিকে।

প্রিয়তোষ বলল, ভুট্টা কোথায় থাকে ?

রিনা বলল, আমাদের পাড়াতেই। নতুন ভাড়াটে এসেছে—

প্রিয়তোষ এবার ভাল করে তাকাল। ওদের মধ্যে কে ভুট্টা সেটা আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হল না। লম্বা ঢ্যাঙা ছেলেটা নিশ্চয়ই। মস্ত জুলপি। চোখে রঙ-চশমা। গায়ে মেয়েদের ব্লাউজের যে সব প্রিন্ট হয়—সেই জাতীয় ছিট কাপড়ের তৈরি শার্ট। কোমরে চওড়া বেল্ট। পায়ে নাগরাই জুতো।

প্রিয়তোষ বলল, ছেলেটাকে তো গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে না। বরং, ভদ্রঘরেরই লাগছে—

রিনা প্রিয়তোষের হাতে চিমটি কেটে বলল, আহ্, আস্তে বলো। শুনতে পাবে যে! আজকাল ভদ্রঘরের ছেলেরাই তো মস্তান হয়—

ওরা যে তাদের সম্পর্কে বলাবলি করছে সেটা ভুট্টার দল টের পেয়ে গেল। একজন সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ দিল, গুলাবি, মেরিজান—

আরেকজন বলল, গায়ের গরম মামাতে বেরিয়েছে রে!

ভুট্টা কিন্তু কিছু বলল না।

রিনা এবার হাত ধরে টেনে প্রিয়তোষকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকল।

প্রিয়তোষ রাগে থরথর করে কাঁপছিল। বলল, ওরা তোমায় এম্নি জ্বালাতন করে নাকি ?

রিনা বলল, করেনা আবার! মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এসব গা সওয়া হয়ে গেছে আমার—

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, ভুট্টা কিছু বলে?

রিনা বলল, না, ভুট্টা অসভ্যতা কিছু করে না। তবে পেছনে লাগে বই কি। এটা ওটা ছুতো ধরে আলাপ জমাতে চায়—

প্রিয়তোষ বলল, বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাকে কিন্তু বোলো—

রিনা দুই ভ্রূ জোড়া করে বলল, তোমাকে বললে কি করবে?

প্রিয়তোষ হাত দোলাতে, দোলাতে বলল, কি করব আবার। শায়েস্তা করব। যাতে আর কখনো তোমাকে অসম্মানজনক কিছু বলতে না পারে—

রিনা হাসল, খুব যে দেখি বীরপুরুষ! জানো ওদের সঙ্গে চেম্বার থাকে সবসময়।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, সারাদিন ওরা কি করে?

রিনা বলল, কি আবার করবে। দুর্গাপূজো কালীপুজোর সময় চাঁদার নামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জুলুমবাজী করে। সুযোগমত অপরিচিত লোক দেখলে ছিনতাই করে। বড় বড় দোকান থেকে মাসে মাসে টাকা তোলা নেয়। রাতের দিকে রাস্তায় গাড়ি আটকায়। টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয়।

প্রিয়তোষ বলল, পুলিশ ধরে না ওদের।

রিনা হাসল, তুমি দেখছি কিছুই জানো না। পুলিশের সঙ্গে ওদের খুব দোস্তী—

প্রিয়তোষ একটা নিশ্বাস ছাড়ল বড় করে, ভদ্রঘরের ছেলে! এতটা রষ্ট্ করল কি করে?

রিনা বলল, ভুট্টা ছেলেটা পড়াশুনোতেও ভাল ছিল। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। কলেজেও পড়েছিল কিছুকাল। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে—

প্রিয়তোষ বলল, তুমি ওর এত খবর জানো?

রিনা বলল, বারে! জানব না। বললুম যে—ও আমাদের পাড়াতেই থাকে—

প্রিয়তোষ ভাবতে চেষ্টা করল : গোটা সমাজ কত দ্রুত পালটাতে শুরু করেছে। বিশেষ করে উঠতি বয়সের ছেলেরা সবচেয়ে উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। এদের একদল স্কুল-কলেজ পোড়াচ্ছে। সব ভাঙছে। তচনচ করে ফেলছে। অনু সেই দলে। আর একদল এই ভুট্টারা। এরা অন্যদিক থেকে নড়বড়ে করে দিচ্ছে সমাজটাকে। আসলে—সব মিলিয়ে একটা নৈরাজ্যের ঢেউ উঠেছে দেশজুড়ে। একটা বেপরোয়া অবিশ্বাস আর লাগামহীন উন্মার্গগামিতায় যুবসমাজ শেষ হতে চলেছে। শুধু কি ভারতবর্ষে, প্রিয়তোষের ধারণায় সারা পৃথিবী জুড়ে এই এক কাণ্ড চলছে। দিনকয়েক আগে একটা ইংরেজী ফিল্ম দেখেছিল সে। সাগরপাড়েও এই একই অবস্থা। প্রথাবদ্ধ সমাজ-বন্ধন কেউ মানতে চাইছে না। দলে দলে ছেলেমেয়েরা ঘরের সুখ-আরাম-নিরাপত্তার গণ্ডি ডিঙিয়ে নেমে পড়েছে পথে। ছড়িয়ে পড়ছে দেশ-বিদেশে। পুরোন ব্যবস্থাকে এরা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারছে না। এদের শ্লোগান একটাই : ভাঙো, চূর্ণ করো সব। মরচে-পড়া সমাজ-নিয়মকে বাতিল করো। পায়ের তলায় মাড়াও প্রচলিত মূল্যবোধগুলিকে।

ওরা ষ্টেশনের দিকের রাস্তায় এল।

রিনা বলল, চলো তোমাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিই। ট্রেনে করে বাড়ি ফিরো।

প্রিয়তোষ বলল, হ্যাঁ, যে-কথা তোমাকে বলতে চাইছিলাম। আচ্ছা রিনা, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে বাড়ি থেকে কি তোমার ওপরে কোন চাপ দেওয়া হচ্ছে?

রিনা প্রিয়তোষের প্রশ্নে একটু থতিয়ে গেল। তারপর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, কই নাতো, তেমন কিছুতো হয়নি—

প্রিয়তোষ বলল, তুমি আমাকে লুকোচ্ছ রিনা। অঞ্জলি বলল—

রিনা বলল, কি বলল ছোটমামী?

প্রিয়তোষ বলল, বলল—ব্যাপার গুরুতর। আপনি রিনার কাছ থেকেই শুনে নেবেন।

রিনা না বোঝার ভাণ করল, কই তেমন কিছু তো নয়।

প্রিয়তোষ বলল, আজ আমি নিজে শুনে এলাম। তোমার বড়-মামিমা বলছিলেন—

রিনা এবার উৎসাহ প্রকাশ করল, কি বলছিলেন—

প্রিয়তোষ বলল, আগে তুমি বলো কি হয়েছে, না হলে বলব না—

রিনা বলল, তেমন কিছু নয়।

প্রিয়তোষ ফুঁসে উঠল, তাহলে তুমি সব কথা খুলে বলবে না আমাকে ?

রিনা এতক্ষণে মুখ খুলল, বলার কি আছে। ওদের সংসারে আছি। তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, তাই প্রায়ই খোটা দেয়—

প্রিয়তোষ বলল, সেটা কি রকম—

রিনা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, কি রকম আবার ! আমি ফ্যালনা মেয়ে। আমার একটা গতি হলে ওরা স্বস্তি পায়। এই আর কি।

প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে পড়ল। আবেগজড়িত গলায় বলল, দোষটা আমারই রিনা। একেই বলে কপাল। সব ঠিকঠাক। বাড়ি ঠিক করলাম। একমাসের অ্যাডভান্সও দিলাম। ম্যারেজ রেজিষ্টার অফিসে গিয়ে ডেট নিলাম। এমন সময় হঠাৎ অনুটা বেপাত্তা হল—

রিনা বলল, আমি সবই জানি।

প্রিয়তোষের কণ্ঠস্বরে আফশোস ঝরে পড়ল, আমার জন্য তুমিও গঞ্জনা সহ্য করছ রিনা—

রিনা বলল, ওসব গঞ্জনা-টঞ্জনা আমি গায়ে মাখি না। তুমি একটু নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে নাও। তারপর সব হবে।

রিনার কথায় প্রিয়তোষের মন আশ্বাসে ভরে উঠল। সে বলল ভেজা গলায়, এইজন্যেই তো তোমাকে আমি ভালবাসি রিনা—

রিনা হেসে ফেলল, নাও, রাস্তার মাঝখানে আর নাটক করতে হবে না। বেলা হয়ে গেল, চলি আমি। আবার কবে দেখা হবে?

প্রিয়তোষ তখনো প্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে নি। বলল, আসছে রোববার। ছুটির দিন—

রিনা হেসে উঠল, ওরে বাবা! এ দেখছি লক্ষ্মীছেলের মত কথা বলছ। এত তাড়াতাড়ি আবার আসবে?

প্রিয়তোষ বলল, বিশ্বাস করো রিনা—

রিনা চলে যেতে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল প্রিয়তোষ। এখন বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সারতে হবে। দুপুরে খানিকটা সময় না ঘুমলে চলবে না। আজও নাইট ডিউটি।

ডাইনে ষ্টেশন, বায়ে বাজার। ডাউন প্ল্যাটফরমে গিয়ে ট্রেণ ধরবে প্রিয়তোষ। বাজারের মোড়ে আসতে প্রিয়তোষ দেখল—লেভেল ক্রসিংএর গেট বন্ধ। ঠুং ঠুং করে সিগন্যাল বেল বাজছে। আপ ট্রেণ আসছে। শিয়ালদা যাবার গাড়ি। সামনে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে।

প্রিয়তোষ কাছের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনল।

হঠাৎ প্রাইভেট কারের দরজা খুলে বেরিয়ে এল সুবিনয়। কাছে এসে বলল, কখন থেকে ডাকছি। শুনতেই পাচ্ছিস না—

সুবিনয় স্কুলজীবনের বন্ধু। ভাল ছাত্র ছিল। বরাবর পরীক্ষায় ফাষ্ট হত। এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার। মাইনে চার অংকের। শরৎঘোষ গার্ডেন রোডে নিজেদের তেতলা বাড়ি। বেনের মাঠের কাছাকাছি।

প্রিয়তোষ গাড়ির দিকে এগিয়ে এসে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিল সুবিনয়ের দিকে। বলল, তাই নাকি! খেয়াল করিনি—

সুবিনয় বলল, না, সিগ্রেট খাব না।

প্রিয়তোষ বলল, কেন, ছেড়ে দিয়েছিস নাকি !

সুবিনয় বলল, না। এই কিছুক্ষণ আগে একটা খেয়েছি—

গাড়ির ভেতরে বসেছিল সুবিনয়ের বউ। সুখী সম্ভ্রান্ত চেহারা। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ রসিকতা করল, গিন্নীর বারণ আছে বল্ ?

সে-কথায় মজা পেয়ে জোরে হেসে উঠল সুবিনয়, যা বলেছিস। দিনে গোনাগুনতি ছ'টার বেশী সিগ্রেট খেতে দেয় না। বিয়ে তো করিসনি। করলে বুঝতি প্রিয়, বিবাহ মানেই সেলফ্ ইম্প্রিজনমেন্ট—

প্রিয়তোষ গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন ?

সুবিনয়ের বউ নড়েচড়ে জানালার দিকে এগিয়ে এল। বলল, ভাল। এদিকে কোথায় এসেছিলেন ?

প্রিয়তোষ বলল, এই কাছেই। আপনারা কোত্থেকে ?

সামনের সীটে বসেছিল একটা স্বাস্থ্যবান বিদেশী কুকুর। সেটা প্রিয়তোষকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠতে সুবিনয়ের বউ এক ধমক লাগাল। তারপর বলল, গিয়েছিলাম মার্কেটিং-এ। গড়িয়াহাটে --

প্রিয়তোষ সুবিনয়কে জিজ্ঞেস করল, তোর আজ অফিস ছিল না ?

সুবিনয় বলল, ছিল। তবে যাই নি। আজ আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভারসেরি—।

শিয়ালদহ গামী ট্রেণ বেরিয়ে যেতে সুবিনয় গাড়িতে উঠল। সশব্দে দরজা বন্ধ করল। গেট উঠে যাচ্ছে। সুবিনয় চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি ষ্টার্ট করে বলল, আয় না একদিন আমাদের বাড়িতে। কতদিন আসিসনা—। চলন্ত গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ওর বউ স্বামীর কথায় সুরে মেলাল, আসবেন কিন্তু -

যাদবপুরের ট্রেণের দেরী ছিল। প্রিয়তোষদের কলোনী ঢাকুরিয়া আর যাদবপুরের মাঝামাঝি জায়গায়। হাঁটাপথে ঢাকুরিয়া ষ্টেশন থেকে মিনিট পনেরর মত।

প্রিয়তোষ লাইন পেরিয়ে সর্টকার্ট রাস্তাধরে বাড়ির। পথে এগুতে

লাগল। দিনটা ভারি চমৎকার। সময় বারোটার কাছাকাছি। তবু রৌদ্রের তেমন তাপ নেই। প্রিয়তোষের চোখের সামনে সুবিনয়দের বাড়িটা ভেসে উঠল। দোতলায় থাকে সুবিনয়। গ্রীল-দেওয়া বারান্দা। মেঝেতে চোখ-ঝলসানো নানারঙের টাইল বসানো। বসবার ঘরে ঢুকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবকিছু পরিপাটি, নিখুঁত করে সাজানো। হালকা নীল রঙের দেওয়ালে চন্দন কাঠের একঝাঁক উড়ন্ত পাখি আঁটা। মুখোমুখি তুসার সোফা। ডানলোপিলোর গদি। মাঝখানে চকচকে সানমাইকার ডিম-আকারের টেবিল। জানালায় ফেব্রিক প্রিণ্টের সুদৃশ্য পর্দা। ঘরের এক কোণায় হাল ফ্যাসানের একটা ওয়াল ক্লক। তার নীচে বিরাট কাঠের ক্যাবিনেটে ঢাকা রেডিওগ্রাম।

হাতের পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রিয়তোষ একটা সিদ্ধান্তে আসতে চাইল। না, আর দেরী নয়। সংসারের কথা আর কত ভাববে সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার একটা বাড়ি দেখবে। তবে এদিকে নয়। টালীগঞ্জ কিংবা নিউ আলিপুরের দিকে। রিনাকে আর ঝুলিয়ে রাখবে না। মামাবাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে তুলে সোজা নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠবে। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন একটা সংসার গড়বে তারা। দেয়ালে উড়ন্ত পাখি। অ্যাকুরিয়ামে মাছ। জানালায় রংদার পর্দা। রেডিও। ঘরে ঢুকতে খানিকটা জায়গা জুড়ে টার্ফ-ম্যাট।

হঠাৎ এলোমেলো চিৎকারে প্রিয়তোষের সম্বিৎ ফিরে এল। সে তখন ঢাকুরিয়ার পূবদক্ষিণ সীমানার কাছাকাছি। কিছুলোক সামনের রাস্তা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। পরপর আকাশ ফাটানো শব্দে সামনের চৌরাস্তার কাছে কয়েকটা বোমা ফাটল। একটা আর্ত চিৎকার কানে এসে পৌঁছল প্রিয়তোষের।

ছুটে আসা একজনকে প্রিয়তোষ শুধোল, কি হয়েছে মশাই?

লোকটা তড়িৎগতিতে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার আগে বলল, পালান মশাই। খুন, খুন—

হতচকিত প্রিয়তোষ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—কয়েকটা ছেলে,—হাতে রিভলভার, বোমা, পেটো, —এগিয়ে আসছে।

প্রিয়তোষ আর দেরী করল না। এদিককার রাস্তাঘাট অলিগলি সব তার চেনা। সে ডানদিকে একটা ছোট গলির মধ্যে ঢুকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলল। একদা ফুটবল প্লেয়ার ছিল প্রিয়তোষ। ছুটতে তার কষ্ট হচ্ছিল না। আবার বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল।

দুই.

পরপর চারটে নাম। মহীতোষের নাম সবশেষে। চারনম্বরে। বোঝা যায়— কর্তৃপক্ষ অনেক বিচার-বিবেচনা করেই তার নামটা বসিয়েছে।

মহীতোষ রায়। জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর ডিলিং ক্লার্ক। অ্যাপয়েন্টেড অন দ্য ফার্স্ট মার্চ অফ নাইটিন সিক্সটি ওয়ান। সার্ভিস রেকর্ড এক্সেলেণ্ট। বারোবছরের চাকরী। লেট নট ফর এ সিঙ্গল ডে। ক্যাজুয়াল লিভ কুলো মাত্র তুদিন নিয়েছে। তুদিনই ছেলে রঞ্জনের জন্য। একদিন —যেদিন ডেলিভারীর জন্য মাধুরীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। আরেকদিন—সেদিন ছিল রঞ্জনের অন্নপ্রাশনের দিন। নো মেডিকেল লিভ অর আর্ন লিভ এনজয়েড এভার।

এফিসিয়েন্সী এ্যাণ্ড সিন্সিয়ারিটি বিয়ণ্ড ক্রিটিসিজম। অফিস ম্যানেজারের সিক্রেট ফাইলে মহীতোষ সম্পর্কে ছোট একটা নোট আছে : ······ভেরি সাবমিসিভ, এফেক্টিভ এ্যাণ্ড ডিউটিফুল।

এহেন মহীতোষ রায় উনিশশ' বাহাত্তর সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে অফিসে পৌঁছে জানতে পারল একত্রিশে জানুয়ারীর পর থেকে সে আর চাকরীতে নেই। সেদিন মহীতোষ অফিসে পৌঁছেছিল কাঁটায় কাঁটায় নটা পঁয়তাল্লিশে। অফিস বসার ঠিক পনের মিনিট আগে। যেমন আসে প্রতিদিন। লিফট ধাতব শব্দ করে ফোরথ ফ্লোরে নামিয়ে দিলে মহীতোষ তুপা এগিয়ে সুইং ডোর খুলে অফিস-ঘরের ভেতরে ঢুকবার মুখে বাঁদিকের দেয়ালে নোটিশবোর্ডে চোখ রেখেছিল। এবং নোটিশবোর্ডের কালো'রঙের ভেলভেট কাপড়ে গোল নিকেলের পিনে আঁটা নোটিশটা দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর লেটার প্যাডে অফিস ম্যানেজারের স্বাক্ষরসমেত টাইপ করা একখানা খোলা চিঠি। বলা বাহুল্য লেখা ইংরাজীতে। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়ঃ জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্-এর তিরিশ বারো একাত্তর তারিখের এক জরুরী সভা আমদানি-রপ্তানী বাণিজ্যের দীর্ঘকালব্যাপী মন্দা চলায় নিরুপায় হয়ে নিম্নলিখিত কর্মচারীদের একত্রিশ এক বাহাত্তর তারিখের পর আর কর্মে বহাল রাখতে সমর্থ হচ্ছে না।

মহীতোষ ভাল করে চিঠিটায় চোখ বোলাল। অভ্যাসবশতই। যেমন করে সে নানান ধরনের চালানগুলো বারবার পরীক্ষা করে পাশ করে।

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত নয়,। মাসকয়েক ধরেই কোম্পানীর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানী মূলত ক্লিয়ারিং এজেন্ট। এছাড়া টুকটাক ব্যবসা যা আছে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ফরেন এক্সচেঞ্জের ক্রাইসিস চলছে বহুদিন ধরে। ইম্পোর্ট লাইসেন্সও আর ছাড়া হচ্ছে না ওয়েষ্টবেঙ্গলে। 'মোষ্ট ডিসটার্ব প্রভিন্স' -এই অজুহাতে নতুন লাইসেন্স পাচ্ছে বম্বে-ওয়ালারা। উপরন্তু, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যাপারে যেটুকু বা কাজ চলছে তা-ও বানচাল হতে বসেছে ডক লেবার ট্রাবলস্-এ। প্রায়ই ডেমারেজ চার্জ দিয়ে মাল খালাস করতে গিয়ে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাচ্ছে।

এসব তখন মহীতোষের অজানা নয়। প্রায় প্রতিদিন অফিস ছুটির পর কালো মুখ করে সে বাড়ি ফিরছে। সুহাসিনী ছেলের মুখ দেখে মনের ব্যথা ছেঁকে বার করতে চেষ্টা করেন। বলেন, কিরে মহী, চুপচাপ আছিস যে বড়। অফিসের খবর কি ?

মহীতোষ প্রতিবারই এক উত্তর দেয়, ভাল নয় মা।

সুহাসিনী সাম্ত্বনা দিতে চান? বলেন, চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুহাসিনীর কথাই ওই ধারার। এ সংসারে আসার পর থেকে বিপদ আপদ যেন তার অঙ্গের ভূষণ। অনেক জল ঝড় সয়েছেন তিনি। দুর্ভাবনা তার গা সওয়া হয়ে গেছে। তাই সরল করে কথা বলেন।

মাধুরীর উত্তর অন্যরকমের হয়। আজকাল অফিসের প্রসঙ্গ তুললেই সে বলে, অত প্যানপ্যান করো না তো। যা হবার তা হবে।

একবছর আগে হলে মাধুরী তার কথায় এতটা অসহিষ্ণু হয়ে উঠত না। কেননা, তাদের সংসারে মাধুরীর মত ভয়কাতুরে আর কেউ ছিল না। উপদেশ দিত। বলত, আর একটু মন জুগিয়ে চলো না কর্তৃপক্ষের। এই বাজারে চাকরী গেলে কি যে হবে—

গত বছরের মার্চ মাসে মাধুরী চাকরী পেয়েছে। এক আধা-সরকারী অফিসে। মহীতোষের বিয়ে হয়েছে উনষাট সালের শেষের দিকে। বারোবছর একটানা হালভাঙ্গা সংসারের জোয়াল কাঁধে বয়ে বয়ে মাধুরীর অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। না শরীর না মন।

সেই মাধুরী চাকরী পাবার পর একটু একটু করে নিজেকে খুলছে। সংসারের কুম্ভীপাক থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরের আলো হাওয়ায় পড়ে ফের তরতাজা হয়ে উঠছে দিনে দিনে। চিন্তা-ভাবনা-ভয় কেটে গিয়ে আত্মনির্ভরতাবোধে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠছে। তাই, মহীতোষের অফিসের সংকটের কথা তাকে আর উদ্বিগ্ন করেনা। বরং বিরক্তি আনে।

সবুজ রঙের কালিতে টাইপ করা চিঠি। দেখেই বুঝল মহীতোষ সুবোধ মিত্তিরের হাতের কাজ। সুবোধ মিত্তির ভাল টাইপিষ্ট। পরিপাটি করে টাইপ করা। নির্ভুল। বার দুয়েক পড়ার পর দৃষ্টি বেভুল হয়ে পড়ছিল। আসলে, চিন্তা আর চোখ দুটোকে একসঙ্গে চালনা করতে পারছিল না মহীতোষ।

ছোট একটা চাপা নিশ্বাস ছেড়ে দিতে বুকের ভেতরে বুড়বুড়ি কাটল মহীতোষের। চাকরী চলে যাবার প্রতিক্রিয়াটা যতটা হৃদয়-বিদারক হওয়া উচিত ছিল তা হচ্ছিল না বহুদিন রোগ ভোগের পর

কেউ মারা গেলে আত্মীয়জনের শোক যে-জাতীয় সহনীয় সংযম পায়—, 'চাকরীটা থাকবে না'—এই উদ্বেগে দিনের পর দিন জর্জরিত হয়ে হয়ে আজ চরম মুহূর্তে মহীতোষের প্রতিক্রিয়াটাও তেমি স্বাভাবিকতার স্তর অতিক্রম করল না।

অনবধানতাবশত চাদরের একটা অংশ খসে পড়েছিল। সেই দিকটা কাঁধের দিকে তুলে দিল মহীতোষ। জানুয়ারীর শুরু। কদিন হল দাঁতাল শীত জোর উপদ্রব শুরু করেছে। ছেলেবেলা থেকে সর্দিকাশির ধাত মহীতোষের। চাদরের নিচে ফ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী। তার নিচে সোয়েটার, গেঞ্জী। তবু, বেলা দশটা না বাজতেই শীত যেন ছেঁকে ধরেছে মহীতোষকে।

লিফ্‌টটা সশব্দে নেমে যাচ্ছে। পাঁচতলায় দাঁড়াল না। এখন সবার ওঠার পালা। নিচে নেমে যাবার মত কেউ নেই।

চোখ থেকে চশমাটা খসাল মহীতোষ। শীতকালে শহরের ধোঁয়াশায় চশমার কাচ কেবলই অস্বচ্ছ হয়ে আসে। কাপড়ের খুঁটে চশমার কাঁচ পরিস্কার করে স্যুইংডোর খুলে ভেতরে ঢুকল মহীতোষ।

এগার বছর হল এই অফিসে চাকরী করছে। মহীতোষ অন্ধের মত চোখ বুজে এই হলঘরসদৃশ অফিসঘরের যেখানে খুশি হেঁটে চলে যেতে পারে। চিন্তা না করেই বলে দিতে পারে– এ ঘরে ক'টা জানালা-দরজা, ক'টা পাখা টেবিল চেয়ার র‍্যাক, ক'টা কুজো এবং কোথায়।

ডানদিকে প্লাইউডের একটা ছোট ঘেরা টোপ। অফিসের বেয়ারা গণেশ এখন ওই ঘরে আছে। একটুবাদেই আগরওয়াল সাহেব আসবেন। অফিস-ম্যানেজার। গণেশ ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে করে তুলতে ব্যস্ত।

বাঁদিকের কোণায় সুবোধ মিত্তির ঘাড় গুঁজে টাইপ করে যাচ্ছে। সুবোধ মিত্তির আসে মহীতোষের অনেক পরে। আজ ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই কিছু জরুরী কাজ পড়েছে সুবোধ মিত্তিরের। তাই আজ এত সকাল সকাল এসেছে। ডানদিকে আগরওয়াল সাহেবের

চেম্বার ছাড়িয়ে নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যাবার সময় ভাবতে চাইল মহীতোষ : কি এমন জরুরী কাজ। শুধুই কি সাদা কাগজে কিছু সবুজ কালির অক্ষর ভরিয়ে তোলা! না, সুবোধ মিত্তির নির্ঘাৎ কিছু ভয়ঙ্কর শব্দ গেঁথে তুলেছে অক্ষরে। পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল মন্দা। জাপানে মুদ্রামূল্যের হ্রাস হয়েছে। ডলার ক্রাইসিস। ইম্পোর্টাররা চিন্তিত। ডক্ ম্যানেজারকে অনুরোধ জানানো। এ্যাকিউট লেবার ট্রাবলস্। মাল ঠিকমত লোডিং আন-লোডিং হচ্ছে না। কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। তার অর্থ! কেউ রেহাই পাবে না। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস ফের জরুরী সভার তলব করেছে! আরো ছাটাই করতে হবে!

মহীতোষের পাশের টেবিল কমলেশ সেনের। একবছরও হয়নি এ কোম্পানীতে ঢুকেছে কমলেশ। গত শ্রাবণে বিয়ে করেছে। কোয়াইট ইয়ংম্যান। আমুদে প্রাণখোলা ছেলে। অডিট এ্যাকাউন্টস-এ তুখোড়। নোটিসবোর্ডে ওর নামটা আছে সবার প্রথমে। তারপর রমেন আর সুভাষের নাম। পরের দুজন পুরোপুরি অফিস স্টাফ নয় : ফিল্ডে কাটায়। ফোনে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। সপ্তাহে এক আধদিন আসে এখানে। সব সময় ডকে থাকে। লোডিং আন-লোডিং সুপারভাইজ করে।

মহীতোষ চেয়ারে বসল। এখনো দশটা বাজে নি। একটু বাদেই ঘর ভরন্ত হয়ে উঠবে। সুবোধ মিত্তির তার উপস্থিতি টের পেয়ে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মাথা নিচু করে টাইপ করে চললেও মহীতোষের বুঝতে কষ্ট হল না—সুবোধ মিত্তির স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারছে না।

রেকাব তুলে কাঁচের গ্লাসটা কাছে টানল মহীতোষ। পরিমাণমত জল গলায় ঢালল। তারপর পকেট থেকে পানের কৌটো বের করল। সুহাসিনী পান সেজে দেন। গোন্দা গুনতি চারটে। একটা

পান মুখে পুরল। চূণ ধরল জিভের ডগায়। তারপর হাত বাড়িয়ে র‍্যাক থেকে একটা ফাইল বের করল।

গণেশ আসায় হঠাৎ তাল কেটে গেল। নইলে মনটাকে শান্ত করে কাজে মন দিয়েছিল মহীতোষ। গণেশ এসে বলল, আগরওয়াল সাহেব আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন—

মহীতোষ মুখ তুলতে দেখল অফিসঘর স্টাফে ভরে গেছে। পাশের চেয়ারে কমলেশ গুম্ হয়ে বসে। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে। ভ্রুক্ষেপ নেই ওর।

তেতো মুখে মহীতোষ বলল, যাচ্ছি। হাতের কাজটা সেরে নিই—

গণেশ তবু দাঁড়িয়ে রইল। বলল, একটু তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন—

মুহূর্তে মহীতোষ উষ্ণ হয়ে উঠল, বলছি তো যাচ্ছি। তুমি সরো তো এখান থেকে এখন—

গণেশ ধমক খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে চলে গেল।

গণেশের একটা পা খোঁড়া। জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীতে ও আছে শুরু থেকে। সাদামাটা লোক। পা-টা জখম হবার পিছনে একটা করুণ ইতিহাস রয়েছে। বহুদিন আগে দেশের বাড়িতে গণেশের বউ আর দুই বাচ্চা কলেরায় মারা যায়। দুদিনের মধ্যে। বেচারা শোকে পাগল হয়ে ইদারায় ঝাঁপ দেয়। আত্মঘাতী হবে বলে। কিন্তু, বিধি বাম। প্রাণে মরেনি গণেশ। কিন্তু একটা পা চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে যায়।

'আগরওয়াল সাহেব আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন' —এই কথাটা প্রথম মহীতোষকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাহলে কি গণেশও জেনে গেছে—আর কদিনবাদে তার চাকরী খতম হয়ে যাচ্ছে! ফালতু হয়ে যাবে মহীতোষ। এই জাতীয় কল্পিত অপমানবোধই মহীতোষকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল।

ফাইলে আর চোখ বসাতে পারল না মহীতোষ। মগজের ভেতর একটা অস্বস্তি পাক খাচ্ছে। গণেশকে উষ্ণ গলায় কথা বলার জন্য মহীতোষের আফশোস হচ্ছিল।

গণেশ বরাবর মহীতোষের শুভার্থী। যেদিন এখানে চাকরীর ধান্ধায় এসেছিল সেইদিন থেকে। ইনটারভিউ সেরে বাইরে বেরুতে ওর মুখোমুখি পড়েছিল মহীতোষ।

সামান্য এক বেয়ারাকে প্রশ্ন করাটা মূর্খামি জেনেও ফস্ করে কথাটা সেদিন মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল প্রিয়তোষের, কি হে, চাকরীটা কি হবে। না, আগের থেকেই লোক ঠিক করে রাখা হয়েছে—

গণেশ আন্তরিকতার সঙ্গে সেদিন বলেছিল, কেন হবে না বাবু। আপনাদের মত আদমীর না হলে কাদের হবে।

গণেশ জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর নাটবল্টুর বেশি কিছু নয়। জ্যোতিষীও নয়। তবু, চাকরীটা হয়ে গিয়েছিল মহীতোষের। সেই থেকেই সে ভাল চোখে দেখে আসছে গণেশকে। মহীতোষের ধারণায়—তার চাকরী পাবার পেছনে গণেশের কোন হাত না থাকলেও সেদিনকার সেই শুভেচ্ছার একটা মস্ত দাম আছে।

ভেতরে ঢুকতে আগরওয়াল সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মহীতোষকে হাত বাড়িয়ে সামনের চেয়ারটায় বসতে বলে নিজেও বসলেন। তারপর, চাকরী যাবার মুখে অথরিটি যেজাতীয় সহানুভূতিসূচক কথা বলে, আগরওয়াল সাহেবও সেসব কথা বললেন। ভেরি সরি মিষ্টার রয়। আপনার মত এফিসিয়েন্ট লোককে আমরা হারাতে চাইনি। কিন্তু, কোম্পানীর যা অবস্থা। আপনিতো সবই জানেন। অন্ দ্য ভার্জ অফ লিকুইডিশন। তবু আমি পারটিকিউলারলি আপনার জন্যে ফাইট করেছিলাম। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস শুনল না সে কথা। আপনার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আমি যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব অফিসকে ডিসবার্স করার নির্দেশ দিয়েছি। মাঝে মাঝে খোঁজ নেবেন। আমরা একটু সামলে উঠতে পারলেই আপনাকে কল্ করব। হোপ ইওর গুড লাক। আরো অনেক কথা বলল আগরওয়াল সাহেব। যার অনেকটাই মহীতোষের কানে গেল না। আগরওয়াল সাহেবের চেম্বার থেকে বেরুতে একটা হীনমন্যতাবোধ মহীতোষকে ছেঁকে ধরল। সে চোখ তুলে তাকাতেই পারছিল না। কেননা, তার ধারণায় চারপাশের লোকজনেরা তার দিকে সমবেদনা কিংবা অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মহীতোষ সব সইতে পারে। যে কোন দুঃখ দুর্দৈব সয়েছেও জীবনে কম নয়। কিন্তু তাচ্ছিল্য নয়।

নিজের চেয়ারে এসে বসতে গিয়ে কমলেশ সেনের কথায় তার চিন্তা কেটে গেল। কমলেশ শুধোল, আপনাকে আগরওয়াল কি বলল, রায়দা ?

কমলেশ এতটুকু নার্ভাস হয় নি। বরং, ওর কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তেজনা চলকাচ্ছিল।

কমলেশের চোখে চোখ রাখল মহীতোষ। এই সাহসে যে—এই হলঘরে অন্তত কমলেশ তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাবে না।

বলল উত্তাপহীন গলায়, কি আর বলবে, দুঃখপ্রকাশ করল। আর —কমলেশ তাকে শেষ করতে দিল না কথাটা। বলল, দুঃখপ্রকাশ ! ওই স্কাউণ্ড্রেলটা ! ছো !

কমলেশের কথাটা নিজের গায়ে মেখে নিয়ে লজ্জিত কণ্ঠে বলল মহীতোষ, ওকথা বোলো না। আগরওয়াল সাহেব ভালমানুষ। যথেষ্ট সিমপ্যাথটিক—

ফল হল উল্টো। মহীতোষের কথায় কমলেশ আরো তেতে উঠল, সিমপ্যাথটিক না কচু। ওই শালাই তো যত নষ্টের গোড়া। নাটের গুরু। তলে তলে ও-ই সব ফন্দী এঁটেছে—

মহীতোষ কমলেশকে নিরস্ত করতে চাইল, এটা তুমি ঠিক বললে না কমলেশ। আমাদের চাকরী থাকা না থাকার ব্যাপারে ওর কতটুকু হাত। সবই বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের—

পেছনের শার্সি গলে শীতের নরম রোদ এসে কমলেশের মুখে পড়েছে। এম্নিতেই ও ফরসা। তার উপর রোদ পড়ায় মুখ রক্তবর্ণ। কমলেশ বলল, বাজে কথা। আগরওয়াল চুকলি না কাটলে এতদূর গড়াত না। এই ধরোই না তোমার কথা। তুমি তো রায়দা পুরান স্টাফ। অনেষ্ট, সিন্সিয়ার। তোমাকে ছাটাই করতে যাবে কেন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস। আর কি লোক ছিল না। আমার কথা না হয় ছাড়ো। আমি নতুন এসেছি।

এপাশ ওপাশ সামনের টেবিলের স্টাফেরা আড়চোখে তাকাচ্ছিল কমলেশের দিকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল ওর কথা।

মহীতোষ সেটা টের পেয়ে গলার স্বর খাটো করে ধমকের সুরে বলল, আহ হচ্ছে কি। আস্তে বলো না। চেঁচাচ্ছ কেন—

কমলেশ থামল না।—সমান তোড়ে বলল, চেঁচাব না তো কি। ভয়টা কাকে। যা হবার তা তো হয়েই গেছে রায়দা।

ওর অনুমানে মহীতোষের সায় ছিল না। আগরওয়াল সাহেবকে সে বারোবছর ধরে দেখে আসছে।—লোকটা আর যাই হোক এতটা নীচ হতে পারে না। তাছাড়া, মহীতোষ সহজে কাউকে অবিশ্বাস করতে শেখেনি।

তবু মহীতোষ চুপ করে গেল। ওকে ঘাঁটাতে চাইল না। কমলেশের কথায় ঝাঁঝ থাকলেও জোর ছিল না। সদ্য বিবাহিততর তাজা যুবক। জীবনের শুরুতেই একটা বড় রকমের হোঁচট খেতে চলেছে। স্বভাবতই ওর প্রতিক্রিয়াটা সংযত না হবারই কথা।

শেষপর্যন্ত আগরওয়াল সাহেবই মহীতোষকে বাঁচাল। টিফিনের কিছু আগে গণেশ এল একটা চিঠি নিয়ে। চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে এক পার্টিকে। জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর শাঁসালো ক্লায়েণ্ট।

মাল আনলোডিং সংক্রান্ত জরুরী চিঠি। চিঠিটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিলেই মহীতোষের আজকের মত মুক্তি।

লিফ্‌টে চেপে নিচে নেমে আসতে গা থেকে যেন শীত ঝরে গেল। বাইরে শহর কলকাতা জমজমাট। শীতের চমচমে রোদ। ব্যস্ত মানুষ আর যানবাহনের চলাচল। যেদিকে তাকাও উপচে পড়ছে জীবন। সামনের ফুটপাতে বিচিত্র মানুষের স্রোত। ভবঘুরে ভিখিরি, অহংকারী যুবক, উদাসীন বিদেশিনী পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। বড় পুকুরের কোণা থেকে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে ট্রাম। মাটির গভীর থেকে আর্তনাদের মত আহত শব্দের জন্ম দিতে দিতে। দূরে বড় পোষ্ট-অফিসের গম্বুজে লটকানো গোল ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। মোড়ে লাল আলো জ্বলে উঠল। জেব্রা ক্রসিং-এ ভিড় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। গাড়ি বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে অলস দাঁড়িয়ে আছে বাঁশিঅলা। প্রতিদিনের মত একই সুরে বাঁশি বাজাচ্ছে। সব ছবিই স্বাভাবিক। যেমনটা রোজ দেখে মহীতোষ। কোন ব্যতিক্রম নেই। তবু, এত কোলাহল ব্যস্ততার কাছাকাছি থেকেও সে কোন উষ্ণতা অনুভব করল না। বরং, চারপাশের সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে হল মহীতোষের। সব দৃশ্যই মনে হল অলীক, স্বপ্নবৎ।

ক্লায়েন্টের অফিস কাছেই। বড় পুকুরের ওধারে। চিঠিটা সেখানে পৌঁছে দিয়ে রাস্তায় নেমে আসতে বিচ্ছিন্নতাবোধ আরো তীব্র হয়ে উঠল। চব্বিশ ঘন্টা আগে হলে এজাতীয় সমস্যায় পড়ত না মহীতোষ। ফের অফিসে চলে যেত। এ টেবিলে সে টেবিলে ঘুরত। খুচরো গল্প করে সময় কাটাত। তারপর ঘড়ির ছোট কাঁটা পাঁচটার ঘরে এসে থমকে দাঁড়াতে বেরিয়ে পড়ত মহীতোষ।

আজ অফিসে ফিরে যাবার কথা মনে হতে ভেতর থেকে কোন সাড়া পেল না মহীতোষ। অথচ, তার মত অফিস-পাগল লোক জৈন

এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীতে একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিদিন ঠিক সময়ে হাজির হওয়া, নিখুঁতভাবে নিজের কাজটুকু নির্ধারিত সময়ের আগে করে ফেলা—এসব ব্যাপারে মহীতোষের জুড়ি নেই। জলঝড় মিছিল বিক্ষোভে কলকাতা শহর দুর্গম হয়ে উঠলেও মহীতোষের কামাই নেই একদিনও। এর জন্যে তাকে ঘরে বাইরে কম কটূবাক্য শুনতে হয় নি।

কলিগরা বলে : এ তোমার বাড়াবাড়ি রায়দা। একটা দিনও কি ইচ্ছে করে না কামাই করতে। এত যে খেটে মরছ—এরজন্যে কোম্পানী কি তোমাকে রাজা বানিয়ে দেবে?

মহীতোষ ওদের কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে : খামাকা কামাই করে লাভ কি বল্। তার চেয়ে এখানে এলে তবু তোদের সঙ্গে দুচারটে কথা হয়। কাজের চাপে গল্প গুজবে সময় কাটে। বাড়িতে থাকলে সময় কাটতে চায় না।

কেউ তখন ফোড়ন কাটে : সময় কাটানোই যখন তোমার বড় সমস্যা—তখন একটা কাজ করো না। আগরওয়াল সাহেবকে বলে রোববারও যাতে অফিসে আসতে পার তার চেষ্টা করো না।

আর সবাই তখন হেসে ওঠে। তাতে আহত হয়না মহীতোষ। বরং, সে যে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কোম্পানীর জন্যে মেহনত করে যাচ্ছে—এই আত্মপ্রসাদে ডগমগ হয়ে ওঠে।

একই কারণে বাড়ীতেও মহীতোষকে গঞ্জনা সইতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান, খাওয়া—সব কিছুতে সে এত তাড়াহুড়ো করে যে মনে হয় বাড়ি থেকে বেরুতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

এই নিয়ে সবচেয়ে খিটিমিটি বেধে যায় মাধুরীর সঙ্গে। সে হয়ত কোনদিন বলল, একি নোংরা কাপড়টা পরেই অফিসে চললে নাকি! ঘরে তো কাচা কাপড় রয়েছে। ওটা ছাড়ো—

সে কথায় মহীতোষের গায়ে যেন জলবিছুটির জ্বলুনি শুরু হয়ে

যায়। সে বলে, ওরে সংকট ! সাড়ে আটটা বেজে গেছে। দেরী করলে ট্রেণ ফেল করব—

আগে এজাতীয় অজুহাতের পর মাধুরী আর রা কাড়ত না। আজকাল, চাকরী পাবার পর, সে-ও বলতে ছাড়ে না, হলোই নাহয় একদিন দেরী। তাতে কি এমন মহাভারতটা অশুদ্ধি হবে শুনি—

মহীতোষ প্রসঙ্গটাকে চাপা দিতে চায়। বলে, দেরী ! অসম্ভব। হাতে একগাদা কাজ পেনডিং—

মাধুরী মুখিয়ে ওঠে, বাজে কথা রাখো। চাকরী যেন তুমি একলাই করো—

বারান্দা থেকে প্রিয়তোষ মাধুরীর সঙ্গে সুর মেলায়, ও কথা বোলো না বৌদি। দাদাকে পৌঁছুতে হয় সকলের আগে। নইলে অফিসের ঝাঁপ কে খুলবে।

পথ চলতে চলতে এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল মহীতোষ। ভাবল ঃ বাড়ি ফিরে যাবে। বাড়ীতে পৌঁছুতে পারলে বিছানায় গা এলিয়ে দেবে। তাতে উদ্বেগ-উত্তেজনা খানিকটা কমবে।

এই ভেবে মহীতোষ বাস স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল। একটা ফাঁকা বাস পেয়েও গেল। কিন্তু, এগিয়ে গিয়েও হঠাৎ সে দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে ভাবনাটাকে নাকচ করল। অসময়ে বাড়ি ফিরলে সুহাসিনী-ললিতমোহন দুজনেই উদ্বিগ্ন হবেন। উদ্বিগ্ন হবেন এই ভেবে যে হয়ত ছেলের শরীর খারাপ হয়েছে। প্রশ্ন করবেন। তখন মিথ্যের আশ্রয় নিতে হবে। আজেবাজে বলে ওদের ঠেকাতে হবে। সে সব কথায় ললিতমোহন আশ্বস্ত হলেও সুহাসিনী হবেন না। অন্নতোষ বাড়ী থেকে ফেরার হবার পর থেকেই মা কেমন সামান্য ব্যাপারে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। চট করে কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সত্যকথাটা বললে তো আর কথাই নেই।

ভাবনাটাকে ঘোরাতে চাইল মহীতোষ। ভাবল: কোন বন্ধুর ডেরায় গিয়ে দুদণ্ড সাতসতের গল্প করে মনের ভার কিছুক্ষণের জন্য হলেও হালকা করার চেষ্টা করবে। নীরদ, বিজন, সীতেশ, অধীর যে কোন একজনের হদিশ পেলেই হল।

কিন্তু, এই পরিকল্পনাটাকেও মনের ভেতর বেশিক্ষণ লালন করতে পারল না মহীতোষ। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই আজ কতকাল। সংসার-চাকরী, দায়িত্ব আর কর্তব্য - জীবন যাপনের এই জাঁতাকলে পড়ে মহীতোষ অনেকদিন হল ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হঠাৎ গিয়ে হাজির হলে ওরা তাকে কে কেমনভাবে নেবে কে জানে। তাছাড়া, হয়ত সকলেই সময়ের ব্যবধানে তার মত সংসার আর চাকরী --জীবনের এই দুই খুঁটিতে বাধা পড়ে উত্তাপহীন হয়ে পড়েছে এবং সেটাই স্বাভাবিক। ফলে, ওদের বিব্রত করে তোলা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না মহীতোষের।

পাশ থেকে কেউ একজন কনুই দিয়ে সজোরে ঠেলা মেরে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, আচ্ছা মানুষ তো! রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেলতে দুলতে চলেছেন—

ধমকটায় কাজ হল। মহীতোষ নিজের মধ্যে ফিরে আসতে চট্ করে একটা মোক্ষম সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল। হঠাৎ তার মাধুরীর কথা মনে পড়ে গেল। এবং মাধুরীর কথা মনে হতেই সারা শরীরে এক-জাতীয় উষ্ণতা খেলে গেল। মাধুরীকে এখন কাছে পেলে মহীতোষ সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেতে পারে। সে জানে—তার চেয়ে মাধুরীর মনের জোর অনেক বেশি। চাকরী চলে যাচ্ছে একথা জানবার পরে মাধুরী তাকে নানানভাবে সামাল দেবার চেষ্টা করবে। তার মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে।

মাধুরীর অফিস বেশি দূরের পথ নয়। থিয়েটার রোডে। এখন হাতের কাছে যেটা পাওয়া যায়, ট্রাম কিংবা বাস, একটায় চেপে আধঘণ্টার মধ্যে সে পৌঁছে যেতে পারে মাধুরীর অফিসে।

আচমকা মহীতোষকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে কাছে আসতে আসতে চোখ বড় করে বলবে মাধুরী, তুমি হঠাৎ, কি মনে করে?

মহীতোষ যথাসম্ভব সহজ সুরে বলবে, এম্নি এলাম—

মাধুরী বিশ্বাস করবে না। ভ্রূ কুঁচকে কপালের মাঝখানে ভাঁজ ফেলে বলবে, উঁহুঁ, এম্নি আমাকে অফিসে দেখতে আসার পাত্র তুমি নও। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। কি হয়েছে বলো—

মহীতোষ তখন আর স্থির থাকতে পারবে না। গলার স্বর কেঁপে উঠবে, তেমন কিছু নয়। একবার বাইরে চলো। বলছি –

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠবে, ঠিক আছে। চলো, রিসেপশন রুমে যাই—

মহীতোষ তখন অনুরোধজড়িত গলায় বলতে চাইবে, অফিসারকে বলে ছুটি করিয়ে নাও না। অনেক কথা বলার আছে তোমাকে—

এই পর্যন্ত ভেবে মহীতোষ ফের হতাশ হয়ে পড়ল। এখনো মাধুরীর পোষ্টটা পাকা হয়নি। ছুটি চাইতে গেলে অফিসার মুখে সম্মতি জানালেও মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবেন।

মহীতোষ রাস্তার কোণায় একটা থামের কাছে এসে দাঁড়াল। নিরাপদ জায়গায়। কুয়াশা মুছে রোদ উঠলে চারদিক যেমন ফরসা হয়ে ওঠে তেম্নি চারপাশের সব দৃশ্য ধীরে ধীরে সজীব মনে হতে লাগল মহীতোষের। এবং শেষপর্যন্ত সে একটা উপায় খুঁজেও পেল।

দ্রুতপায়ে বড় পোষ্টঅফিসের সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে ওপরে উঠে টেলিফোন বুথের দিকে এগিয়ে এল মহীতোষ। ডায়াল ঘুরোবার সময়টুকু পর্যন্ত তার তর সইছিল না।

প্রথমে ধরল এক ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ পরে মাধুরী।

মাধুরী বলল, কে আপনি?

বোঝা গেল কাজে ব্যস্ত মাধুরী। টেলিফোনে সংবাদ সে দ্রুত সারতে চায়।

মহীতোষ দমচাপা গলায় উত্তর করল, আমি, মাধুরী—

ওধারে মাধুরীর কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবার পরেই দপ্ করে নিভে গেল মহীতোষ। একটা ভয়ঙ্কর খবর জানাতে হবে ওকে—এই চিন্তাটা বসন্তের গুটির মত মাথায় চারিয়ে উঠতে মহীতোষের গলার স্বর অস্বাভাবিক হয়ে উঠল।

মহীতোষ ফের অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি বলছি মাধুরী—

মাধুরী বিরক্ত গলায় বলল, 'আমি' বললে কি বুঝব। নামটা বলুন।

মহীতোষ হতাশ হয়ে পড়ল ওর কথায়। মাধুরী তাকে চিনতে পারছে না! বুকের সবটুকু নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে সে কণ্ঠস্বরকে তীক্ষ্ণ করতে চাইল, আমায় চিনতে পারছ না। আমি মহীতোষ—

মাধুরী স্বভাবিক গলায় বলল, ওহ্ তুমি! আমি ধরতেই পারিনি। হঠাৎ কি মনে করে?

মাধুরীর প্রশ্নে মহীতোষের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কি বলবে সে। তার চাকরী চলে যাচ্ছে! কোন ভণিতা না করেই। মাধুরী কিভাবে নেবে সংবাদটা!

হাতের রিসিভার নড়ে নড়ে যাচ্ছিল, তোমার সঙ্গে একটা জরুরী দরকার আছে। একবার অফিস থেকে বেরুতে পারবে?

এ জাতীয় প্রস্তাবে মাধুরীর অবাক হবার কথা। এই প্রথম সে মাধুরীকে অফিসে ফোন করছে।

মাধুরী সামান্য নীরবতার পর বলল, কি ব্যাপার বলো তো। বাড়ির সবাই ভালো আছে তো?

মহীতোষ আমতা আমতা করল, না—না, সে সব কিছু নয়। দরকারটা আমার—

মাধুরী বিশ্বাস করতে চাইল না কথাটা। এমন কি জরুরী দরকার থাকতে পারে মহীতোষের। যার জন্যে ফোন করে তাকে তলব করতে হবে। মাধুরী বলল, দরকারটা কি বলোই না। অন্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে?

মহীতোষের ইচ্ছে করছিল রিসিভারটাকে কাঠের বাক্সের ওপর একবার হাতুড়ির মত সজোরে ঠুকে দেয়।

সে বলল অসহিষ্ণু গলায়, না-না। অনুর কোন খবর নয়। একটা খবর দেব তোমাকে—

মাধুরীর কণ্ঠস্বর খরতর হয়ে উঠল, সে খবরটা কি ফোনে দেওয়া যায় না?

মহীতোষ বলল, না। তোমাকে একবার আসা দরকার।

মাধুরী বলল, কোথায়?

মহীতোষের ছটফটানি বেড়ে গেল, বিড়লা প্ল্যানেটরিয়ামের সামনে এসে দাঁড়াতে পারবে?

মাধুরী শুধোল, কখন?

মহীতোষ বলল, যত তাড়াতাড়ি পারো। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

মাধুরী বলল, অসম্ভব! এখন বেরুতে পারব না, মিষ্টার চ্যাটার্জি অফিসিয়াল কাজে রাইটার্সে গেছে। ওর পারমিশন ছাড়া—

মিষ্টার চ্যাটার্জি মাধুরীদের অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

মহীতোষের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে এল, ছাখো না। যদি একবার আসতে পারো, ভাল হয়—

এবার মাধুরীর সজাগ হবার পালা। সে প্রশ্ন ছুড়ল, কি ব্যাপার বলো তো? তুমি আজ অফিসে যাওনি?

মহীতোষের রক্তচাপ বেড়ে গেল, গিয়েছিলাম। এই কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে এসেছি –

মাধুরী বলল, তার মানে! এখন তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?

মহীতোষ ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ফোনটা নামিয়ে রাখল।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতগ্রস্তের মত পথ চলতে লাগল মহীতোষ। রোদের তেজ কমে আসছে। চারপাশের রাজকীয় বাড়িগুলোর মাথায়

রূপো-রঙ চলকে উঠছে। শীতের বেলা। দেখতে দেখতে বিকেল নেমে এল।

মহীতোষ কোণাকুনি রাস্তা পেরুল। লোকজন, ভিড়, ট্রামবাস চলাচলে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। একবার এদিকের ফুটপাতে এসে দূরের ন'তলা বাড়িটায় চোখ রেখেছিল মহীতোষ। পাঁচ তলার ছোট্ট-ব্যালকনি, যার পেছনে কাচের শার্সি, শার্সির ওধারে খয়েরী রঙের পর্দা, পর্দার ওপারে নিসিদ্ধ জগৎ – যেখানে একটানা সে বারোবছর কাজ করেছে। সেই ছোট্ট ব্যালকনিটাকে খুঁজতে চেষ্টা করল মহীতোষ। এতদূর থেকে ঠিকমত হদিশ করতে পারল না ব্যালকনিটাকে।

এটাই স্বাভাবিক। কাছের জিনিসকে দূর থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। কেমন একটা অপরিচয়ের ঘোর লাগে তাতে।

জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীতে ঢুকবার আগে মহীতোষ কাজ করত এক গেঞ্জির কলে। ফ্যাক্টরী ছিল কসবায়। মাইনে কম পেত। নতুন চাকরীর এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেয়ে সবার আগে সে মাধুরীকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি বলো? চাকরীটা নেব।

তখনো তাদের বিয়ের এক বছর ঘোরে নি। মহীতোষের কথায় তাই দায়সারা উত্তর করেছিল মাধুরী, তার আমি কি বলব। যা ভাল বুঝবে করবে।

মহীতোষ অভিমানহত গলায় বলেছিল, বোঝা না বাঝার কথা হচ্ছে না। তুমি এখন আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাই একটা পরামর্শ চাইছিলাম, এই আর কি।

সে-কথায় মাধুরী জোর পেয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করেছিল, আমার তো মনে হয়, নেওয়াই উচিত। ভাল মাইনে, ওভারটাইম বোনাস আছে।

মহীতোষ আরো একটু ঝালিয়ে নিতে চেয়েছিল, সাত বছরের ওপরে কাজ করছি এখানে। সবাই চেনাজানার মধ্যে। তাছাড়া মালিক ভদ্রলোক যথেষ্ট খাতির করে—

এরপর মাধুরীর মনে ইচ্ছেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অতশত ভাবলে কি চলে। জীবনে উন্নতি করতে হলে ঝুঁকি নিতেই হবে। নইলে ওই গেঞ্জীর কারখানায় ধুঁকতে হবে সারাজীবন। সুযোগ তো আর আকছার আসে না—

জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীতে জয়েন করেছিল মহীতোষ। বলতে গেলে মাধুরীর কথায়। উন্নতি আয়বৃদ্ধি সবই ঘটেছিল। কর্তৃপক্ষের খাতিরও জুটেছিল কপালে। তবু, শেষপর্যন্ত রইল না চাকরীটা!

গভর্ণর হাউসের পশ্চিম দিক ধরে, ডাইনে আকাশবাণীর বাড়িটা রেখে, ময়দানে ঢুকে পড়ল মহীতোষ। দূরে কাঠের পাটাতনে ঘেরা মাঠ। একসময়ে ডিভিসনে ফুটবল খেলত প্রিয়তোষ। কতদিন মনে পড়ে মহীতোষের, অফিস থেকে ছুটি করিয়ে ওধারের গ্যালারীতে বসে প্রিয়তোষের খেলা দেখেছে সে।

সবুজ, মখমলের মত নরম ঘাসে নেমে আসতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল মহীতোষ। আকাশের অনেক উঁচুতে পশমের মত পাতলা মেঘ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। কাছের খোলা মাঠে ছোট ছোট ছেলের দল খেলা করছে।

খেলাধুলায় ছেলেবেলা থেকেই প্রিয়তোষের ঝোঁক ছিল। ডিভিশনে খেলতে শুরু করে চাকরী পেয়ে হঠাৎ প্রিয় খেলা ছেড়ে দিয়েছিল। অনেক উচ্চাশা ছিল ওর। কিন্তু খেলল না শেষ পর্যন্ত। এ ব্যাপারে মহীতোষ কিছু বলতে গেলে প্রিয়তোষ উড়িয়ে দিত তার কথাটা, আর খেলে কি হবে দাদা। চাকরী তো একটা জুটেই গেছে।

মহীতোষ বলত, তাতে হয়েছে কি। তোর অনেক প্রমিজ আছে। সকলে তো তাই বলে। আর একটু চেষ্টা করলে দু' এক বছরের মধ্যে বড় দল তোকে টেনে নেবে।

প্রিয়তোষ সে কথায় আরো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ত, ওসব আমাদের কপালে নেই। খেলার দৌলতে একটা চাকরী পেয়ে গেছি —এটাই চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্য।—মহীতোষ চুপ করে যেত। কেননা, প্রিয়তোষের নিরুৎসাহের গুরুতর কারণটা সে জানত। খেলায় উন্নতি করতে হলে সাধনা এবং শ্রমের দরকার। আর তার জন্য চাই পোষ্টাই খাদ্য। বিশ্রাম। মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য। এর কোনটাই প্রিয়তোষ নিত্য অভাবে জরো জরো সংসারের কাছ থেকে পাবে না। কেইবা পেয়েছে। না ললিতমোহন-সুহাসিনী-রেখা। না মহীতোষ নিজে। কারুর কোন আশা পূরণ হয়নি তাদের সংসারে।

ডাইনে গঙ্গা। নদীটা দেখা যাচ্ছে না। দূরগামী জাহাজের অজস্র মাস্তুলে পশ্চিমের মলিন আকাশ ষড়যন্ত্রসংকুল হয়ে উঠেছে।

হেঁটমুণ্ড জোড়া সৈনিকের মূর্তির পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় মহীতোষের শীতলতাবোধ বেড়ে যেতে লাগল।

আজ হ'ক কাল হ'ক বাড়ির সকলে জানবেই। সুহাসিনী, ললিতমোহন, প্রিয়তোষ, রেখা, এমনকি পাড়াপড়শীরা। তার চাকরী নেই। এমন একটা বয়সে এসে সে চাকরী খোয়াচ্ছে—যখন মানুষ সঞ্চয়ী হতে শুরু করে। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে চায়।

সুহাসিনী সংবাদটা শুনে আক্ষেপ করবেন। আর আড়ালে চোখের জল মুছবেন।

শোকতাপ দুঃখ অমলিন মুখে সহ্য করার মত শক্তি একজনেরই আছে তাদের সংসারে। তিনি ললিতমোহন। তিনি সংবাদটা শুনে আরো গম্ভীর হয়ে যাবেন।

মাধুরী দুঃখ পাবে। সান্ত্বনা দেবে প্রথম। উৎসাহ জোগাবে। তারপর অনুকম্পা, বিরক্তি, তাচ্ছিল্য—মহীতোষের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়বে ক্রমশ।

শুধু প্রিয়তোষ, নিশ্চিত জানে মহীতোষ, তাকে বলভরসা দেবে।

বলবে, এত ভেঙে পড়লে চলে দাদা। বাঁচতে হলে শেষপর্যন্ত লড়ে যেতে হবে।

উত্তরে মহীতোষ মিনমিন করে বলবে, চাকুরীর যা বাজার। কত কোয়ালিফায়েড ছেলে বসে আছে বেকার। এই বয়সে নতুন করে কাজ জোটানো—

প্রিয়তোষ সে-কথা মানতে চাইবে না। বলবে, এই তোর মস্ত দোষ দাদা। চট্ করে তুই এতটা ঘাবড়ে যাস।

নিশি-পাওয়া মানুষের মত মহীতোষ ময়দানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল। পেছনে সূর্যটা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। মাটির তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। চাদরটা ভাল করে গায়ে পেচিয়ে নিল মহীতোষ। শীত হাড়-চামড়া ভেদ করে মজ্জার মধ্যে তরল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলে তাকাতে মহীতোষ দেখল—আকাশে চাঁদ উঠেছে। বিবর্ণ চাঁদ। ন্যাপথলিনের মত। গোল। এখনও আলো ফুটবার সময় হয়নি। আজ নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। মহীতোষ চাঁদটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। তিন লক্ষ মাইল দূরের ওই চাঁদটায় নাকি মানুষ পৌঁছে গেছে!

মহীতোষ একটা জারুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পা আর চলছিল না। চিন্তা-ভাবনা ক্রমশ জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মহীতোষ ভাবতে চাইছিল: এটা কোন সাল। উনিশ বাহাত্তরের শুরু। ভারতবর্ষে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কত। সরকারী পরিসংখ্যানে এককোটির মত। আর মহীতোষের বয়স! বিয়াল্লিশ। সে কি বেকারের দলে পড়বে! বেকারদের নিশ্চয়ই একটা বয়ঃসীমা আছে। তার চাকরীটা গেল কেন। এ মোষ্ট সাবমিসিভ এ্যাণ্ড সিন্সিয়ার হ্যাণ্ড। তবু! আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যে মন্দা চলছে, তাই! একেই কি বলে অদৃষ্টের পরিহাস!

মহীতোষের চোখের সামনে দূরের শহরটা আলোয় আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

আর মহীতোষ! জারুলের আবছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। উদ্ভিদেরই মত চলচ্ছক্তিহীন। নিস্পন্দ। কিন্তু, সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। এক সময় মহীতোষ সজাগ হয়ে উঠল। সে থর থর করে কাঁপতে লাগল। জারুলের আবছায়া কিছুক্ষণ মহীতোষকে চারপাশের দৃষ্টির আড়াল করে রাখল। তাকে কাঁদতে সুযোগ করে দিল।

তিন.

বেলা তখন প্রায় ছুটো। মাধুরী একমনে একটা জরুরী চিঠি টাইপ করছিল। এমন সময় সন্দীপ এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। খোলা গলায় বলল, কি ব্যাপার ম্যাডাম। এখনো বসে কি করছেন? উঠবেন না!

কাগজ থেকে চোখ তুলল না মাধুরী। আর একটু বাকী আছে চিঠিটা শেষ হতে।

সন্দীপের কথাবার্তাই ওই ধারার। নাটুকে। কাউকে চমকে দিতে পারলেই ও খুশি। বয়স তিনের কোঠা ছুঁলেও ছেলেমানুষী যায় নি ওর।

চিঠিটা শেষ করে মাধুরী মুখ তুলল, তার মানে!

সকালের দিকে বড় একটা কাজ থাকে না। গল্পগুজব করেই সময় কাটে। টিফিনের পর থেকেই কাজের চাপ বাড়ে। তখন আর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকে না মাধুরীর।

সন্দীপ এবারও রহস্যটা ভাঙল না। চোখে মুখে ব্যস্ততার ভাব এনে বলল, বলছি, উঠুন তো আগে।

ছোট সেকসন। ম্যানেজিং ডিরেকটরের পারসনাল হ্যাণ্ড তারা। চারজন ষ্টাফ। একমাত্র ডলি সরখেল কখনো কখনো দলছুট হয়ে যায়। একা বেরিয়ে যায়। বাদবাকি তিনজন এককাট্টা। একসঙ্গে অফিস থেকে বেরোয়। খানিকটা সময় একত্রে কাটিয়ে যে যার বাড়ির পথ ধরে। মোটামুটি এটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রথমদিকে মাধুরী একাচোরা বেরিয়ে পড়ত। খানিকটা বাড়ি ফেরার টানে। খানিকটা সঙ্কোচবশত। বাইরের লোকজনের সঙ্গে খোলা হাওয়ায় ঘোরাঘুরি আগে সে কখনো করেনি বলেই।

শেষপর্যন্ত নাছোড়বান্দা সন্দীপের পীড়াপীড়িতে মাধুরীও দলে ভিড়ে গিয়েছিল। সন্দীপের যুক্তিটা ছিল অকাট্য, সারাদিন অফিসে কাটিয়ে ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে বাড়ি যেতে ভাল লাগে আপনার। তার চেয়ে আসুন না আমাদের সঙ্গে। একটু হাঁটি। গল্পগুজব করি। তারপর ভিড় পাতলা হলে বাস ধরবেন।

পাঁচটার সময় ওরা অফিস থেকে বেরোয়। ওরা মানে সন্দীপ, মঞ্জু আর মাধুরী। হাঁটতে হাঁটতে সারকুলার রোডের মোড় অব্দি যায়। চায়ের দোকানে ঢুকে চা খায়। তারপর যে যার ট্রাম-বাস ধরে। ধীরে সুস্থে।

পাশের চেয়ার থেকে মঞ্জু উঠে এল। ওর হাতে রংদার কাপড়ের থলেটা দেখে মাধুরী বুঝল, অফিস ছুটি হয়ে গেছে।

মাধুরী তবু জিজ্ঞেস করল মঞ্জুকে, কি ব্যাপার মঞ্জু, অফিস ছুটি হয়ে গেল নাকিরে ?

মঞ্জু মাধুরীর মতই একজন টাইপিষ্ট। বেশ ভাল মেয়ে। প্রথম থেকেই ওকে ভাল লেগেছিল মাধুরীর। আটপৌড়ে। চলনে বলনে সাদামাঠা। আর দশজন নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের মতই। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলেও এখনো মঞ্জুর কপালে সিঁদূর ওঠেনি। এককাঁরি পোষ্য ওর। অথর্ব বাবা। মা। ছোট ছোট ভাই বোন। মঞ্জু কাপড়ের কুচি ঠিক করতে করতে বলল, হ্যাঁ, হাফ-ডে হয়ে গেল। তুমি জানো না ?

সন্দীপের দিকে একপলক চোখ ফেলে দৃষ্টি গুটিয়ে বলল মাধুরী, কি করে জানব। কেউ কি বলেছে আমাকে ?

সন্দীপ সে-কথায় হাঁ-হাঁ করে উঠল, চমৎকার ! আমি সাহেবকে বলে-কয়ে হাফ-ডে ম্যানেজ করলাম। কোথায় আমায় কনগ্রাচুলেশন জানাবেন, তা নয় উল্টো চাপ—

অল্পেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে সন্দীপ। আর উত্তেজিত হলেই ওর সরল মুখের আদল পাল্টে যায় মুহূর্তে। তা দেখে একজাতীয় কৌতুকবোধ মাধুরীর ভাবনার ভেতর মাথা চাড়া দেয়।

মঞ্জু এগিয়ে এসে বলল, এইরে, আবার তোমরা ঝগড়া শুরু করে দিলে—

সন্দীপের পেছনে লাগার স্বভাব আছে। আগে অকারণে যখন তখন এসে উত্যক্ত করলেও মাধুরী রা কাড়ত না। সহ্য করত। ধীরে ধীরে অফিসের পরিবেশ এবং সকলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার পর মাধুরীর মুখে একটু আধটু করে বোল ফুটতে শুরু করেছে। ইদানীং সন্দীপ বিরক্ত করলে সে-ও যে ছেড়ে কথা কয় না—এটা মঞ্জুর চোখ এড়ায়নি।

মঞ্জুর কথায় নিজেকে সামলে নিল মাধুরী। একগাল মন জয় করা হাসি হেসে শুধোল সন্দীপকে, না, মানে—আমি বলছিলাম কি, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল কেন?

সন্দীপ একটা সিগ্রেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর বলল, গত সোমবার মিনিষ্টার এসেছিল না আমাদের অফিস ভিজিট করতে। সেই উপলক্ষে সাহেবকে ধরে আজকে হাফ-ডে করিয়ে নিয়েছি।

সন্দীপকে সাহেব পছন্দ করে খুব। প্রাণখোলা সদাহাস্যময় ছেলে। না পছন্দ করে উপায় আছে। তাছাড়া কাজকর্মেও তুখোড়।

এমন সময় পাশের কামরা থেকে ডলি সরখেল বেরিয়ে এল। চোখে মস্ত গো-গো রঙ-চশমা। কাঁধ অব্দি নেমে আসা বব্ড্ চুল। রুক্ষ, তেলহীন, লালচে। রোজ স্যাম্পু করে ডলি। লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউজ, ফুটো ফুটো। ভেতরের ছোট জামাটা এক নজরে চোখে পড়ে। তায় বগল কাটা। বুকের অনেকটা এবং পেটের পেটির সবটুকু অনাবৃত। মোটা করে আঁকা ভ্রু। বড় বড় নখ। রঙ করা। রুজ পাউডার অত্যধিক পড়ায় মুখে যেটুকু বা স্নিগ্ধতা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। কটকটে রঙের একখানা নাইলন জর্জেট পরনে। শাড়ির আঁচল ক্ষণে ক্ষণে কাঁধ-বুক থেকে খসে পড়ে। ওটা ডলির স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

ডলি সরখেলের হাবভাব ঠাঁটঠমক সবই উগ্র, অস্বাভাবিক। তার ওপর ন্যাকা ন্যাকা গলায় এমন করে কথা বলে যে পিত্তি জ্বলে যায়। পুরুষ-ঘেঁষা বেহায়া মেয়েছেলে। মাধুরী ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না।

পোশাকআশাকে যতই কেতা-কৌলিন্য আনার চেষ্টা করুক না কেন—মেঘে মেঘে ওর বয়সের বেলা যে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে এটা আর কেউ বুঝুক না বুঝুক মাধুরীর অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টি এড়ায় না।

এতক্ষণ ডলি ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে ছিল। ও ষ্টেনোগ্রাফার, বেশির ভাগ সময় সাহেবের ঘরে থাকে। ডিক্টেশন নেয়।

হাঁসের মত শরীর দুলিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসে ডলি সন্দীপকে বলল, তোমরা বেরুচ্ছ নাকি ?

সন্দীপ চোখে উজ্জ্বলতা আনল, কি ব্যাপার! আজ সাহেব লিফ্‌ট্‌ দিলেন না আপনাকে ?

ডলি রংদার বটুয়া থেকে একটা ছোট গোলমত আয়না বের করল। সেটাকে মুখের সামনে তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট ঘসে লিপষ্টিকের রঙ চকচকে করে নিতে নিতে বলল, নাহ্‌, আজ সাহেব বাড়ি ফিরছেন না। সাউথে কোন্‌ আত্মীয়ের বাড়ি নাকি যাবেন—

ডলি ওদের সঙ্গ নিক—এটা মঞ্জুর না-পছন্দ। মঞ্জু বলল, আমরা কিন্তু অনেকটা পথ হাঁটব। তুমি পারবে তো আমাদের সঙ্গে হাঁটতে ?

ডলি আয়না থেকে মুখ নামাল। মঞ্জুর অভিপ্রায়টা হয়ত ধরতে পারল। বলল হেসে, দেখোই না হাঁটতে পারি কিনা। অবশ্য তোমাদের যদি কোন অসুবিধে থাকে তো বলো। আমি তাহলে—

মাধুরী সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর কথাটাকে সংশোধন করে দিল, না-না, মঞ্জু সে-কথা বলছে না। আসলে তোমার হাঁটবার অভ্যেস তো নেই—

ডলি বলল, হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সেই বেলা সাড়ে পাঁচটার সময়। হাতে অনেকটা সময়। তাই ভাবলাম—তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে কিছুটা সময় খরচ করি—

ডলি এক মজার চীজ। ভাঙবে তবু মচকাবে না। নেহাৎ বিপাকে পড়েই যে ও তাদের সঙ্গ যাচনা করছে—এই সাধারণ কথাটা সরাসরি কিছুতেই কবুল করবে না।

সন্দীপ সুযোগ পেলেই ডলিকে খোঁচায়। মঞ্জু-মাধুরীর মত ও গদামনে সবকিছু নিতে পারে না বলেই সন্দীপ ঠোঁট-কাটার মত বলল, সেকি কথা মিস সরখেল। সময় কাটানোটা কি আপনার একটা প্রব্লেম হতে পারে! আপনার কত কানেকশন—

অন্য কেউ বললে ডলি সরখেল একথায় বেজায় খাপ্পা হয়ে উঠত। সন্দীপ বয়সে সকলের ছোট। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় প্রমীলা-সংস্পর্শ বর্জিত। ব্যাচেলার। থাকে মধ্য কলকাতার এক মেস বাড়িতে। তবু, চরিত্রধর্মবশত মহিলা-প্রকৃতি ওর নখদর্পণে। সন্দীপ বেশ ভাল করেই জানে কোন্ মেয়েকে কি কথা বললে সে খুশি হবে।

ডলি ধমকের সুরে বলল, তুমি বড্ড ফাজিল সন্দীপ। চলো তো এবার—

বোঝা গেল ডলি সন্দীপের কথায় মোটেই অখুশি হয় নি। ডলি সরখেলের বর্তমানটা যেমন কৌতুহলের ঊর্ধ্বে নয়—অতীতটাও তেমনি চমকপ্রদ। জনশ্রুতি, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল একদা। এ-জাতীয় চনমনে মেয়ের কপালে যা ঘটে তাই ঘটেছে। বিয়ের পর একটা বছরও স্বামীর ঘর করতে পারে নি। তারপর, আরো বছরখানেক আইনের টানা-হ্যাঁচড়ায় আটকে থাকার পর শাঁখা-সিঁদুর ভেঙে-মুছে বন্ধনহীন হয়েছে। দেশটা উচ্ছন্নে গেলেও এখনো বিবাহ বিচ্ছেদ-মুক্ত বাঙালির ঘরের মেয়েকে কেউ কুমারীত্বের স্বীকৃতি দেয় না। সেই ক্ষেত্রে—সন্দীপের 'মিস' সম্বোধনটা ওর পক্ষে তৃপ্তিকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া, ডলি সেই জাতের মেয়েমানুষ যাদের চরিত্র নিয়ে কেউ মৃদু ইঙ্গিত করলে অখুশি না হয়ে বরং একজাতীয় আত্মপ্রসাদই অনুভব করে।

বাইরের আলোয় ওরা যখন নেমে এল তখন বেলা দুটোর ওপর। ফেব্রুয়ারীর শেষ। রৌদ্রের রং কাঁচাহলুদের মত গাঢ়। দূরে ময়দান। গাছগাছালির সার।

সন্দীপ প্রথম মুখ খুলল, বলুন, কোনদিকে যেতে চান আপনারা—ডলি সরখেল সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, সিনেমায় গেলে কেমন হয়। লাইট হাউসে একটা ভাল ছবি চলছে। রুদ্র বলছিল—

ডলির সব কথায় একটা রেফারেন্স থাকবেই। সেটা নিজেকে জাহির করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। ডলির কথার অভিপ্রায়টা ধরতে কষ্ট হল না সন্দীপের। তবু, উসকে দেবার জন্যে সরলতার ভাণ করল, রুদ্র! সে আবার কে?

ডলি কপট সলজ্জ হাসল, ও তুমি চিনবে না। আমার বয়ফ্রেণ্ড—

সন্দীপ চোখ কপালে তুলল, বয়ফ্রেণ্ড! কই আগে তো এ নামটা শুনিনি মিস সরখেল। নতুন রিক্রুট নিশ্চয়ই—

ডলি আত্মাভিমানে আটখানা হয়ে উঠল, না। তুমি কি আমার সব ফ্রেণ্ডকে চেনো সন্দীপ?

মঞ্জু বলল, এখন সিনেমায়, অসম্ভব। এতক্ষণ অফিসে কাটিয়ে ফের তিনঘণ্টা বদ্ধঘরে। ইচ্ছে হলে তোমরা যাও সন্দীপ। আমি না হয় চলি—

মঞ্জু ডলিকে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। সেটা হাবভাবেই বোঝা যায়। জীবিকা এক। কিন্তু মানসিকতায় দুজন একবারে বিপরীত। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সাদা-সরল মেয়ে মঞ্জু। কোন ভাণ-কাপট্য নেই। আর ডলি, নিজেকে টেনে বাড়িয়ে জাতে উঠতে সদা-ব্যস্ত। তাই সবসময় ওর একটা ওপর চালাকি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কারণে দুজনে মুখোমুখি হলেই খটনটি বেজে যায়।

নইলে মাধুরী বিলক্ষণ জানে, সিনেমা দেখার ব্যাপারে মঞ্জুর কোন অনীহা তো নেই-ই, বরং আইবুড়ো মেয়েটা সংসারের ঘানি টেনে ক্লান্ত ধ্বস্ত বলেই প্রায়ই—সময় সুযোগ হলেই সিনেমা দেখে নিজেকে

হালকা করে নেয়। এই তো সেদিন, গত শনিবার, ছুটির পর, মাধুরীকে একরকম জোর করে একটা বস্তাপচা হিন্দী সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল।

ডলি মঞ্জুর কথায় উষ্ণ হয়ে উঠলেও সরাসরি ওকে কিছু বলল না। বলল সন্দীপকে, এই ভরদুপুরে রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে আমি কিন্তু ঘুরতে পারব না। আগেই বলে রাখছি সন্দীপ—

ঝড়ের আঁচ পেয়ে মাধুরী মুখ খুলল। একটা মধ্যপন্থা বাৎলাল, ঠিক আছে। মঞ্জুর যখন সিনেমা দেখতে অনিচ্ছে তখন না হয় চলো একটু নিউমার্কেটের দিকে। আমার টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনতে হবে। তারপর কোন রেষ্টুরেণ্টে ঢুকে না হয় খানিকক্ষণ গল্প করে সময় কাটানো যাবে—

মঞ্জুর তাতেও গায়ের জ্বালা জুড়াল না। বলল, আমাকে নিয়ে এত ভাবছ কেন মাধুরীদি! বললুমই তো—তোমরা যাও না। আমার বাড়ি ফেরার দরকার আছে। মার দুদিন ধরে জ্বর—

মাধুরীর বুঝতে কষ্ট হল না—এটা মঞ্জুর একটা অছিলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মঞ্জুর ওপর তার দাবীটা বেশি বলেই মাধুরী ধমকে উঠল, তুই চুপ কর তো। হাফ-ডে না হলে এ সময় কি বাড়ি ফিরতিস?

সন্দীপ মাধুরীর প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারল না। বলল, আপনি বড্ড বেরসিক ম্যাডাম। একবছর ঘুরতে চলল চাকরীতে ঢুকেছেন—এখনো মন থেকে সংসারের আঁশটে গন্ধটা গেল না! ফালতু কেনাকাটা করে ছুটির দুপুরটা নষ্ট করতে চান—

মাধুরী বলল, তাহলে আপনিই বলুন না মশাই, কোথায় যাওয়া যেতে পারে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বকবক করতে আমার ভাল লাগছেনা—

মাধুরী এটাই চাইছিল মনে মনে। সন্দীপ একটা পথ বাৎলে দিলে সেটা সর্ববাদী সম্মত হবে। এমনকি ডলিও ঠেলে ফেলতে পারবে না সন্দীপের প্রস্তাবটা।

সে-কথায় সন্দীপ প্রথমে একটা সিগ্রেট ধরাল। খানিকটা নীলচে ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে কি ভাবল। তারপর হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়ে যাবার মত উজ্জ্বলতায় ওর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সন্দীপ বলল তাই তো, এতক্ষণ মনে পড়ে নি। চলুন, ফাইন আর্টস একাডেমীতে যাই। ভাল বিদেশী ছবির এক্সজিবিশন হচ্ছে দু' সপ্তাহ ধরে। আর বেশিদিন নেই। তারপর, ছবি দেখা হয়ে গেলে না হয় ময়দানে ঢুকে কোথাও বসব।

সন্দীপ একদা গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মাঝপথে থেমে গিয়েছিল। থার্ড ইয়ারে উঠেই ছেড়ে দিয়েছিল। যা ওর স্বভাব। অত্যন্ত খামখেয়ালী ধরনের। কোন একটা ব্যাপারে বেশিদিন ওর আগ্রহ থাকে না।

ডলি সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দেবার ভঙ্গীতে বলল, দি আইডিয়া! বেশ বলেছ সন্দীপ। কতদিন আর্ট এক্সজিবিশন দেখিনা।—ভাবখানা ঃ আমি আর্টের একজন মস্ত সমজদার।

মাধুরী ঢোঁক গেলবার মত করে হাসি চাপল।

একাডেমী অব ফাইন আর্টসে ফরাসী ছবির প্রদর্শনী চলছিল। জগদ্বিখ্যাত জনাকয়েক শিল্পীর ছবি। একেই আধুনিক ছবি-টবির মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝে না মাধুরী। তার ওপর ফরাসী শিল্পীদের ছবি।

চাকরীতে ঢুকবার পরেই যা হ'ক বাইরের জগৎটাকে দেখবার, বুঝবার সুযোগ ঘটেছে মাধুরীর। ছেলেবেলাটা কেটেছে যৌথ পরিবারে। একপাল জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে। সে-ও বলতে গেলে অজ পাড়াগাঁয়ে। চাকদা ষ্টেশন থেকে মাইল কয়েক ভেতরে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর কলেজে ভর্তি হবার শখ ছিল। রানাঘাট কিংবা নৈহাটি কলেজে। মা-বাপ মরা মেয়ে। জ্যাঠা-কাকারা আমল দেয়নি তার কথায়। তখন তারা মাধুরীকে ভাবছে গলগ্রহ। তার ওপর ছেলে হলেও একটা কথা ছিল। তাই কলেজে

ভর্তি হবার সাধ শিকেয় তুলে কাঁচা বয়সেই রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছে। তারপর, কয়েকবছর কেটে যাবার পর মাধুরীর আশা-আকাঙ্ক্ষার নটে গাছটা একেবারে মুড়ে গেছে। বিয়ে হয়ে চলে এসেছে মহীতোষের সংসারে। সংসার তো নয়, দিনরাত্রির বাঁধনে বাঁধা টান-টান দমছুট, চার দেয়ালের কয়েদখানা। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে শুধুই জীবনটা অপচয়িত হয়েছে বছরের পর বছর। কোন সখ-আহ্লাদ নেই। ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই। সমস্ত অস্তিত্বটাই পরার্থে সমর্পিত। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেওরের সেবা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে নিয়োজিত। বাকিটুকু শুষে নিয়েছে স্বামী আর ছেলে। সবমিলিয়ে একটানা হালভাঙা সংসারের বধূ হয়ে শিল্পবোধ তো দূরের কথা—সাধারণ মানবিক অনুভূতিগুলো হারিয়ে ফেলেছিল মাধুরী।

ছবির কিছু না বুঝলেও ভাল লাগছিল মাধুরীর। চারপাশে কৌতুহলী সম্ভ্রান্ত মানুষের ভিড়, ফ্রেমে আঁটা অসংখ্য রঙের ছবির সমারোহ, চোখ ঝলসানো আলো,—এর মধ্যে অলস পায়ে হাঁটতে মাধুরী একটা উত্তেজনা অনুভব করছিল। আজকাল, মাধুরী টের পাচ্ছে, শরীর-মন উভয়ত তার ভেতরে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। এটা হচ্ছে—চাকরী পাবার পর থেকে। আগেকার ঝিমিয়ে-পড়া ভাবটা আর নেই। কাজে উদ্যম উৎসাহ বাড়ছে। অভিযোগ-প্রবণতা, আলস্য, অভিমান—এসব ঝরে যাচ্ছে শরীর-মন থেকে। সাংসারিক ক্লিন্নতা থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবার মত শক্তি ও ঔদাসীন্য সে অর্জন করেছে। সবচেয়ে বড় কথা—নিজের অস্তিত্বটাকে বুঝবার, নিজেকে ভালবাসার মত একটা আত্মানুরাগবোধ মাধুরীকে পেয়ে বসেছে ক্রমশ।

সন্দীপ আর মঞ্জু অনেকটা এগিয়ে গেছে কখন। ডলি মাধুরীর আগে। হঠাৎ ডলি থমকে দাঁড়িয়ে মাধুরীকে ইসারায় কাছে ডাকল। মাধুরী কাছে এলে একটা ছবির দিকে হাত তুলে তাকে ইঙ্গিতে কিছু একটা বোঝাতে চাইল।

ছবিটার হয়ত কোন গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু, একনজরে দেখলে কুৎসিত বলেই মনে হয়। ছুটি নগ্ন নরনারীর ছবি। মানুষটা মেয়েটার একটা স্তনে মুখ দিয়ে এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে যা দেখে মুহূর্তে মাধুরী লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ডলি নিচু গলায় হাসি চেপে বলল, দেখলে তো ছবিটা। কি বিশ্রি—

সামনে পেছনে কৌতুহলী দর্শকের ভিড়। মাধুরী ছবিটা থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে নিয়ে লজ্জায় নিজের মধ্যে নিজে মিশে যেতে চাইল।

ডলি তখনও বেহায়ার মত কুল কুল করে হাসছিল।

ডলি এক অদ্ভুতধরনের মেয়ে। আর দশজন গেরস্থ মেয়ে-বউর মত চরিত্র-বিষয়ে ওর কোন শুচিতাবোধ তো নেই-ই, বরং, আভাসে ইঙ্গিতে এর তার মারফৎ মাধুরী যতটুকু জানতে পেরেছে—তাতে ওকে নষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এ ব্যাপারে সামাজিক সুনাম ছুর্ণামের তোয়াক্কা করে না ডলি। বরং, ও যে একটি সফল মক্ষিরাণী—দশটা ছেলেকে ইচ্ছেমত নাচাতে পারে—এই সাফল্যগর্বেই ডলি গর্বিত। সমাজকে পরোয়া না করলেও প্রত্যেক মানুষেরই কিছু না কিছু পাপ-পুণ্যবোধ থাকে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই বোধটা ছেলেদের চেয়ে প্রখর। এটা না থাকলে সমাজ পরি[illegible]র বলে কিছু থাকত না। ব্যাভিচার অনাচারে দেশ রসাতলে যেত। মেয়েদের যৌন-জীবনের এই সততাটুকু এখনো আছে বলেই তো সমাজ আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের কতকগুলো সূত্র আছে। এটা না থাকলে মানুষ আর পশুতে কি কোন পার্থক্য থাকে! মাধুরীর বিশ্বাস—এটা শুধু তার নয়—শতকরা নব্বুই জন মেয়েরও ধারণা।

ডলি এর বিপরীত। ওর যুক্তিটা অন্যরকম। ডলি বলে: দেহের শুচিতা-অশুচিতার ওপর পাপপুণ্য নির্ভর করে না। পাপের বাস শরীরে নয়—মনে। তুমি যদি মনের দিক থেকে ঠিক থাকো তাহলেই

খাঁটি রইলে। একটা মানুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হল। মনের দিক থেকে তার সঙ্গে মিল হল না তোমার। অথচ সারাজীবন তুমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই লোকটাকেই তোমার দেহটাকে যেমন খুশি ভোগ করবার অধিকার দিলে—এটা কি ব্যাভিচার নয়!

ডলির যুক্তি মাধুরী মানতে রাজী নয়। দেহ আর মনকে আলাদা করে ভেবে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না ঘটলে আমি মনটাকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়ে দেহটাকে বাছবিচার না করে যে কোন পাত্রে ফেলে দেওয়াটা নিশ্চয়ই পাপ। দেহ তো জড় পদার্থ নয়। তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলে সেই ঝড় মনটাকে রেহাই দেয় না। তচনচ করে ফেলে। তখন শুধু দেহ নয় মনটাও নষ্ট হয়ে যায়।

তবু, ডলির কথাগুলো মাঝেমাঝে মাধুরীর ভাবনাকে নাড়িয়ে দেয়। নাড়িয়ে দেয়, কেননা সে রক্তমাংসের মেয়েমানুষ বলেই। ধারণা আর বিশ্বাস এক জিনিস। কিন্তু জীবনটা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধিতে ভেঙেচুড়ে নিত্যনতুন হয়ে উঠছে। তাই মাঝে মাঝে নিজের মনের সঙ্গে কথা চালাচালি হয় মাধুরীর। বিবাহিত জীবনে কি পেয়েছে সে। কখনো কি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বটাকে স্বীকার করেছে মহীতোষ। হয়ত করেছে। কিন্তু, সে করাটা নেহাৎই এক তরফা। অস্তিত্ব বলতে যদি বোঝায় রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়ভোগ্য দেহটা—তবে মাধুরীর সেইটুকুকে মাত্র মূল্য দিয়েছে মহীতোষ। কিন্তু, তার সাধ-আহ্লাদ, ভাল-লাগা মন্দ-লাগা—এসব নিয়ে কখনও কি লোকটা মাথা ঘামিয়েছে।

ডলিই একদিন মাধুরীকে এসব ভাবতে শিখিয়েছিল। যদিও, ওর জীবনযাত্রা ঘৃণ্য মনে হয় মাধুরীর, তবু ডলিই তাকে প্রথম আত্মমনস্ক করে তুলেছিল।

মাস পাঁচছয়েক আগের কথা। সেকশনে তখন সে সন্দীপ আর ডলি। মঞ্জু তখনো আসে নি। মঞ্জু জেনারেল সেকশনের স্টাফ। পুজোর পর কাজের চাপ বাড়ায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর মঞ্জুকে জেনারেল সেকশন থেকে পারসনাল ডিপার্টমেন্টের জন্য নিয়ে এসেছেন।

মঞ্জু আসার আগে কাজে অকাজে ডলির সঙ্গে প্রায়ই কথাবার্তা হত মাধুরীর। একদিন ডলি তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা মাধুরী, তোমার ছেলে তো বেশ বড় হয়ে গেছে, তাই না?

মাধুরী বলেছিল, হ্যাঁ, স্কুলে পড়ছে।

ডলি তারপর চাঁছাছোলা প্রশ্ন করেছিল, তোমরা নিশ্চয়ই এখন নর্মাল কনজুগাল লাইফ লীড করছ? আই মীন—

মাধুরী তখনো ওর অভিপ্রায়টা ধরতে পারেনি। হেসে বলেছিল, করছি বই কি—

ডলি এরপর নিজের প্রশ্নটাকে আরো ঘন করে ফেলেছিল, তা, বার্থ-কণ্ট্রোলের জন্য তোমরা কি প্রিকশন নিচ্ছ?

মাধুরী সেই প্রশ্নে কুঁকড়ে গিয়েছিল। জড়ানো গলায় বলেছিল, নিচ্ছি একটা—

ডলি বলেছিল, আমি জানতে চাইছি কনট্রাসেপটিভ হিসাবে কোনটা তোমাদের পছন্দ। পিল কিংবা অন্যকিছু—

ডলির অস্বস্তিকর কৌতুহলটাকে পাশ কাটাবার জন্য উল্টো জিজ্ঞেস করেছিল মাধুরী, তা জেনে তোমার লাভটা কি? তুমিতো নিরামিষাশী—

ডলির চোখে হাসি চলকে উঠেছিল, এই বুঝি তোমার ধারণা! আরে, আমিও তো তোমার মত একজন মেয়েমানুষ। আমার কি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বলে কিছু থাকতে নেই?

সে-কথায় ছাপোষা মহীতোষ রায়ের স্ত্রী মাধুরীর বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত ঘটে গিয়েছিল। কোন মেয়ে যে এমন অকপটে নিজের পাপের কথা বলতে পারে—এই অভিজ্ঞতা মাধুরীর সেই প্রথম।

মাধুরী চোখ পাকিয়ে বলেছিল, যাঃ, কি সব বাজে কথা বলছ—। তোমার মুখের কোন লাগাম নেই ডলি।

ডলি বিকারহীন বলেছিল, যা সত্যি তাই বলছি মাধুরী। আমার প্রশ্নটা কিন্তু তুমি এড়িয়ে গেলে মাধুরী।

মাধুরীর ভাবনা ততক্ষণে এলোমেলো হতে শুরু করেছে। সে বলেছিল, কোন প্রশ্নটা ?

ডলি বলেছিল, ওই যে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি ব্যবহার করো।

মাধুরী সে-কথার জবাব দেবার মত ভাষা সেদিন খুঁজে পায়নি।

ডলি ওর মনের ভাবটা আঁচ করতে পেরে ফের বলেছিল, রাগ করলে নাকি মাধুরী ?

মাধুরী বলেছিল, না-না, রাগ করার এতে কি আছে

ডলি বলেছিল, এ ব্যাপারে আমাদের প্রব্লেমটা কিন্তু এক। সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারো না।

সে-কথায় মাধুরীর সর্বাঙ্গ রাগে রি-রি করে উঠেছিল। বলে কি ডলি ! এক নষ্ট দুশ্চরিত্রা মেয়েমানুষ। সে নিজেকে মাধুরীর সমপর্যায়ের ভাবে! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে মাধুরী সংক্ষেপে বলেছিল, তোমার কথার অর্থটা কিন্তু বুঝলাম না—

ডলি তখন ব্যাপারটাকে সহজ করে ফেলবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল, অর্থটা খুবই সহজ। তুমি আপাতত সন্তান চাইছ না। তাই না ? কিন্তু কেন ? নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে। হয় কারণটা ইকনমিক। অথবা, নতুন একটা ঝামেলায় পড়তে চাইছ না। এই তো ?

মাধুরী সদর্থক মাথা নেড়েছিল, হ্যাঁ, এই রকম একটা কিছু—

ডলি তার সায়ে জোঁশ পেয়ে গিয়েছিল, আর আমি চাইছিনা কেন জানো। সন্তান হলে তাকে রাখব কোথায়। সমাজ তো স্বীকার করবে না কিছুতেই—

মাধুরী বলেছিল, বটেই তো। এসব নোংরামোকে প্রশ্রয় দিলে সমাজ যে উঠে যাবে—

মাধুরীর আক্রমণে সেদিন বিচলিত হয়নি ডলি। বলেছিল, আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছিনা। আমি জানতে চাইছি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্যটা কোথায়—

মাধুরী ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠেছিল, পার্থক্য! অনেক—

ডলি মাষ্টারী চালে বলেছিল, আমার তো মনে হয়—তেমন একটা কিছু নয়। তোমার প্রব্লেমটা মোর অর লেস ইনডিভিডুয়াল। আর আমারটা—সোস্যাল। এইটুকু যা তফাৎ—

ডলি সম্পর্কে সেই থেকে মাধুরীর ধারণা পালটে গিয়েছিল। ওর বাইরের দিকটা যতই হাস্যকর এবং উৎকট মনে হোক না কেন—ডলির ভেতরে একটা সবল তার্কিক মানুষ লুকিয়ে আছে—এটা সে সেদিন আবিস্কার করেছিল।

মুখে মাধুরী বলেছিল, এত সহজে তুমি আমাকে নিজের সঙ্গে এক করে দেখতে চাইছ?

ডলি জোরের সঙ্গে বলেছিল, সারটেনলি। আমাদের কৃত্রিম ব্রহ্মচারিত্বের কারণ আলাদা হতে পারে। কিন্তু মোটিভটা আমাদের একই—

মাধুরীর গলায় অস্বস্তি উপচে উঠেছিল, তার মানে! যা বলতে চাও খুলে বলো—

ডলি বলেছিল, মানেটা খুবই সহজ। জলের মত। যে কোন কারণেই হোক তুমিও সন্তান চাইছ না—আমিও না। চাইল্ড ইজ আনওয়ান্টেড টু আস—বোথ। তাই না! এই পর্যন্ত বলে খিল খিল করে হেসে প্রসঙ্গটা লঘু করে দিতে চেয়েছিল ডলি।

সেদিন ডলি সম্পর্কে একটা বিশ্রি ধারণা নিয়ে বাড়ী ফিরেছিল মাধুরী। সতীত্ব, আনুগত্য, প্রেমভালবাসা বলে তাহলে কি কিছুই নেই সংসারে। এরকমটা ভেবে নিলে গেরস্থঘরের মেয়ে-বউ আর বেশ্যার মধ্যে পার্থক্যটা থাকে কোথায়।

সচেতন ভাবনা দিয়ে ডলির যুক্তিটা মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলেও সেটা ছোটমাছের কাঁটার মত মাধুরীর চিন্তার এককোণায় লেগেছিল বহুকাল।

ছবি দেখে ওরা বাইরে আসতে সন্দীপ বলল, বেজায় তেষ্টা

পেয়ে গেছে। চলুন চায়ের দোকানে গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিই আগে।

ফাইন আর্টস বিল্ডিংয়ের একপাশে ছোট একটা ক্যান্টিন। চা বিস্কুট ছাড়া আর কিছু ছিল না। বিল্ডিংয়ের পেছনে পুকুর। পুকুরপাড়ে কয়েক সারি সিমেন্টের বেঞ্চ। চায়ের অর্ডার দিয়ে সন্দীপ ওদের নিয়ে পুকুরের কাছে এসে বসল। বেঞ্চে।

শীতের বেলা। তিনটে বাজতে না বাজতেই রৌদ্র লালচে হয়ে এসেছে। পুকুরের ডাইনে গাছগাছালির মাথায় গীর্জার চূড়োটা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। শান্ত জলে রাস্তার ওধারের বাড়িগুলোর ছায়া গভীর হয়ে নেমেছে। কাছের ঘাস জঙ্গলে ফড়িং-য়ের দল ছুটে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে চারপাশের ছবি চিন্তাকে অলস করে তোলে।

সন্দীপ বলল, তারপর বলুন ছবি কেমন দেখলেন আপনারা?

ডলি আজেবাজে কিছু একটা বলে পরিবেশটাকে যাতে মাটি করে দিতে না পারে তাই মাধুরী আগেভাগেই বলল, ভাল। তবে ঠিক বুঝতে পারিনি—

সন্দীপ বসেছিল বেঞ্চের ওপ্রান্তে। মঞ্জুর পাশে। মাধুরীর কথায় সে তেতে উঠল, কিস্যু বুঝলেন না! এত ভাল ভাল ছবি!

ইদানিং মাধুরী লক্ষ্য করছে—তাদের তিনজনের মধ্যে তার ব্যাপারে সন্দীপ সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর। মাধুরীর তুচ্ছ মন্তব্যকেও যতটা গুরুত্ব দেয় আর কারুর কথাকে ততটা দেয় না।

চা এসে গেল। চায়ের তেষ্টা মাধুরীরও পেয়ে গিয়েছিল। আগে দিনে দুকাপের বেশী চা খেত না মাধুরী। বেশী খেলে রাতে ঘুম আসত না। টক ঢেঁকুর উঠত। এখন কম করে সাত আট কাপ চা পেটে পড়ে। তাতে কোন শারীরিক অস্বস্তিবোধ করেনা সে। বরং চা না খেলে কাজে মন আসে না।

খানিকটা চা সরসর করে গলায় চালান করে দিয়ে মাধুরী কপট রাগের ভঙ্গীতে বলল, বুঝিনি তাতে আপনার কি মশাই?

সন্দীপের চোখে কৌতুক নেচে উঠল। আজকাল মাধুরীকে চটাতে পারলে ও সবচেয়ে খুশি হয়।

সন্দীপ প্রসঙ্গটাকে মুচড়ে ভিন্ন পথে নিতে চাইল, আমার কিছু নয় সত্যি। তবে ফ্রাঙ্কলি বলছি, আপনাকে দেখার পর থেকে আমার রং-তুলি ধরতে ইচ্ছে করছে—

মাধুরী না বোঝার ভাণ করল, তার মানে!

সন্দীপ অকপট বলল, আপনার মধ্যে এমন একটা চার্ম আছে যেটা চট করে যে কোন শিল্পীর চোখেই ধরা পড়বে।

ডলি ফোড়ন কাটল, তাই নাকি! তুমি এতদূর পর্যন্ত ওর সম্পর্কে ভেবে রেখেছ—

সন্দীপ কথায় গুরুত্ব আনতে চাইল, যা সত্যি তাই বলছি মিস সরখেল। ওর ফিগারটা রীতিমত অ্যাট্রাকটিভ। চমৎকার মডেল হতে পারেন।

ডলি চোখ মটকে মাধুরাকে কিছু একটা বোঝাতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর সদ্যদেখা নগ্ন নরনারীর যুগল ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল।

মাধুরী সন্দীপের কথাটাকে লঘু করে নিতে চাইল, আপনার আস্পর্ধা তো কম নয় মশাই।

সন্দীপ বলল, এতে আস্পর্ধার কি আছে। আপনি রাজী হয়ে যান একবার। আমি আপনার এমন একখানা ছবি আঁকব যে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে।

সন্দীপের কথা আগুনের হলকার মত মাধুরীর মগজে ঢুকে পড়ল। যে কোন বিবাহিত ভদ্রমহিলাকে এজাতীয় প্রস্তাব করাটা মোটেই শোভন নয়। কিন্তু সন্দীপের বলার ভেতরে একটা সারল্য ছিল। তাছাড়া কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরে মাধুরীর মত মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। লম্বা ছিপছিপে। টকটকে রঙ। যেন আমে আর দুধে মেশানো। তিরিশ বছর পেরিয়ে এক ছেলের মা

হয়ে গেলেও এখনো মাধুরীর শরীরের কোথাও এতটুকু মেদ লাগেনি। চুলের অনেকটা অযত্নে পড়ে নষ্ট হয়ে গেলেও এখনো দাঁড়ালে কোমর ছাপিয়ে যায়। রূপ না থাকলে মা বাপ মরা ক্যালনা মাধুরীর কি সহজে বিয়ে হত! ওকে দেখতে এসেছিল সুহাসিনী আর ললিত-মোহন। খুব আটপৌড়ে একটা শাড়ি পরে ওদের সামনে এসে বসেছিল মাধুরী। প্রসাধনহীন অবস্থায়। হাতে তখনো হলুদের দাগ। ওরা ছোটখাটো দুচারটে প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছিল মাধুরীকে। ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কৌতুহলবশত দরজায় আড়ি পেতেছিল। ভয়ে বুক কাঁপছিল মাধুরীর। সেই প্রথম বাইরের লোকের সামনে বসা। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর চারটে বছর ঘরে বন্দী। জ্যাঠা-কাকাদের বিরাট সংসারের হাড়ি ঠেলে ঠেলে নিজের চেহারা-স্বাস্থ্য সম্পর্কে আস্থা চলে গিয়েছিল মাধুরীর।

বড় জ্যাঠামশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন ললিতমোহনকে, তারপর বলুন, মেয়ে কেমন দেখলেন?

ললিতমোহন উত্তর করেছিলেন; ভাল, খুব ভাল। আমার তো পছন্দ হয়ে গেছে—

সুহাসিনীও ললিতমোহনের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিলেন, আমারও—

বড় জ্যাঠামশাই এতটা ভাবতে পারেন নি। তিনি ওদের সিদ্ধান্তটাকে আরো জোরালো করার জন্য মাধুরীর গুণপনার ফিরিস্তি দিতে শুরু করেছিলেন একের পর এক, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা সাজে না, তবু বলি। মাধুর মত মেয়ে হয় না। যেমন কাজকর্মে তেম্নি স্বভাবে। এবাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে ওর তুলনা চলে না—

সুহাসিনী-ললিতমোহন পাকা জহুরী। চিনতে ওদের ভুল হয়নি। ললিতমোহন বলেছিলেন, আমাদের তো পছন্দ হয়েই গেছে। এবার বিয়েটা কবে নাগাদ হতে পারে সেইকথা বলুন—

বড় জ্যাঠামশাই কিছু বলার আগে সুহাসিনী পাদপূরণ

করেছিলেন, কবে আবার, যত তাড়াতাড়ি হয়। এমাসের শেষের দিকে দিন থাকলে—

বড় জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, তাহলে তো খুবই ভাল। আমাদের তরফ থেকে কোন আপত্তি নেই। তবে—আপনাদের দাবীদাওয়া, কথাটা জানতে পারলে—

ললিতমোহনের গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, দাবীদাওয়া আবার কি! মেয়ে পছন্দ হয়েছে, ব্যস। আপনারা যা দেবেন তাতেই আমরা খুশি। এখন আমাদের কাজ মেয়েকে ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া—

বড় জ্যাঠামশাই নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, তবু—আপনাদের যদি কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে—

সে-কথায় ললিতমোহন প্রায় ধমকে উঠেছিলেন, থামুন তো। মশাই আপনাদের জন্যেই দেশের আজ এই অবস্থা। জানেন,—আমরা যখন যুবক ছিলাম—পাড়ায় পাড়ায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে দল গড়েছিলাম! গিরিশঘোষের 'বলিদান' নাটক করেছি। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের বাড়ি বাড়ি গেছি। আশ্বাস দিয়েছি তাদের। যারা বিয়ে করতে চায় সেইসব ছেলেদের নিজেদের দলে টেনেছি।

ওরা চলে যেতে বড় জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলেছিলেন, পোড়ারমুখীটা কই। ওকে ডাক তো একবার।

লজ্জার মাথা খেয়ে একহাট লোকের মাঝখানে বড় জ্যাঠামশাইয়ের পায়ের ধুলো নিয়েছিল মাধুরী।

সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা সে পেয়েছিল বাসররাতে। যে মানুষটার সঙ্গে মাধুরী চিরজীবনের জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছিল, সেই মহীতোষ বলেছিল সরাসরি, বাইরে তখন ভাইবোনেরা ফাঁকফোকর দিয়ে আড়ি পেতে আছে,—তুমি এত সুন্দরী মাধুরী! আমি ধন্য—। বলতে বলতে আবেগে থরোথরো মহীতোষ বিপদজ্জনকভাবে মাধুরীকে কাছে টেনে নিয়েছিল। ভয়ঙ্কর সুখে তলিয়ে যেতে যেতে মহীতোষের

'আমি ধন্য' এই কথা ছুটো তার ভাবনার ভেতর কেবলই পাক খাচ্ছিল।

সন্দীপের কথার উত্তরে মাধুরী কলকল করে উঠল, হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন মশাই? ডলি-মঞ্জু থাকতে—। আমার বিয়ে হয়ে গেছে কবে! একছেলের মা আমি—

মঞ্জু সন্দীপের দিক থেকে সরে বসে ধমকের সুরে বলল, এই মাধুরীদি, হচ্ছে কি!

ডলি মজা পেয়ে গিয়েছিল সন্দীপের কথায়। ও পা দোলাচ্ছিল আর হাসছিল মিটিমিটি।

সন্দীপ বলল, ওদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু ওদের কি আমি দেখতে খারাপ বলেছি। আমি বলছি—মডেল হিসাবে আপনার ফিগারটা ওদের চেয়ে মোর অ্যাট্রাকটিভ—

ডলি সন্দীপকে উসকে দিল, ঠিক বলেছ সন্দীপ।

মাধুরী হার মানতে চাইল না, আপনার চোখে নির্ঘাৎ ছানি পড়েছে। ডাক্তার দেখান। কিসব উল্টোপাল্টা দেখছেন—

সন্দীপ তবু অকপটে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বলল, ওটা আপনার ভাষ্য। নিজেকে নিজে কি কেউ ঠিকমত দেখতে পারে!

মঞ্জু উঠে দাঁড়াল। বলল, উঠুন তো মশাই। যতসব বাজে আলোচনা।

মঞ্জু স্বভাব লাজুক। বিশেষ করে মেয়ে-পুরুষঘটিত আলোচনায়। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গটা অবশ্য সে ধরনের নয়। তবু, আলোচনা ঢালের দিকে গড়াতে পারে—এই ভয় মঞ্জুর।

মঞ্জুকে নানাকারণেই ভাল লাগে মাধুরীর। ওর একটা আদর্শ আছে। এই আদর্শের জন্য নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করছে মঞ্জু। মাধুরী ভেবে দেখেছে, সে ওর অবস্থায় পড়লে ঠিক থাকতে পারত না। বিদ্রোহ করত। ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসত। সংসারকে অস্বীকার করত।

অথর্ব বাবা। ভাল চাকরী করতেন ভদ্রলোক। এক সওদাগরী অফিসে। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফেরার পথে বাস থেকে পড়ে গিয়ে ডান পায়ে সামান্য চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু, সেই সামান্য আঘাতই বাড়তে বাড়তে ভদ্রলোকের ডান দিকটা অবশ করে ফেলল কয়েক-মাসের ভেতর।

মঞ্জু ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবার বড়। নিজের মনের মত করে মেয়েকে তৈরী করেছিলেন ভদ্রলোক। বি-এ পাশ করিয়েছিলেন। গানের স্কুলে ভর্তি করিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে তুখোড় করে তুলেছিলেন। ভাল একটি পাত্রও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু বিধি বাম। পাকা দেখার কদিন আগে দুর্ঘটনাটা ঘটল। ভদ্রলোক শয্যা নিলেন। মঞ্জু বেঁকে বসল। মা বাবা দুজনে বোঝাতে চাইলেন, মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস তখন পরের ঘরে যেতেই হবে। চিরকাল তো কারুর মাবাপ বেঁচে থাকেনা—। তাছাড়া, পাত্রটি হাতছাড়া হলে বাংলাদেশে নতুন পাত্র জোগাড় করা যে কি কষ্ট—। —মঞ্জু উত্তরে বলেছিল, তাই বলে অসহায় ভাইবোন আর দুঃস্থ মা বাবাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরের ঘরে চলে যাব? অসম্ভব! আমার দরকার নেই অমন সুখের। বাবা বলেছিলেন, দিন আমাদের এক রকম করে কেটে যাবেই। নন্তুটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠবে। আমাদের জন্য তুই নিজের জীবনটা মাটি করবি কেন?—সে কথায় মঞ্জু ফুঁসে উঠেছিল, এভাবে কথা বলছ কেন তোমরা! আমি কি তোমাদের কেউ নই। আমাকে এত স্নেহে-কষ্টে মানুষ করে তুললে সে কি আমাকে শুধু স্বার্থপর করে তোলার জন্য? ঠিক আছে, নন্তু দাঁড়াক নিজের পায়ে, ততদিন আমি সংসারটাকে দেখি। তারপর নাহয় তোমাদের কথা মত—। —নন্তু মঞ্জুর পিঠেপিঠি। তখন কলেজে পড়ে! বাবা মঞ্জুর সেই যুক্তিও নাকচ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তা হয় না মঞ্জু। নন্তুর মানুষ হয়ে উঠতে এখনো অনেক দেরী। ততদিন অপেক্ষা করা যায় না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে কিছু টাকা তো পাব। তাছাড়া, মনে

হচ্ছে অফিস মাসে মাসে আমায় সামান্য কিছু হলেও সাহায্য করবে। —মঞ্জু ফুঁসে উঠেছিল, অনুকম্পা আর দানের ওপর তোমরা বেঁচে থাকবে। আমি থাকতে! তা হয়না বাবা। —বাবা হয়ত মঞ্জুর কথায় নিরস্ত হতেন না। শেষপর্যন্ত মা বলেছিলেন, ঠিক আছে—ও যখন এত করে বলছে তখন আর আপত্তি করো না তুমি। জীবনে কখনো কোন অন্যায় করিনি। মাথার ওপরে ভগবান আছেন: একদিন না একদিন ওর বিয়ে হবেই—

মার ইচ্ছে পূরণ হয়নি। জীবনটা উপন্যাসের চেয়েও নাটকীয় বলেই। মঞ্জু চেষ্টাচরিত্র করে চাকরীতে ঢুকবার পরপর নন্তু মারা গেল হঠাৎ। কলেরায়। পরের ভাইবোনগুলো নেহাৎ-ই নাবালক। ওদের মানুষ করে বড় করে তুলতে মঞ্জু তার মার বয়সে পৌঁছে যাবে।

তবু, পাথরে শ্যাওলা জমে। অসময়ে কোকিল ডাকে। মরু-ভূমিতে বৃষ্টিপাত ঘটে। নক্ষত্র-পতন হয়।

তেম্নি, মঞ্জুর জীবনে এসেছে এক ভালবাসার মানুষ। মানুষটির নাম গৌতম মিত্র। পরিচয়ের সূত্রটা অদ্ভুত। একই বাসস্টপ থেকে ওরা ওঠে প্রতিদিন। একই সময়ে।

গৌতম মিত্র যেচে আলাপ করেছিল। ডালহৌসীর দিকে কোন এক বিখ্যাত ওষুধের দোকানের কাউন্টারে বসে। প্রথম থেকেই মঞ্জু নিরাসক্ত থেকেছে। গৌতম মিত্রকে বেশীদূর এগুতে দিতে চায়নি। কিন্তু, লোকটা একগুয়ে। নাছোড়বান্দা। মঞ্জুর অবহেলাকে গায়ে মাখে নি। বরং অনেকটা গায়ে পড়ে জোরজবরদস্তি করে মঞ্জুর সঙ্গে আলাপের পর্যায়টাকে দিনে দিনে গাঢ়তর করেছে। একই বাসে ওঠে ভাড়া দিয়েছে লোকটা। ফিরতি পথে দেখা হয়ে গেলে নেমে চায়ের দোকানে নিয়ে গেছে। কখনও বলেছে, প্রতিদিনই তো সন্ধ্যা না হতেই বাড়ি ফিরছেন। আসুন না,—আজ ওই পার্কটায় গিয়ে বসি খানিকক্ষণ।

মঞ্জু আর যাই হোক অসামাজিক মেয়ে নয়। সব সময় গৌতম

মিত্রর অনুরোধ ঠেলতে পারেনি। মাঝে মাঝে ওর কথায় সায় দিতে হয়েছে। এমনি করে ধীরে ধীরে একদিন মঞ্জুরও ভাল লেগে গেছে মানুষটাকে।

কিন্তু, নিজের পরিবেশ এবং আদর্শের কথা কখনও ভোলেনি মঞ্জু। সরাসরি বলেছে গৌতম মিত্রকে, আপনি বৃথাই আমার পেছু নিয়েছেন গৌতমবাবু। কোনদিন আমি আপনার হতে পারব না।

গৌতম মিত্র উত্তরে বলেছে, একথা বলছ কেন মঞ্জু। আমি যদি তোমাকে সত্যি ভালবেসে থাকি তাহলে কি-অপেক্ষা করতে পারব না—

মঞ্জু বলেছে, অপেক্ষা ! তাহলে আর এজন্মে হবে না। মা বাবা ভাইবোন এদের ছেড়ে কোনদিন আমি আপনার পাশে এসে দাঁড়াতে পারব না।

গৌতম মিত্র বলেছে, এভাবে বোলো না মঞ্জু। বাস্তবে যাই ঘটুক না কেন—আমার স্বপ্নটাকে এভাবে ভেঙে দিও না।

মঞ্জু বলেছে, এ আপনার নেহাৎ-ই পাগলামি। আমার জন্যে আপনি আপনার জীবনটাকে বরবাদ করতে চাইছেন কেন। বাংলা-দেশে কি মেয়ের অভাব আছে ? সে-কথায় ব্যথিত হয়ে গৌতম মিত্র বলেছে, সে তুমি বুঝবে না মঞ্জু। ভালবাসা কি বাসাবাড়ি পাল্টানোর মত কোন ব্যাপার ! জীবনে ভালবাসা একবারই আসে।

মঞ্জু সে-কথার উত্তরে নিরুত্তর থেকেছে। নতুন যুক্তি খুঁজে মানুষটাকে আহত করতে চায়নি।

মঞ্জুর এই গোপন ভালবাসার কথা মাধুরী শুধু জানে। মাধুরীকে বিশ্বাস করে বলেই বলে। না বলে শান্তি পায় না মঞ্জু। সব দরজা বন্ধ করে যেমন ঘরে বাস করা যায় না, তেমনি ভালবাসার কথাগুলো কাউকে না বলে স্থির থাকতে পারে না কেউ। তাই বলে মঞ্জু মাধুরীকে।

এ ব্যাপারে মাধুরী অবশ্য একটা পথের সন্ধান দিয়েছিলো মঞ্জুকে।

বলেছিল, এভাবে নিজেকে প্রতারণা করে কদ্দিন চালাবি মঞ্জু। তাছাড়া, গৌতম বাবুকেই বা কষ্ট দিচ্ছিস কেন। তার চেয়ে বরং রেজিস্ট্রি করে রাখ্। সম্পর্কটা পাকাপাকি হয়ে থাকবে। মনের দিক থেকে অন্তত: স্বস্তিতে থাকতে পারবি।

মাধুরীর প্রস্তাবে প্রথমটায় কেমন উন্মনা হয়ে উঠেছে মঞ্জু। শেষপর্যন্ত নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলেছে, তা হয় না মাধুরীদি। তাতে ওর ওপর অবিচার করা হবে।

মাধুরীর বোখ্ চেপে গেছে। সে বলেছে, অবিচাব কিসেব! তুই তো ওকে ভালবাসিস—এর মধ্যে তো কোন মিথ্যে নেই।

মঞ্জু বলেছে, বিয়ে মানেই একজন মেয়েমানুষের ওপব একজন পুরুষের ষোলআনা নৈতিক অধিকার। ও তখন আমাকে আবো কাছে চাইলে নিজেকে ঠেকাবো কোন জোরে। তাছাড়া কে জানে, হয়ত তখন আমার লোভও বেড়ে যাবে। আমি ঠিক থাকতে পারবো না। মা বাবা ভাইবোনগুলোর ওপব আমাব কর্তব্যেব টানে ভাঁটা পড়ে যাবে।

মঞ্জুকে আর ঘাটায়নি মাধুরী। রেজেস্ট্রির সপক্ষে মাধুরী হয়ত আরো কিছু যুক্তি বাখতে পারত। কিন্তু চুপ করে গেছে। মঞ্জুব জন্যে সহানুভূতিতে তাব বুকের ভেতরটা টলটল কবে উঠলেও মঞ্জুর আদর্শবোধ মুগ্ধ করেছে মাধুরীকে। সেই নবম জায়গাটায় সে বার বার আঘাত করতে চায়নি।

সন্দীপ হাত ধরে একরকম টেনে মঞ্জুকে বসিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আর বলব না। বসুন তো। একেবারে লজ্জাবতী লতা—

সন্দীপ আমুদে হলেও ওর মাত্রা জ্ঞান আছে। কোথায় থামতে হয় তা জানে। তাছাড়া মঞ্জুর ব্যাপারে ও সিরিয়াস। যতটা সম্ভব সমীহ করে কথা বলে। মাধুরী আভাসে ইঙ্গিতে মঞ্জু সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছে সন্দীপকে।

ডলি সরখেল সুযোগ পেয়ে মঞ্জুকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না। বলল, সন্দীপ তো মাধুরীকে বলেছে। তাতে তোর গায়ে ফোস্কা পড়ার কি হল—

সন্দীপ বিপদের গন্ধ পেয়ে ওদের নিরস্ত করল, চুপ করবেন আপনারা। মেয়েদের এই দোষ। একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেন না। ছুটির দিনটা ফালতু কথা কাটাকাটি করে নষ্ট করে কি লাভ। তার চেয়ে আরেক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিই। আর হ্যাঁ, মঞ্জুদেবী, কয়েকখানা রবীন্দ্রসংগীত গাইবেন। অনেকদিন হল আপনার গান শুনি না—

মাধুরী সন্দীপের পক্ষ নিল, চায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত! এই খোলামেলায়। তোফা জমবে!

সন্দীপ চোখে কৌতুক ধরল। মাধুরীর দিকে তাকিয়ে বলল, বটে! আপনার দেখছি দিনকে দিন রসজ্ঞান ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। একটু সাবধান হোন ম্যাডাম।

মাধুরী সন্দীপের খোঁচাটা গ্রাহ্যের মধ্যে নিল না।

চা এল খানিক পরে। প্রথমে আপত্তি করলেও মঞ্জু শেষপর্যন্ত পরপর অনেকগুলো রবীন্দ্রসংগীত গাইল। গান শুনে বোঝা যায়— একসময় ওর গলা খুব ভাল ছিল। এখনও সুর-তাল-লয় সব জ্ঞান নিখুঁত। কিন্তু, অনভ্যাসে গলা বসে গেছে। চড়ায় উঠলে সেটা ধরা পড়ে।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়ামের ওধারের স্টপ থেকে ওরা বাসে তুলল মঞ্জুকে।

মাধুরী পীড়াপীড়ি করলে ও হয়ত আরো খানিকক্ষণ থাকত। কিন্তু করল না। মঞ্জুর মার জ্বর। ওকে বাড়ি ফিরে রান্না করতে হবে। এর ওপর আর কোনো কথা বলা চলে না।

মাধুরী আর ডলি একটু পেছিয়ে পড়েছিল। সন্দীপ এগিয়ে

মঞ্জুকে বাসে তুলে দিতে ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে ডলি বলল, ছেলেটা পটে গেছে যা দেখছি—

মাধুরী ওর কথার হেঁয়ালি ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলছ। সন্দীপ? ছি-ছি, মঞ্জুকে ও বোনের মত ভালবাসে—

ডলি কুৎসিত হাসল, মঞ্জু হবে কেন। তোমার কথা বলছি—

ভূমিকম্প কিংবা অগ্ন্যুৎপাত হলেও মাধুরী এতটা চমকে উঠত না। ওর সারা শরীর জ্বলে উঠল। তবু, এই মুহূর্তে ডলিকে চূড়ান্ত অপমান করতে গেলে যে নাটক তৈরি হবে সেটা মোটেই শোভন হবে না। বিশেষ করে সন্দীপ যখন মাত্র কয়েকগজ দূরে, বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে।

মাধুরী শুধু বলল, তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল ডলি। কি বকছ যা-তা—

ডলি ওর মনের প্রতিক্রিয়াটা ধরতেই পারল না। আগের মত স্বাভাবিক স্বরে বলল, মাথাটা আমার খারাপ হতে যাবে কোন্ দুঃখে। হয়েছে সন্দীপের। পুরুষজাতটাকে আমি ভাল করেই চিনি মাধুরী। সহজেই ভেতরটা দেখতে পাই—

মাধুরীর শরীরের শিরা উপশিরাগুলো আগুনের শিখার মত লকলকিয়ে উঠছিল।

সন্দীপ মঞ্জুকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসে বলল, চলুন, ধর্মতলার দিকে এগোই। মিস সরখেল আপনি বলছিলেন না—ওদিকে সাড়ে পাঁচটার সময় আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে?

ডলি বলল, হ্যাঁ, চলো।

ময়দানে শীতের বিকেল নেমে এসেছে। পাশের ঘাসমাটি থেকে দিনের তাপ মুছে গিয়ে একটা শীতল ভাপ উঠছে। মলিন আকাশ। কুয়াশায় দূরের কাছের গাছগুলো ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। গরমের দিনে এ সময় ময়দানের ধারের বাধানো পথ ধরে এগুবার সময় মাথার ওপরকার গাছগুলোয় অসংখ্য পাখিদের চিৎকার-কলরব হাজার

হাজার নূপুরধ্বনির মত শোনায়। কিন্তু এখন শীত। সেইসব পাখিরা শহর ছেড়ে চলে গেছে হয়ত কোথাও। তাই শব্দহীন গাছের নিচ দিয়ে হাঁটতে মনটাও কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

সন্দীপ একাই কথা বলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ডলি ওর কথার উত্তর দিচ্ছিল। মাধুরীর ভাবনার ভেতরে তখন বিকেলের মলিন আকাশটা ঢুকে গেছে। ওদের কোন কথাই কানে যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে সন্দীপ কথা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। পিছিয়ে পড়া মাধুরীর দিকে ফিরে চড়া গলায় বলছিল, 'কি ব্যাপার ম্যাডাম! হঠাৎ চুপ মেরে গেলেন যে বড়!'

—কিংবা, 'আচ্ছা মহিলা তো আপনি। একসঙ্গে হাঁটছি। আপনি কেবলই পেছিয়ে পড়ছেন। একটাও কথা বলছেন না। ভদ্রতা বলেও তো একটা কথা আছে—'

মাধুরী সে-সব কথার দায়সারা উত্তর দিচ্ছিল, 'সরি', 'আর হাঁটতে ভাল লাগছে না' কিংবা 'এগোন না আপনারা। আমি আসছি'— এই জাতীয়।

লিণ্ডসেস্ট্রীটের মুখে এসে জেব্রা ক্রসিং পেরোল ওরা। তারপর ডানদিকের রাস্তায় চলে গেল ডলি। রুদ্র দত্ত নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে ওর।

ডলি চলে যেতে নিজেকে রীতিমত নিরাশ্রয় বোধ করল মাধুরী। কিছুক্ষণ আগেও যে মানুষটার সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে উজ্জ্বল মনে হচ্ছিল—সেই মানুষটার দিকে সে মুখ তুলে তাকাতে পারছিল না। ডলির বিশ্রি উক্তিগুলো মাধুরীকে হতচকিত করে ফেলেছিল। সে মাথা নিচু করে সন্দীপের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। একটা সঙ্কোচ লজ্জা তার সারা শরীরে জলতরঙ্গের মত বেজে উঠছিল।

গ্র্যাণ্ড হোটেল ছাড়িয়ে বাস ষ্টপের কাছাকাছি এসে মাধুরী জড়ানো গলায় বলল, চলি। বড্ড দেরী হয়ে গেল—

সন্দীপ বলল, আমিও মেসে ফিরব ভাবছি। চলুন, শিয়ালদ' দিয়ে যাবেন। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

মাধুরী বাসেই যাতায়াত করে। কচিৎ শিয়ালদ' ঘুরে ট্রেনে বাড়ি ফেরে।

মাধুরী অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, না, আজ আমাকে বাসে যেতে দিন। অন্য দিন না হয়—। বাড়িতে কাজ আছে।

সন্দীপ মুহূর্তে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। ঈষৎ অভিমান ঝরে পড়ল তার গলায়, চমৎকার! আজই যত কাজ পড়ে গেল আপনাদের! এই জন্যে কি হাফ-ডেটা ম্যানেজ করেছিলাম।

মাধুরী হাসতে চাইল, বিশ্বাস করুন—

সন্দীপ অকাট্য যুক্তি হানল, এমন কিছু বলা হয়নি। শিয়ালদ' দিয়ে গেলে এমন কিছু দেরী হবে না।

সন্দীপের কথাটা মিথ্যে নয়। বেলা সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি। অন্যান্য দিন এর আগে অফিস থেকে বেরুনো যায় না। মাধুরী বলল, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই। বলছি জরুরী কাজ আছে বাড়িতে—

মাধুরী যত জোরের সঙ্গেই বলুক না কেন—কথাটা যে নির্জলা মিথ্যে এটা অনুমান করে নিতে সন্দীপের কষ্ট হল না। সে এবার অন্যপথ ধরল, কাজ না হাতি। বলছি চলুন শিয়ালদ দিয়ে। না গেলে কিন্তু ভাল হবে না বলছি ম্যাডাম—

এখানেই সন্দীপের জিৎ। ও কথাগুলো এমন জোরের সঙ্গে বলে যে বেশিক্ষণ গম্ভীর কিংবা উদাসীন থাকা যায় না।

মাধুরীর গলার স্বর পরিস্কার হয়ে এল, তার মানে! আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন নাকি!

সন্দীপ বলল, হ্যাঁ, তাই দেখাচ্ছি। এখনো কনফারমেশন হয়নি আপনার। কথা না শুনলে ম্যানেজিং ডিরেকটরের কাছে আপনার নামে চুকলি কাটব বলে দিচ্ছি কিন্তু! বলেই খিলখিল করে হাসতে শুরু করে দিল সন্দীপ।

মাধুরী আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না। মেঘ কেটে আকাশ পরিস্কার হয়ে যাবার মত সে-ও ঝকঝকে হয়ে উঠল। বলল, তাহলে তো আপনার কথা শুনতেই হচ্ছে—

কার্জন পার্কের ভেতরে ট্রাম-অফিসের কাছাকাছি এসে সন্দীপ বলল, আরেক কাপ করে চা হবে নাকি ম্যাডাম ?

মাধুরী রাজী হয়ে গেল। বাড়ি থেকে ব্যাগে করে টিফিন আনে। খেয়ে নেয় একটার সময়। আজ জোর ঘোরাঘুরি হয়েছে। চায়ের তেষ্টা তেমন নেই। কয়েক কাপ খাওয়া হয়ে গেছে। আসলে খিদে পেয়ে গেছে। দোকানে ঢুকে যাহোক কিছু খেয়ে নেবে —এই ভেবে মাধুরী বলল, একটা শর্তে যেতে পারি। আজ আমি খাওয়াব। রোজ রোজ আপনি খরচ করেন—

সে কথায় সন্দীপ খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, ঠিক আছে। আমি রাজি। —সন্দীপ হাসলে ওকে তারি সুন্দর লাগে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। মাথাভর্তি একরাশ কোঁকড়া চুল। চৌকো শ্যামল মুখ। টিকোলো নাক। তীক্ষ্ণ চিবুক। বয়সে মাধুরীর চেয়ে তিনচার বছরের ছোট হবে। নীলচে রঙের চশমার ভেতরে খুশি খুশি একজোড়া সজল চোখ। হাসলে সারা মুখে একটা আভা ফুটে বেরোয়।

মাধুরী বলল, তাহলে চলুন, কোন একটা ভাল রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বসি—

ভাল,—ঠোঁটে দুটো আঙুল রেখে তবলার বোল তোলবার ভঙ্গীতে নাচিয়ে ভেবে বলল সন্দীপ, খিদে যখন পেয়েছে, চলুন কে. সি দাশে। ভাল মিষ্টি আর নোনতা পাওয়া যাবে।

মুখোমুখি চেয়ারে বসে লুচি আর রসগোল্লার অর্ডার দিয়ে মাধুরী বলল, এখন মেসে ফিরে গিয়ে কি করবেন ?

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল।

সন্দীপ বলল, কি আর করব। প্রথমে খানিকক্ষণ বিশ্রাম। হাতপা ছড়িয়ে বিছানায় গড়াব। তারপর উঠে স্টোভ ধরাব।

দিনের আহার সন্দীপ অফিসের ক্যান্টিনে সারে।

মাধুরী বলল, মেসে তো মিল হয়। মিছিমিছি রান্নার ঝামেলা করেন কেন?

সন্দীপ খাবার মুখে পুরে দিতে দিতে বলল, আগে তা-ই করতাম। অফিস ক্যান্টিনে ভাতের অ্যারেঞ্জমেণ্ট হবার পর থেকে আর করিনা। মেসের রান্না। যা বাজে—

মাধুরী শুধোল, রাঁধতে পারেন আপনি!

মাধুরীর কথা সন্দীপকে খুশি করল। যে কোন পুরুষ মানুষকেই করে। বলল, রাতের খাওয়া তো, যা হোক কিছু করে নেব—

মাধুরী বলল, বাজার করবেন না?

সন্দীপ বলল, একজনের রান্না। দু'তিনদিনের তরকারী এক সঙ্গে কিনে রাখি। চাল ডাল আছে ঘরে। ঘি আছে। যাবার সময় একটা ডিম কিনে নিয়ে যাব। ডিমের ঝোল, ডাল আর ঘি —প্রেমসে খাব।

মাধুরী ক্রমশ সন্দীপের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে পড়ছিল। সন্দীপের মা বাবা ভাইবোন সব বর্ধমানে থাকে। শহরের ওপর ওদের বাড়ি। বাবা উকিল। ভাল প্র্যাকটিশ। সন্দীপ শনিবার শনিবার বাড়িতে যায়।

মাধুরী বলল, অফিস ক্যান্টিনের যা রান্না, একঘেয়ে। ভালটা মন্দটা খেতে ইচ্ছে করেনা আপনার?

সন্দীপ বলল, ইচ্ছে করলে খাই। একদিন আসুন না আমার মেসে। এমন রুইমাছের কালিয়া খাওয়াব যে—

মাধুরী হেসে উঠল, থাক্, আর আপনার রান্না খেয়ে কাজ নেই। যা বাক্তাল্লা আপনার—

আরো খানিকক্ষণ হয়ত ওরা বসত। কিন্তু দোকানে খদ্দেরের

ভিড়। এক ভদ্রলোক বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ পেছনে দাঁড়িয়ে, ওদের ওঠার অপেক্ষায়।

মাধুরী বলল, চলুন যা ভিড়। এখানে আর বসা ঠিক হবে না।

রাস্তায় নেমে ওরা পার্কের দিকে এল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারদিকে লোকজনের ভিড়। আলোয় ঝলমল করছে চৌরঙ্গী। দোকানীরা রকমারী পসার সাজিয়ে বিচিত্র সুরে হাঁকছে। বেশ ভাল লাগছিল মাধুরীর। অনেকদিন পরে চৌরঙ্গী আবার উচ্ছল হয়ে উঠেছে। গতবছর গণ্ডগোলের জন্য সন্ধ্যার দিকে কার্জন পার্কে এতটা ভিড় থাকত না। ছিনতাই রাহাজানির ভয়ে নেহাৎ দায়ে না পড়লে এদিকটায় তেমন লোকজন আসত না।

সন্দীপ বলল, দেরী যখন হয়েই গেছে চলুন একটু এগিয়ে গিয়ে ফাঁকা ট্রাম দেখে উঠি—

মাধুরী নিরুত্তর থেকে ওর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। বেশ ভালই লাগছিল সন্দীপের সঙ্গে পথ চলতে।

পশ্চিমে কিছুটা এগিয়ে পাশের রেলিঙ-ঘেরা ঘাসজমির দিকে চোখ পড়তে মাধুরীর বুকের ভেতরটা ধ্বক্ করে উঠল। ঘাসজমিতে রেখা বসে। পাশে একটি ছেলে। বয়সে রেখার চেয়ে ছোট। নিয়নবাতির আলো এসে পড়েছে ছেলেটির মুখে। মুখে গুটিগুটি বসন্তের দাগ। ছেলেটি একহাতে রেখাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ নামিয়ে বিশ্রি ভঙ্গিতে কিছু বলছে। আর রেখাও ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে হাসছে খিলখিলিয়ে।

একটা বারো নম্বর ট্রাম আসছিল। বেশ ভিড়। পাদানি ভরে লোক। মাধুরী বলল, চলুন, এই ট্রামটায় উঠি—

সন্দীপ বলল, এটায় নয়। কি ভিড়—

মাধুরী জোরের সঙ্গে বলল, বলছি উঠুন। দেরী হয়ে যাবে বাড়ি ফিরতে।

সন্দীপকে আর কথা বলার সুযোগ দিল না। ট্রামটা কাছে আসতেই ঠেলেঠুলে ভেতরে ঢুকে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মাধুরী।

গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকতে বাতাবীলেবু গাছতলার অন্ধকার থেকে সুহাসিনী বলে উঠলেন, কে বউমা? আজ এত দেরী হলযে—। সুহাসিনীকে দেখতে পায়নি মাধুরী। সারাটা পথ সে সন্দীপের চিন্তায় মশগুল ছিল। তাই হঠাৎ সুহাসিনীর ডাকে থমকে দাঁড়াল। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল অকপটে মিথ্যে কথাটা, বাসে যা ভিড়!

সুহাসিনী কিছু বললেন না। বাতাবীলেবু গাছের নিচেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলেন। মাধুরী জানে,—সুহাসিনী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে নেই। আছেন অনুর অপেক্ষায়। প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থাকেন এম্নি সন্ধ্যার সময়। লেবু গাছতলার অন্ধকারে। আজ কতকাল হল অনু নিখোঁজ। সুহাসিনী প্রতিদিন অপেক্ষা করেন, যদি অনু আসে!

মাধুরী সব জেনেও কাছাকাছি এসে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে মা?

অন্ধকারে সুহাসিনীর মূর্তিটা কেঁপে উঠল যেন। সংক্ষেপে তিনি জবাব দিলেন, এম্নি—

মাধুরী ঘরে ঢুকে দেখল—খাটে চিৎপাত হয়ে পড়ে দেয়ালের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহীতোষ। এ ছবিটা নতুন নয়। আজ দেড় মাস হয়ে গেল, চাকরী যাবার পর থেকে, মহীতোষ বলতে গেলে সবসময় বাড়ীতে। কেমন নিরুত্তেজ। মনমরা। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে।

প্রথম প্রথম মানুষটার ওপর ভালবাসায় মমতায় সহানুভূতিতে সিক্ত হয়ে উঠত মাধুরী।

অফিস থেকে ফিরে কাপড়চোপড় না ছেড়েই এসে বসত খাটের একপাশে। বলত, আজ ফোন করেছিলে আগরওয়াল সাহেবকে?

বিষাদভরা মুখে উত্তর করত মহীতোষ, করেছিলাম—

মাধুরী উৎসাহব্যঞ্জক গলায় প্রশ্ন করত, কিছু বলল ?

মহীতোষের সেই এক মুখ। থমথমে। মলিন। হতাশা-মথিত।

মহীতোষ বুক খালি করে নিশ্বাস ছেড়ে বলত, না, রি-অ্যাপয়েন্ট-মেন্টের কোন আশাই নেই। কোম্পানীর অবস্থা খারাপের দিকে। শিগ্‌গীরই নাকি আরো দু'একজন ছাটাই হবে --

এজাতীয় ঠাণ্ডা উক্তির পরে মাধুরীর আর কিছুই বলার থাকত না। সে প্রতিদিন ভরন্ত মন নিয়ে অফিস থেকে আসত। মানুষটা সারাদিন ঘরে। কে জানে কেমন কাটছে ওর। ফিরে আসত এই মন নিয়ে: মানুষটার পাশে এসে বসবে, সান্ত্বনা দেবে। উষ্ণ সান্নিধ্যে ভরিয়ে তুলবে।

কিন্তু প্রতিবারই মহীতোষ মাধুরীকে নিভিয়ে দিয়েছে। তার প্রশ্নের উত্তর হয়েছে সংক্ষিপ্ত। হাবভাবে যেন মাধুরীকে এড়াতে চেয়েছে। শীতল দূরত্বের ব্যবধান রচনা করেছে মহীতোষ। ও যে কেন এতটা ভেঙে পড়ল—তা মাধুরী বুঝে উঠতে পারে নি। চাকরীটা খোওয়ানোর পর মহীতোষের চরিত্রে দৃঢ়তা যেটুকু ছিল—তাও যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

আগে হলে আরো সহিষ্ণুতা আর ধৈর্য দিয়ে মাধুরী মহীতোষকে জয় করত। সাহস জোগাত। ওর মনের অবস্থা বুঝে সেইমত এগুত। কিন্তু এখন, কাজে ঢুকবার পর থেকে—সাত সকালে সংসারের খুটি-নাটি কাজ সেরে নাকে মুখে দুটি গুঁজে বাইরে বেরিয়ে পড়া। অফিসে বেজায় কাজের চাপ—ফিরে এসে শীতল মহীতোষকে সজীব করে তোলার মত ধৈর্য এখন আর মাধুরীর নেই।

শুধু কি শারীরিক সামর্থ্য, আগের সে মনও নেই মাধুরীর। বাইরের আলো-হাওয়ার টানে মাধুরীর পুরোন ঘর সংসারের একঘেঁয়ে কাজে জীর্ণ মনটাও পাল্টে গেছে। চাকরী পাবার পর থেকে এক অভাবনীয় মুক্তির স্বাদ তাকে বহির্মুখী করে তুলেছে। জীবনের অর্থও বদলে যাচ্ছে আগাগোড়া।

ঘরে ঢুকে মাধুরী অফিসের কাপড় ছাড়ল। ঘরে পরার মত এক-খানা কাপড় পরল। নেট খুলে খোঁপা থেকে ট্রাসেলটা বের করল। তারপর চুল খুলে দিতে দিতে বলল, মঞ্জু কোথায়?

খাটের ওপর আধশোয়া মহীতোষ নড়েচড়ে উঠল, বাবার ঘরে আছে।

মাধুরী বলল, ঘরে বসে আছো। ছেলেটাকে নিয়ে একটু বসতে-ও তো পারো। একদম পড়তে চায় না—

মহীতোষ বলল, কি করব, ও যে বাবার কাছ থেকে নড়বে না—

আজকাল এইজাতীয় খুচরো পারিবারিক কথাবার্তার বেশি ওরা এগোয় না।

সারাদিন খেটেখুটে বাড়ি ফিরে চাকরী সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করলে মহীতোষ যেধরনের জবাব দেবে হতাশ সুরে—সেটা শুনতে ভাল লাগে না বলেই মাধুরীর প্রশ্নগুলো এই রকমের হয়।

মহীতোষ বলল ফের, একটা টিউশনি পেয়েছি বিকালের দিকে। সন্তোষপুরে, চল্লিশ টাকা দেবে—

এ সংবাদে উৎসাহ প্রকাশ করল না মাধুরী। তবু নিয়মরক্ষাবশত ছোট প্রশ্ন করল, কবে থেকে নিচ্ছ?

মহীতোষ বলল, মার্চের শুরু থেকে—

মাধুরী বড় করে একটা হাই তুলল, অনুর কোনো খবর আছে?

মহীতোষ উঠে বসল, না। প্রিয় তো আজও থানায় গিয়েছিল। মহীতোষের উদাসীন উত্তরে ধাঁ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল মাধুরীর। চাকরী চলে যাবার পর ওর আসল মূর্তিটা ধরা পড়ছে প্রকট হয়ে। দম দেওয়া পুতুলের মত অফিস আর বাড়ি। আর মাসান্তে সুহাসিনীর হাতে কিছু টাকা তুলে দেওয়া,—এর বাইরে জীবন বলতে ছিল না কিছু মানুষটার। আটমাসের ওপর হয়ে গেল অনু বাড়ি ফিরছে না। ওর কোন খবর নেই। প্রিয় ঠাকুরপোই মাঝেমাঝে থানায় দৌড়চ্ছে। মহীতোষ বড়ভাই। এখন ওর হাতে অঢেল সময়। ছোট ভাইয়ের

ব্যাপারে ওরও যে একটা দায়িত্ব আছে—এই উত্তমটুকু পর্যন্ত নেই মহীতোষের।

গলার স্বরে বিরক্তি ঝরিয়ে বলল মাধুরী, প্রিয় ঠাকুরপো-তো খবর নিচ্ছেই। তুমি এ ব্যাপারে একটু ঘোরাঘুরি করতে পারো না! পুরুষমানুষ, সারাদিন যে কি করে ঘরে বসে কাটাও—

মাধুরীর এই খোঁচাটুকুতে উত্তেজিত হবার মত জীবনীশক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে মহীতোষ। সে বলল, প্রিয়ই যখন খোঁজখবর নিচ্ছে—তখন আর আমার ওর ভেতরে গিয়ে কি লাভ। তাছাড়া—থানাটানায় যাইনি কোনদিনও। আমি গিয়ে ঠিকঠাক কথাও বলতে পারব না—

মাধুরী আর কথা বাড়াল না। ঘরের বাইরে চলে এল।

সুহাসিনী রান্নাঘরে। রেখা তখনো ফেরেনি। টিউবওয়েলের কাছে এসে ফের একটা হাই তুলল মাধুরী। তারপর হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

সুহাসিনী চা তৈরি করে রেখেছিলেন। বললেন, কি খাবে বউমা? রুটি-তরকারী হয়ে গেছে। দেবো—

প্রত্যেকদিন বাড়ি ফিরে রুটি চিবোতে ভাল লাগে না মাধুরীর। তাছাড়া, আজ কে. সি. দাশে ভাল খাওয়া হয়েছে।

মাধুরী বলল, না। শুধু চা-ই দিন। আজ আর খিদে নেই—

চা শেষ করে মাধুরী বলল, আপনি উঠুন মা। আমি বসছি—

উনুনে ভাত ফুটছিল। বিকেলের দিকে রান্নার মত বিশেষ কিছুই থাকে না। ভাত রুটি হয়। কোন কোনদিন খানিকটা ভাজাভুজি। ললিতমোহন রাতে রুটি খান। ডাল তরকারী মাছের ঝোল সকালের রান্না থেকে আলাদা করে তোলা থাকে।

সুহাসিনী বললেন, সবে দৌড়ঝাঁপ করে এলে! এখন আর উনুনে বসতে হবে না। তার চেয়ে বরং কর্তার খাবারটা দিয়ে এসো।

ললিতমোহনের খাবার তৈরি করে দিয়ে আসার পর রঞ্জনকে

খাওয়ানো। মহীতোষ ঘরে নেই। পাশের মিত্তির বাড়িতে গেছে। বেশিদূর যাবার মত পরিচিত বন্ধুজন নেই ওর। উত্তম সামর্থ্যও নেই।

একে একে রেখা প্রিয়তোষ মহীতোষ ফিরল। ওরা হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসেছে। এই সময়টুকু মাধুরী শ্বাস ফেলতে পারে। লো ভলিউমে রেডিও চালিয়ে বিবিধ ভারতীর গান শুনতে শুনতে রঞ্জনের পাশে শুয়ে ওকে ঘুম পাড়ায়। সারাদিনের দৌরাত্ম্যের পর ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগেনা রঞ্জনের। মাধুরী সচিত্র সিনেমার ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়। আর ফিল্মী হিন্দী গান শোনে।

তারপর ডাক পড়ে মাধুরীর। শাশুড়ী-বউ মুখোমুখি খেতে বসে। তখন যে যার ঘরে। আগে সুহাসিনীর সঙ্গে খেতে বসে নানান্ গল্প হত। কথায় কথায় রাত হয়ে যেত। অনু চলে যাবার পর থেকে সুহাসিনী কেমন গম্ভীর হয়ে গেছেন। তবু, আজ অনেকদিন পরে সুহাসিনী একটা পুরোন প্রসঙ্গ তুললেন। দেশের বাড়ির গল্প। ললিতমোহনের অতীতজীবনের কথা। বিয়ের পর পর ললিতমোহনের নিখোঁজ হয়ে যাবার কথা। ললিতমোহন স্বদেশী দলের পাণ্ডা ছিলেন। মাঝে মাঝে আসতেন গভীর রাতে। দুচারটে কথা বলে আবার উধাও। মহীতোষ তখন পেটে।

এঁটো বাসন ঠিকমত গুছিয়ে ডাই করে রেখে রান্নাঘরের শিকল তুলে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসতে মাধুরী দেখল—মশারী টাঙিয়ে রঞ্জনের একপাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে মহীতোষ।

পাশের ঘরে রেখার গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। সুহাসিনীর সঙ্গে কথা বলছিল রেখা।

রান্নাঘরে যাবার মুখে একবার রেখার সামনে পড়ে গিয়েছিল মাধুরী। মাধুরী কিছু একটা বলবে ভেবেও থেমে গিয়েছিল। কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কখন ফিরলে ঠাকুরঝি—

রেখা বলেছিল, এই তো কিছুক্ষণ। তুমি কখন এলে ?

রেখার প্রশ্নে মাধুরী চোখ নামিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা দুর্ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছিল। তাহলে কি রেখা তাকে দেখতে পেয়েছিল! সন্দীপের সঙ্গে। ট্রাম স্টপের কাছে। বিচিত্র নয়।

রেখাকে পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাবার সময় তাড়াতাড়ি মাধুরী উত্তরটা ছুঁড়ে দিয়েছিল ওর দিকে, আমারও আজ একটু দেরী হয়ে গেছে।

দরজায় খিল দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এসে হাটু ভেঙে বসল মাধুরী। মহীতোষের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের কোন এক বাড়ির রেডিও-তে জাতীয় সংগীত হচ্ছে তখন।

ব্লাউজের ভেতরের ছোট জামাটা খুলে ফেলল মাধুরী। আঁটো-সাটো জামা পরে ঘুমুতে পারে না সে। চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল মাধুরী। চোখ পড়ল আয়নায়। ভেসে উঠল একটা শরীর। টানা টানা চোখ। নিচের পাতায় হালকা করে টানা কাজলের রেখা। চোখ দুটো যেন কেউ আলতো করে ছুরি দিয়ে কেটে বের করেছে। এখনো হাসলে বাঁ গালে সুন্দর একটা টোল পড়ে মাধুরীর।

বিস্ময়ে নিজের প্রতিকৃতির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল সে।

পাশের ঘরে রেখার গলার আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। ওরা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।

কাঁধ থেকে হঠাৎ আঁচল খসে পড়ে বুকটা প্রায় অনাবৃত হয়ে পড়ল মাধুরীর। খোলা ব্লাউজের মাঝখানের অনেকটা জায়গা চোখে পড়ছে। এখনো তার স্তনদুটি যে কোন যুবতী মেয়ের মতই। নিটোল, পুরুষ্টু। দুই স্তনের মাঝখানে একটা জন্ম দাগ। গোলমত। সবুজ রঙের। সাদা মখমলের মত নরম চামড়ার ওপরে চমৎকার ফুটে উঠেছে।

মাধুরী আঙুলের ডগায় নাইট ক্রিম তুলে নিয়ে আলতো করে মুখে মাখতে মাখতে উঠে দাঁড়াল।

পেটের মেদহীন মসৃনতা, সরু কোমর, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঠেলে-ওঠা বুক,—নিজের শরীর দেখে নিজেরই কৌতূহল জাগছিল মাধুরীর।

সন্দীপের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল তার : ম্যাডাম, আপনার ফিগারটা চমৎকার! মডেল হবার মত।

আয়নার কাচে প্রতিফলিত মাধুরীর মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠছিল।

আর সেই সঙ্গে তার সারা শরীরে টসটসে,—সর্দিজ্বরে যেমন হয়, একটা তরল অনুভূতি—যা সুখের, ছড়িয়ে পড়ছিল ক্রমশ।

অনেকদিন বাদে বিছানায় উঠে আসার আগে সবুজ ডুম্ আলোটা জ্বালাল মাধুরী। রঞ্জন বড় হয়ে উঠেছে। ঘুমের মধ্যে কে কেমন থাকে—বলা তো যায় না। তাই অনেকদিন হয়ে গেল রাতে আর সবুজ আলোটা জ্বালানো হয় না।

অনেকটা প্রলোভনে পড়েই মাধুরী সবুজ আলোটা জ্বালাল। ভেতরে ঢুকে অভ্যাস মত মশারীর চারপাশ গোঁজার সময় সন্ধ্যা বেলায় দেখা ছবিটা মাধুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। পার্কে বসে রেখা। পাশে সেই ছেলেটি। মুখে বসন্তের দাগ। বেপরোয়া ভ্রুক্ষেপহীন জড়াজড়ি করে বসে ওরা। নিয়ন আলোয় ওদের অবয়ব চারপাশের মানুষজনকে কৌতূহলি করে তুলছে।

মাধুরীর সারা শরীর ক্রমশ উষ্ণতা পাচ্ছিল। সে রঞ্জনকে ডিঙিয়ে মহীতোষের কাছে চলে এল। মহীতোষ ঘুমিয়ে আছে। কসরৎ করে রঞ্জনের পাশে আধশোয়া হল মাধুরী। শরীরের আধখানা মহীতোষের শরীরে মিশিয়ে দিল। হাল্কা সবুজ আলোয় সাড়হীন পড়ে আছে মহীতোষ। ওর ঘুমন্ত শরীরটা বড়ই শীতল, তাপহীন।

মাধুরী মহীতোষের মাথার চুলে নরম করে আঙুল চালাল কিছুক্ষণ। নিচু হয়ে ঘাড়ে একটা চুমু খেল। আগে সারারাত মহীতোষের বুকের ভেতরে লুকিয়ে থেকে উত্তাপ পেত মাধুরী।

আজকাল পায় না। মাঝখানে রঞ্জন এসে মহীতোষকে বেদখল করেছে। মাধুরী ভুলেই গেছে মহীতোষের নিবিড় আশ্লেষের স্পর্শসুখটুকু।

দূরে কারখানার পেটা ঘড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজল। নানাভাবে মাধুরী জাগাতে চাইল মহীতোষকে। নিচুস্বরে কয়েকবার আবেগতাড়িত গলায় ডাকল—'এই, এই শুনছ'। মহীতোষের পিঠে নখ দিয়ে আঁচড় কেটে, পায়ে পা ঘসে, অনাবৃত বুক ওর দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে, মাথা নামিয়ে চিবুক ওর কাঁধে রেখে—অনেক চেষ্টা করেও মহীতোষকে সজাগ করতে পারল না মাধুরী।

শেষে অসহায় মাধুরীর শরীরের রক্তস্রোত জটিল এবং বিন্যস্ত হয়ে পড়ল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগুনের ফুলকির মত কণা কণা অস্বস্তি আর বিতৃষ্ণা ফুটতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে সে নিরুচ্চার মহীতোষের পিঠে মাথা রেখে কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মাধুরী ভাবল : মানুষটা কতদূর সরে গেছে তার থেকে! অথচ আগে মাধুরী কাছে এলেই ও জেগে উঠত। নিবিড় পেষণ অজস্র আদর আর দেহের নানান জায়গায় মৃদু আচড় কেটে ভালবাসায় উত্তপ্ত করে তুলত মাধুরীকে।

একসময় দারুণ ক্ষোভে অভিমানে মহীতোষের পাশ থেকে উঠে রঞ্জনকে ডিঙিয়ে নিজের জায়গায় চলে এল মাধুরী। আর, এক অসহ্য যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে ঘুমিয়ে পড়ল কখন।

সেইরাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল মাধুরী। দুটি নগ্ন যুবক-যুবতী সামনে দাঁড়িয়ে। প্রথমটায়, অনেকটা চিত্রপ্রদর্শনীতে দেখা ছবির মত মনে হল। আস্তে আস্তে মূর্তিদুটি সজীব হয়ে উঠল। একে অপরের হাত ধরল। বিচিত্রভঙ্গিতে আলিঙ্গন করতে করতে হাত ধরাধরি করে, অনেকটা ডানা ছড়িয়ে দেওয়া পাখির মত, নাচতে শুরু করল। শুরুতে লঘু পায়ে। তারপর দুজনার দেহ হিল্লোলিত হতে লাগল। নাচের গতি বাড়তে শুরু করল। যুবতীটি বারবার পায়ের

তলায় ভর দিয়ে সারসের মত গলা উঁচিয়ে যুবকটির ওষ্ঠ স্পর্শ করতে চাইছিল। আর, যুবকটি সেই আবেদনে নিচু হয়ে যুবতীটিকে নিবিড় করে পেতে লাগল।

দৃশ্যটি, অনেকটা—কোন এক বিদেশী-ব্যালে নাচের-মত। নাচ জমে উঠতে এক একবার যুবকটি যুবতীটির কোমর দুই হাতে ধরে ওকে তুলে ধরেছিল। শূন্যে যুবতীটি নিজেকে পাখির মত মেলে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ দেখার পর মাধুরী আর দর্শক রইল না। তার মনে হল—সে-ই যেন যুবতীটি হয়ে গেছে। যুবকটি চেনা চেনা, অথচ সঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না—হাসছিল নিঃশব্দে।

শেষপর্যন্ত মাধুরী বুঝতে পেরেছিল—যুবকটি আর কেউ নয়, সন্দীপ!

ঘুম ভেঙে যেতে মাধুরী টের পেল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। শিয়রের কাছের জানালা দিয়ে কুয়াশার মত হালকা জলকণা এসে পড়ছিল মাথার চুলে। তখন রাত ফর্সা হয়ে আসছে। শীতকাল। অকাল বৃষ্টি। মাধুরী ভ্রূক্ষেপহীন লেপটাকে মাথা অব্দি টেনে নিয়ে সুখে নিঃসাড় পড়ে রইল।

কয়েকদিন ধরেই মাধুরী তক্কে তক্কে ছিল। কিছুতেই একলা পাচ্ছিল না সন্দীপকে। ডলির নজর এড়িয়ে সন্দীপকে একাচোরা পাওয়া খুবই মুস্কিল। আর মঞ্জু তো সর্বক্ষণ তাদের পাশের টেবিলে।

শেষপর্যন্ত একদিন সুযোগ মিলে গেল। মঞ্জু গিয়েছিল জেনারেল সেকসনে। কি একটা কাজে। আর ডলি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে। সাহেব অফিসের কাজে দিল্লী যাচ্ছেন। তাই কাজের চাপ ছিল। সারাদিন ধরে ডিক্টেশান নিচ্ছিল ডলি।

সন্দীপ বসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের আগের ঘরটায়। ওকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি-এ কাম সেকশন ইনচার্জ বলা যেতে পারে। যাবতীয় কাজের দায়িত্ব ওর।

টিফিনের পর সন্দীপ এসে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, এই

চিঠিখানা একটু চটপট টাইপ করে দিন তো ম্যাডাম। —তখন ঘরে কেউ ছিল না। মস্ত সুযোগ মাধুরীর। বলল, ব্যাপার কি মশাই। আজকাল যে আপনার দেখাই পাওয়া যায় না।

সন্দীপ হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চোখ বড় করল, তার মানে! আপনি দেখছি জিনিয়াস হয়ে উঠলেন। নইলে এতটা মতিভ্রম হবার কথাতো নয়। প্রত্যেক দিন একসঙ্গে অফিস থেকে বেরুচ্ছি—

মাধুরীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সন্দীপ কি অন্তর্যামী! নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল, না, মানে ঠিক তা বলছি না। আপনার সঙ্গে আমার কিছু প্রাইভেট কথা ছিল-

সন্দীপের দু চোখ জ্বলে উঠল যেন, প্রাইভেট! তা এখন তো এখানে কেউ নেই। বলেই ফেলুন না—

মাধুরী হাসিতে প্রলোভন জাগাল, এইখানে! আপনি মশাই বড্ড বেরসিক—

সন্দীপ সে-কথায় কুলকুল করে হেসে উঠল, সবি। ঠিক আছে, তাহলে ছুটির পরে—

মাধুরী ওর প্রস্তাবে প্রশ্রয় পেয়ে গেল, ধ্যেৎ, ছুটির পরে সঙ্গে ছুটি কেউ থাকবে যে—

সন্দীপ কিছু একটা আঁচ করে নিল, ঠিক আছে, একটু আগেই না হয় বেরুব—

মাধুরী বলল, সেটা মন্দ নয়—

সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কথাটা কি যদি একটু আভাস দেন—

মাধুরী কপট ধমকে উঠল, সে তখন বলব, এত তাড়াহুড়ো কিসের!

সন্দীপ আর একপ্রস্থ হাসল, নিশ্চয়ই টপ সিক্রেট, তাই না!

চারটে নাগাদ ওরা দুজনে ছুটি করিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এসব

ব্যাপারে সন্দীপের জুড়ি নেই। ডলির যা নজর। সন্দীপ ঠিক একসময় ডলির অনুপস্থিতিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলল কথাটা।

নিচে নেমে আসতে মাধুরীর উত্তেজনা চরমে উঠল। সন্দীপ টিফিনের পর টাইপের জন্য একটা ড্রাফট্ দিয়ে যাবার পর থেকে মাধুরী আর নিজের মধ্যে ছিল না। ঝড় বয়ে যাচ্ছিল তার ভেতরে।

সন্দীপ বলল, কোথায় যাবেন বলুন ?

মাধুরী বলল, কোথাও নয়।

সন্দীপ বলল, সেকি ! বললেন যে প্রাইভেট কথা আছে। চলুন না ময়দানের দিকে যাই--

কথাটা বলার ইচ্ছে মাধুরীর ষোলআনা থাকলেও ময়দানের ফাঁকায় সন্দীপকে সে-কথা বলার মত নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করতে চাইছিল না মাধুরী। তাছাড়া কথাটা এমন যা ব্যাখ্যা করে বলার মত নয়।

মাধুরী বলল, না। ওদিকে যাব না।

সন্দীপ বলল, তা হলে চলুন চায়ের দোকানে গিয়ে বসি—

মাধুরী বলল, অত সময় নেই আমার। এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে—

সন্দীপ বুঝতে পারল—কথাটা বলতে মাধুরীর সংকোচ হচ্ছে। সে বলল, আজ আপনার কি হয়েছে বলুন তো ম্যাডাম। কেবল উল্টোপাল্টা বকে যাচ্ছেন—

মাধুরী বলল, ম্যাডাম-ম্যাডাম করেন কেন মশাই। আমার কি কোন নাম নেই ?

সন্দীপের মুখ লালচে হয়ে এল। সে বলল, তাহলে কি বলে ডাকব বলুন। মাধুরী—

দু চার জন করে লোক আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মাধুরী বলল, আপনার আস্পর্ধা তো কম নয়। জানেন আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড়—

সন্দীপের ভেতরেও তখন বড় রকমের একটা পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। চশমার ভেতর ওর সজল চোখের দৃষ্টি গাঢ়তর হয়ে আসছিল। নিজেকে যথাসম্ভব শাসনে রেখে স্বাভাবিক গলায় বলতে চাইল সন্দীপ, তা হলে কি বলব। মাধুরী দেবী?

সন্দীপ যতই বিহ্বল হয়ে পড়ছিল মাধুরীর ততই মজা লাগছিল। সে চোখ পাকিয়ে বলল, ফাজিল কেষ্ট কোথাকার! মাধুরীদেবী! ওসব দেবীটেবী আমার ভাল লাগে না। যে নামে ডাকলে ভাল লাগে তোমার, সেই নামে ডাকবে—

আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠল মাধুরী। ওর চোখের রহস্যময় হাসিতে—দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ পাচ্ছিল।

সন্দীপের গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, ঠিক বলেছ। এমন একটা নাম দেব তোমার—

একটা ডবলডেকার এগিয়ে আসছিল স্টপের দিকে।

মাধুরী সেদিকে তাকিয়ে বলল, আজ চলি সন্দীপ। কাল ফের দেখা হবে—

মাধুরীকে বিজয়িনীর মত লাগছিল।

সন্দীপ বলল, আর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে যাও না—

মাধুরী একটা হাত এগিয়ে সন্দীপের হাত ধরল। জোরে চাপ দিয়ে বলল, আজ নয় লক্ষ্মীটি—

তারপর নিচুস্বরে কিছু একটা বলে হাত ছাড়িয়ে স্টপে দাঁড়িয়ে-পড়া বাসে গিয়ে উঠল লাফিয়ে।

সন্দীপ ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছিল।

বাস ছেড়ে দিতে পাদানি থেকে ভুরু কুচকে এক দমক হাসবার চেষ্টা করল মাধুরী।

চার.

বাস থেকে নেমে তড়িঘড়ি জেব্রা-ক্রসিং পেরিয়ে এপারে চলে এল রেখা। এপারে এসে মণিবন্ধে চোখ রাখল। বেলা চারটের কিছু বেশি। এতক্ষণ, বাসের ভেতর, জানালার পাশের সীটে বসে সে মনে মনে হরবিলাসের মুণ্ডুপাত করেছে।

সজলের ইনটারভিউ এণ্ডারসন হাউসে। ইনটারভিউ সেরে ট্রামে কিংবা বাসে চেপে ধর্মতলা পৌঁছুতে কতটা সময় লাগতে পারে। বড় জোর আধঘণ্টা। সজল সময় দিয়েছিল বেলা তিনটে। এতটা সময় কি ও ঘড়িঅলা বাড়িব নিচে লাইব্রেরীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে! কে জানে, হয়ত অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত রেগেমেগে বাস ধবে বাড়ি চলে গেছে। ভাবল রেখা।

চৈত্রশেষের বিকেল। আকাশ মেঘমলিন। নিভন্ত রৌদ্র। বটুয়াটা হাতবদল করল রেখা। মাসের শেষ। অনেক বলে-কয়ে হরবিলাসের কাছ থেকে পনের টাকা অ্যাডভান্স চেয়ে নিয়ে এসেছে। রেখা ফের এদিকের ·বাস্তা পেরুবার জন্য এগিয়ে আসতে ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন কনুই দিয়ে তার বাঁদিকের পাঁজরায় গুঁতো মেরে চলে গেল। বেখা বুঝল, ব্যাপাবটা ইচ্ছাকৃত। এসব অনেকদিন হল তাব গা সওযা হয়ে গেছে। শরীব সম্পর্কে খুব খুঁতখুঁতে হলে মেয়েদের পক্ষে কলকাতার রাস্তায় বেরুনোই দুষ্কর।

ঘড়িঅলা বাড়িটাব নিচে এসে চারদিকে ঘুরে ঘুরে চোখ ফেলল রেখা। ওদিকের লাইব্রেরী-গেট থেকে এদিকের সিনেমা হলের পোর্টিকো পর্যন্ত। কোথায় সজল! ·

রেখা লাইব্রেরীর দিকে এগুল। গেটের সামনে গুচ্ছের পুলিশ দাঁড়িয়ে। কাচের শার্সির ওধারে শীততাপনিয়ন্ত্রিত মস্ত লাইব্রেরী-ঘর।

কতদিন, মনে পড়ে রেখার, গ্রীষ্মের দুপুরে, সে আর সজল লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে মুখোমুখি চেয়ারে বসে সচিত্র ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে সময় কাটিয়েছে। তারপর, বিকেল ভেঙে রোদের তাপ মরে যেতে এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেছে ময়দানের দিকে।

রেখা ফের চৌরাস্তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। প্রতি পদক্ষেপে তার উদ্বেগ বাড়ছে। তবে কি সজল সত্যিই তার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেছে! রেখার মনটা ক্রমশ নিভে আসছিল।

অথচ, আজ সকাল থেকেই সে খুশিতে ভরপুর ছিল। সরকারী স্কুলে চাকরী। মাসতিনেক আগে রিটিং টেস্ট হয়ে গেছে। চাকরীর আশা ছেড়ে দিয়েছিল সজল। একুশজন গ্রাজুয়েট টীচারের জন্য পরীক্ষায় বসেছিল সাতশ'র মত। ক্রমাগত ইনটারভিউ দিয়ে দিয়ে সজল আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। গত সোমবার ওরাল ইনটারভিউর চিঠি এল। রিটিং টেস্টে সজল সিলেক্টেড হয়েছে। খবরটা সেদিনই সজল দিয়েছিল। রেখা তখন টিউটোরিয়াল হোমে। হরবিলাসকে পটিয়ে-পাটিয়ে কিছুটা সময়ের জন্য রেখা সজলের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। বলেছিল, দেখলে তো! আমার কথা ফলল কিনা। আমি জানতাম এ চাকরী তোমার হবেই। ওরালে উৎরে যাওয়া কঠিন কর্ম নয়। রিটিং-এ পাশ করাটাই সমস্যা।

সজল উত্তরে বলেছিল, দাঁড়াও আগে চাকরীটা প[illegible]। আমার যা কপাল—

রেখা রেগে বলেছে, তোমার সবসময় ওই এক কথা। কপাল আবার কি! আমার মন বলছে, এ চাকরীটা তোমার হবেই—

সজল হেসেছে, ইদানীং জ্যোতিষ বিদ্যেটা ধরেছ নাকি?

লাইব্রেরী-গেটের কাছে পুলিশগুলো সমানে জুতো ঠুকছে। আজকাল, এদিকে এলে প্রায়ই চোখে পড়ে রেখার, এই লাইব্রেরীটাকে

ঘিরে প্রতিবাদকারীর দল স্লোগান দিচ্ছে। শুধু কি এখানে। সারা শহর জুড়ে বিক্ষোভ আর মিছিল। কলকারখানা ঘেরাও চলছে। অফিসে ধর্মঘট। কেউ কোথাও সুখে নেই। সমস্ত শহরটাই কঠিন অসুখে ভুগছে। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় সুহাসিনী বলেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস রেখা। কলকাতা শহর, কখন কি ঘটে যায়!—রেখা মার নিষেধবাক্য যতটা সম্ভব মেনে চলতে চেষ্টা করে। বাড়ির আর কেউ পরোয়া করেনা সুহাসিনীকে। রেখা ভাবে: মাকে কোন ব্যাপারে আশ্বস্ত করার মত ক্ষমতা যখন তার নেই তখন বাড়ি ফিরে যাবার ব্যাপারে সুহাসিনীর কথা শুনলে ক্ষতিটা কি। তাতে মার দুশ্চিন্তার খানিকটা তো লাঘব হয়।

ফের মণিবন্ধে চোখ রাখল রেখা। পাঁচটা বাজতে চলল। অফিসের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। রেখা ক্রমশ ক্লান্ত বোধ করছিল। সকালের খুশি-খুশি মেজাজটা নষ্ট হতে চলেছে। রেখার মনে আছে, মেজদা যেদিন প্রথম চাকরী পেয়ে অফিসে যাচ্ছে, মা লক্ষ্মীর সিংহাসনের সামনে বসে সাতসকালে অনেকক্ষণ ধ্যান করেছিল। বেরুবার মুখে মেজদা সুহাসিনীকে প্রণাম করলে তিনি বলেছিলেন, একটু দাঁড়া প্রিয়। পশুপতির চরণামৃত এনে দিই।—ঠাকুর-দেবতায় মেজদার কোনকালেই ভক্তি নেই। অন্যদিন হলে মেজদা মার প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু সেদিন, সেই শুভদিনে, প্রশ্রয়ের সুরে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, আবার এসব কেন মা।—সুহাসিনী বলেছিলেন, পশুপতি জাগ্রত দেবতা। সাতপুরুষ ধরে ওঁর এই বংশে প্রতিষ্ঠা। দাঁড়া না একটু।—সেদিনের কথা কাল রাতে রেখার মনে পড়েছিল হঠাৎ। সকালে উঠে কথাটা ফের মনে পড়ায় সিংহাসনের কাছে ছোট কষ্টিপাথরের পশুপতিনাথের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়েছিল রেখা। মার মত ধ্যান করার সাহস তার হয়নি। পাশের ঘরে বৌদি, কাকের মত ধূর্ত। কিছু একটা আঁচ করলে ও হাসাহাসি শুরু করে দেবে। এই ভয়ে পশুপতিনাথের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে, অনেকটা

ছেলেবেলায় রাতে দুঃস্বপ্ন দেখার পর সকালে ঘুম থেকে উঠে পূবমুখো দাঁড়িয়ে গাছ কিংবা জলের কাছে বিরবির করে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানানোর মত রেখা তার মনের গোপন কথাটা জানিয়ে প্রার্থনা করেছিল। তারপর সারাটা সকাল খুশিতে অস্থিরতায় কেটেছে। সকালে বেশ জোর বৃষ্টি হয়েছিল। সেই সঙ্গে পুবালি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সে কুয়োতলায় ভ্রুক্ষেপহীন বসে বালতির পর বালতি জল ঢালছিল গায়ে। রান্নাঘর থেকে সুহাসিনী মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে একবার ধমকে উঠেছিলেন, কি করছিস রেখা। এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে গায়ে এত জল ঢালছিস কেন। যা সর্দির ধাত। শেষে অসুখে পড়লে কে দেখবে।—রেখা মার কথায় আমল দেয়নি। তার কেবলই মনে হয়েছে, আজকের দিনটাতে তার পবিত্র, শুদ্ধ থাকা দরকার। কেননা, সজলের চাকরী পাবার সঙ্গে তার জীবনের বড় একটা প্রাপ্তির আশা জড়িয়ে আছে। ঘরে এসে রেখা একটা কাচা কাপড় পরেছিল। উৎসবের দিনে বউ-ঝিরা যেমন স্নান করে নতুন কাপড় পরে। আজ দুবছর ধরে নিয়ত বুকের ভেতরে যে ইচ্ছেটা সে লালন করে চলেছে—সেটা যেন সফল হতে চলেছে। এর আগে বহুবার ইনটারভিউ দিয়েছে সজল। কিন্তু কখনো রেখার এ কথাটা আগে এমন করে তার মনে ধরেনি।

মাধুরী ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল। ঘরে ঢুকে রেখা যখন কাপড় ছাড়ছে মাধুরী এসে একটা খোঁচা মারতে চেয়েছিল, কি ব্যাপার, বিষ্টিবাদলার দিনে এই সাতসকালে স্নান! কোথাও যাবে বুঝি ?—রেখার ব্যাপারে এমনিতে মাধুরীর কোন উৎসাহ নেই। বরং, খানিকটা বিরক্তি ও অবজ্ঞা আছে। আইবুড়ো ধিঙ্গি ননদ। তবে কোন কোন ব্যাপারে,—যে কৌতূহলটা সব মেয়েরই থাকে,—বৌদির সেটা রয়েছে। রেখা উদাসীন গলায় জবাব দিয়েছে, না। এমনিই স্নানটা সেরে নিলাম। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি—

এরপর যতক্ষণ ঘরে ছিল রেখা ছটফট করেছে। বৃষ্টি থেমে

আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। পাশের বাড়ির রেডিওতে দেবব্রত বিশ্বাসের সেই বিখ্যাত গানটা বেজেছে,—'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'—তার খুব প্রিয় গান,—তবু গানটাতে কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারেনি রেখা। মাঝখানে একবার পড়া বুঝতে ঘরে ঢুকলে সে নির্দয়ভাবে রঞ্জুকে তাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ, সংসারে সুহাসিনীকে বাদ দিলে রঞ্জু তার সবচেয়ে প্রিয়। মেজদা অফিসে যেতেই সে রান্নাঘরে ঢুকে পিঁড়ি পেতে সুহাসিনীকে বলেছে, খেতে দাও।

সুহাসিনী বলে উঠেছেন, এখনই খেতে বসলি যে বড়! তুই তো যাবি বেলায়—।—রেখার মগজে ধাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেছে, বলেছে, বৃষ্টির দিন। তাই ঠিক করেছি, একটু তাড়াতাড়ি বেরুবো। যাতে সকাল সকাল ফিরতে পারি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে সে প্রথমে ভবানীপুরে নেমেছে। বেলা তখন এগারোটার কিছু বেশী। বুড়ি ছোঁওয়ার মত একবার টিউটোরিয়াল হোমে হাজিরা না দিলে একদিনের মাইনে কাটা যাবার সমূহ ভয় রয়েছে। এই খুচরো কাজটুকুই রেখার সম্বল। এটাকে ভাঙিয়ে এখনো সে সংসারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি সজলের কাছে তার যেটুকু মূল্য তার বড় একটা কারণ এই কাজটা। টিউটোরিয়াল হোমের অফিসিয়াল কাজকর্ম এবং মাঝেমধ্যে টীচাররা অ্যাবসেন্ট থাকলে স্কুল-সেকশনের ছেলেদের ক্লাশ নেওয়া—সব মিলিয়ে মাস গেলে হাতে শ'খানেক টাকা আসে। আর টাকাক'টা আসে বলেই সুহাসিনীর স্বর্ণসিন্দুর, রঞ্জুর জন্যে এটা-ওটা কেনা, এমন কি সজলের জন্যেও কিছু করা যায়। হরবিলাস লোকটা চশমখোর। একদিন কামাই করলে মাইনে তো কাটবেই, উপরন্তু পরের দিন হোমে পৌঁছুতে এ'কথাটা প্রকারান্তরে জানাতে ভুল করবে না যে—তার মত মেয়ে খুদ ছড়ালে কাক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজ টিউটোরিয়াল হোমে গিয়ে রেখা সরাসরি হরবিলাসকে জানিয়েছিল, কোন ভণিতা না করেই, বিশেষ একটা কাজে সে

আড়াইটার পর একটু ধর্মতলার দিকে যাবে। হোমে ক্লাশ শুরুই হয় বেলা একটা থেকে। হরবিলাস উত্তরে বলেছিলেন, সেকি! আজ যে অনেক কাজ। সামনে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা। কয়েকটা কোশ্চেন সাইক্লো করতে হবে। তাছাড়া যতীনবাবু ফোন করেছিলেন, আজ আসবেন না। ওর ক্লাশগুলো— ।—রেখা বলেছে, এখন তো মোটে সাড়ে এগারোটা। তাড়াতাড়ি এসে গেছি। কোশ্চেন আর কটা। চটপট সাইক্লো করে ফেলবো।—অর্থাৎ রেখা পুরোপুরি দায়িত্ব না এড়িয়ে যতীনবাবুর জন্য বরাদ্দ ক্লাশগুলো সে যে নিতে পারবে না তা জানিয়ে দিয়েছিল। হরবিলাস ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু বলেননি। লোকটার স্বভাবই ওই ধাতের। ভীষণ রেগে গেলেও মুখের ওপর অপ্রিয় কিছু বলেন না। একধরনের বিনয়ের সঙ্গে, যতই আপত্তিকর কথা হোক না কেন, মেনে নেয়। এটা একজাতীয় ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। সরাসরি দুকথা বললে লোকটাকে বোঝা যেত। কিন্তু কখ্খনো তা করবেন না। তলে তলে দুষ্টবুদ্ধি আঁটবেন, প্যাচ-পঁয়জার কষবেন। রেখা জানত সরল হেসে হরবিলাস 'ঠিক আছে, সে দেখা যাবে এখন।'—বললেও সে সহজে রেহাই পাবে না।

যা ভয় পেয়েছিল রেখা তা-ই হয়েছিল। কোশ্চেন কটা সাইক্লো হয়ে গেলে হরবিলাস বেয়ারা রঘুর হাত দিয়ে পাশের ঘর থেকে হায়ার-সেকেণ্ডারীর নতুন রুটিন চার্টটা টাইপ করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজটা সেরে উঠতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। রাস্তায় নেমে বাসস্টপ পর্যন্ত মনে মনে হরবিলাসের মুণ্ডু চিবিয়েও রেখার রাগ পড়েনি।

সজল এল পাঁচটার পরে। চৌরঙ্গী তখন রাতের পোশাক পরছে। রেখা ওকে প্রথমে দেখতে পায়নি। পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়ে সজল ডেকেছে, এই রেখা, রেখা!—রেখা ঘুরে দাঁড়িয়ে সজলকে দেখতে পেয়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে। সজল বলেছে, কি ব্যাপার

কালা নাকি! কখন থেকে ডাকছি—।—সজল কথা রাখবেই এই বিশ্বাস পূর্ণ হতেই রেখা মুহূর্তে জল হয়ে গেছে।

রেখা মুখ তুলে স্মিত হেসে বলেছে, তার মানে! আমি তো কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে। তুমি কোথায় ছিলে?—কথা বলার ফাঁকে রেখা সজলকে একবার আপাদমস্তক জরিপ করে নিয়েছে। কামানো গাল পাট করা চুল আর তার দেওয়া বাফ্‌তার খয়েরি রঙের পাঞ্জাবীটা, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। সজল যেদিন সেজেগুজে আসে সেদিন ওর সাথে পথে চলতে গৌরবিনী মনে হয় নিজেকে।

সজল সিগ্রেটে জোরসে টান মেরে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মস্তানের মত হাত নেড়ে বলল, ওই তো, ওই পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে ডাকছিলাম।

রেখা সজলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভিড় থেকে স্বতন্ত্র হতে চাইল। সজল কাছে থাকলে তার ভেতরে একজাতীয় আত্মপ্রত্যয়বোধ জেগে ওঠে। মন থেকে সব অসহায়তা মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে যায়।

রেখা ফের সজলের খয়েরি রঙের বাফ্‌তার পাঞ্জাবীটার দিকে চোখ রাখল। কিছুদিন আগে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর খাদি গ্রামোদ্যোগ-ভবনে গিয়ে এই পাঞ্জাবীর কাপড়টা সে সজলকে কিনে দিয়েছিল। বাফ্‌তার পাঞ্জাবী পরার শখ সজলের অনেকদিনের। শুধু এই পাঞ্জাবীটাই নয়, বছরভর রেখা সজলকে এটা-ওটা প্রেজেন্ট করে। নিজের হাতে ফুল-তোলা রুমাল, চশমার ফ্রেম, টোবাকোর টিন, ঘড়ির ব্যাণ্ড—আরো কত টুকিটাকি জিনিস। সজল পাঞ্জাবীটা বানিয়েছে তা আজ প্রায় দুমাস হতে চলল। এতদিন পরেনি। ইদানীং রেখার কাছ থেকে কোন উপহার নিতে সংকোচ দেখা দিচ্ছে সজলের। অথবা কে জানে, হয়ত ওর পৌরুষে লাগছে। এসব ভেবে এতদিন পাঞ্জাবীটা পরতে রেখা ওকে চাপ দেয়নি। সোমবার ইনটারভিউ লেটারটা আসতে প্রথম সে অনুরোধ করেছিল, আমার দেওয়া পাঞ্জাবীটা পরে কিন্তু ইনটারভিউ দিতে যেতে হবে, বুঝলে?

কিছুক্ষণ আগেও, সজল পৌঁছনোর আগেও, রেখার এই আশঙ্কা ছিল, সজল যা ভুলো-মন, হয়ত সোমবারের অনুরোধ সজলের শেষ পর্যন্ত মনেই থাকবে না।

রেখা নিশ্চিন্ত সুরে বলল, বাজে বোকো না। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিলে! হতেই পারে না। আমি সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—।

সজল সতর্কতার সঙ্গে পোড়া সিগ্রেটটা ফুটপাতে ফেলে স্যাণ্ডেলে মাড়িয়ে দিয়ে হাসল, তাই নাকি! অনেকক্ষণ এসেছ?

এতক্ষণে অভিমানিত হয়ে উঠবার সুযোগ মিলল রেখার। যথা-সম্ভব নিরাসক্ত হবার ভান করে বটুয়াটা হাতের মুঠোয় নামিয়ে এনে বলল, সে খবর জেনে তোমার কি লাভ! স্বার্থপর লোক। তোমার কি কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে? সেই চারটে থেকে এখানে দাঁড়িয়ে। চারপাশে যত আজেবাজে লোক ঘুরঘুর করছে—

সজল কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। সত্যি, সন্ধ্যার দিকে ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে চৌরঙ্গী পাড়া বিপজ্জনক। নষ্ট মেয়ের ভিড়ে ভালমন্দ বিচার করা দুষ্কর। লম্পটের দল চতুর্দিকেই ঘোরাফেরা করছে। একবার রেখাও পড়েছিল এক বদ্‌লোকের পাল্লায়। পার্কের ভেতরকার ট্রামগুমতির নিচে। লোকটা রেখাকে কিছু একটা কু-প্রস্তাব করেছিল। ভাগ্যিস, সেই মুহূর্তে সজল এসে পৌঁছেছিল। রেখা বাধা না দিলে লোকটাকে সেদিন সজল দু'ঘা কাষয়েই দিত। যেতে যেতে রেখাকে নিরিবিলিতে সজল জিজ্ঞেস করেছিল, লোকটা কি বলছিল তোমাকে?—রেখা উত্তর করেছিল, সে কথা তোমাকে বলা যায় না।

সজল এবার হেসে ফেলল, সত্যি, দেরী করে ফেলেছি। এবারের মত ক্ষমা করে দাও। কি করব, ইনটারভিউ শুরু হবার কথা ছিল বেলা একটায়। হ'ল দুটোয়। আমার ডাক পড়ল সাড়ে তিনটের সময়। আজকাল, শালা বেকারদের কোন প্রেষ্টিজ আছে নাকি!

রেগে গেলে সজল অন্য মানুষ। রেখা ওর হাত ধরে টানল, এবার চলো তো। কখন থেকে দাঁড়িয়ে। পা দুটো টনটন করছে।

সজল বলল, কোথায় যাবে?—ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন উন্মনা। আজকাল এধরনের প্রশ্ন প্রায়ই সজল করে। রেখা বোঝে, তাদের সম্পর্কটা ক্রমশ তাপহীন হয়ে আসছে। দুবছরের মত একসঙ্গে ঘোরা-ফেরা, এই শহরের অন্ধিসন্ধি সব তাদের চেনা হয়ে গেছে।

পার্ক রেস্তোরাঁ ময়দান গঙ্গা—কোন জায়গা ঘুরতে বাকি নেই। সপ্তাহে কম করে দুটোদিন তাদের দেখা হয়। প্রথম দিকে কথা ফুরুতে চাইত না। এখন ক্রমাগত একজাতীয় কথা চিন্তা মেলা-মেশায় তাদের সম্পর্কের ভেতরে একটা একঘেয়েমি এসে গেছে। এত কথা বলা হয়ে গেছে যে নতুন করে আর কিছুই নেই বলার। গোটা ব্যাপারটাই পানসে ঠেকছে। এখন এই ঘোরাফেরায় আকর্ষণের চেয়ে অভ্যাসটাই হয়ে উঠেছে বড়।

রেখা বলল, ময়দানের দিকে ফাঁকায় চলো।

সজল প্রস্তাবটা পাশ কাটাল, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে। খাওয়াবে কিছু?

রেখা জিভ টেনে আওয়াজ করল, ইস, সত্যিই তো! একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছ।

ওরা কিছুটা হেঁটে সুরেন ব্যানার্জী রোডের ভেতরকার এক সস্তা-দামের রেস্তোরাঁয় ঢুকল। কোণের দিকের একটা কেবিনে ঢুকল। পর্দা টেনে দেবার আগে বয় জিজ্ঞেস করল, কি খাবেন দিদিমণি, কাটলেট? —এ দোকানে এর আগে তারা বহুবার এসেছে। এই ছোকরা বয়টি তাদের পরিচিত। প্রতিবার বিল মেটানোর সময় ওকে রেখা কিছু টিপস্ দেয়। ছোকরা পরিবর্তে তাদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা করে দেয়। ভাল করে পর্দা এঁটে দিয়ে দুজনে যাতে ঘনিষ্ট হতে পারে সেরকম সময় দেয়। বেশ মনে পড়ে রেখার, গতবছর জ্যৈষ্ঠের

শেষাশেষি এপাড়ায় সে সজলকে নিয়ে একটা জমকালো বিদেশী ফিল্ম দেখতে এসেছিল। শো ভাঙতে বাইরে বেরুতে দেখে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। কোনরকমে ছুটে দৌড়ে ওরা এই রেস্তোরাঁয় এসেছিল। বসেছিল ঠিক কোণের এই কেবিনটাতে। মুখোমুখি নয় পাশাপাশি। তখন সজল অনেক প্রাণবন্ত ছিল। সামান্য কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। উঁচু সুরে কথা বলত। চা খাবার ফাঁকে হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিল। তারপর, রেখা কিছু বলবার আগেই কাছে সরে এসে ডান হাত বাড়িয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরে ঝটিতি একটা চুমু খেয়েছিল। রেখা মুখ নিচু করে এক ঝটকায় সজলকে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, যাঃ, ভারি অসভ্য!—রেখাকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে ফের ওকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের বুকে আধশোয়া করে ঠোঁটে গালে গলায় উষ্ণ মোম-বিন্দুর মত অজস্র চুম্বন এঁকে দিয়েছিল সজল। তারপর থেকে এখানে পর্দা ঘেরা কেবিনে ছোকরা বয়টির প্রশ্রয়ে বহুবার এসেছে তারা। অনেকক্ষণ করে সময় কাটিয়ে পরস্পর পরস্পরের শরীর ছুঁয়ে দিনে দিনে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে-সব কথা মনে পড়ায় রেখা কৌতুক করে হেসে বলল, চপ-কাটলেট নয়। ভারি খাবার চাই। তুমি বরং তরকা আর তন্দুরী রুটি নিয়ে এসো।

বয় পর্দা এঁটে চলে যেতে টেবিলের তলায় একটা পা বাড়িয়ে সজলের পায়ের পাতায় রাখল। তারপর হাসি-হাসি মুখ করে করে বলল, এবার বলো, ইনটারভিউ কেমন হল?

সজল ফের একটা সিগ্রেট ধরাল। ওর চশমার পুরু কাচে রেখা নিজের লম্বাটে হয়ে আসা মুখটা দেখল। ঠোঁটে সিগ্রেট থাকলে সজলকে স্মার্ট দেখায়।

সজল বলল, দিয়েছি তো ভালই। তাতে লাভটা কি!

রেখা নুনের কৌটো তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, আহা, বলোই না। কি প্রশ্ন করেছিল।

সজল দম ছাড়ল, যতসব রাবিশ প্রশ্ন, বস্তাপচা—

রেখা চোখ বড় করল, কি রকম ?

সজল নিম্নমুখে বলে গেল, লোহিত সাগর কোথায়। এবার উইম্বলিডন চাম্পিয়ান কে। ভারতের ফরেন মিনিস্টারের নাম বলো। গান্ধীজী কত সালে লবণ আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন।

রেখা পা গুটোল, সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছ তো ?

সজল অধৈর্য হয়ে উঠল, না দেবার কি আছে! এসব প্রশ্নের উত্তর একটা বাচ্চা ছেলেরও জানা আছে—

বয় জল দিয়ে গেল। রেখা ততক্ষণে কৌটো ঝাঁকিয়ে নুনের কুচি আঙুলের ডগায় নিয়ে জিভে তুলছে। এমন সময় বয় এল। খাবার দিল। সজল রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, চাকরী তো স্কুল-মাষ্টারী। তার জন্যে এসব প্রশ্নের কোন মানেই হয় না। আসলে আগে থেকে লোক ঠিক করা আছে। ইনটারভিউটা সেরেফ প্রহসন। আজকাল মামা-টামা না থাকলে চাকরী হয়!

রেখা শাড়ির কুচি ঠিক করে নিয়ে বলল, এ কাজটা তোমার হবেই। আমি বলছি। দেখে নিও।—রেখাদের টিউটোরিয়ালে সজল কিছুকাল মাস্টারী করেছিল। সেই সূত্রেই ওর সঙ্গে আলাপ।

সজল মুখে গরম গরম রুটি-তরকা পুরে দিয়ে বলল, বারবার তুমি এক কথা বলছ কেন। এর আগে আমি অনেকবারই ভাল ইনটারভিউ দিয়েছি। হয়েছে কিছু ?

রেখা পা নাচাল, বলছি, এবার হবেই। তোমার স্বভাবে মাস্টারী-পনা আছে।

সজল হো-হো করে হেসে উঠে বলল, ব্র্যাভো! আগের জন্মে তুমি নিশ্চয়ই শার্লক হোমসের বোন-টোন ছিলে—

রেখা ডিসটা কাছে টেনে নিয়ে বলল, বোন হতে যাব কোন্ দুঃখে। স্বয়ং—

কথার মাঝখানে ফের হাসতে গিয়ে সজল বিষম খেল।

রেখা বলল, এই আস্তে। হচ্ছে কি। চারপাশের লোকজন কি ভাববে।—সজলকে বহুদিন পরে প্রাণবন্ত হতে দেখে রেখা খুশি হল। আজ সারাটা দিন সে শুধুই সজলের কথা ভেবেছে। ওর চাকরীটা হয়ে গেলে সে বেঁচে যায়। দাঁড়াবার মত মাটি পায় পায়ের তলায়।

তরকা-রুটি সাবাড় করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সজল ফের গম্ভীর হয়ে উঠল। কেমন যেন বিমর্ষ আর ধ্বস্ত। বলল, তোমার আর কি। দিব্যি মনে মনে আকাশে বাগান সাজিয়ে যাচ্ছ। দেশে কতশত বেকার। আমার মত বি-এ ছোকরারা রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সজলের মুখে 'দেশ' কথাটা শুনে রেখা হঠাৎ অন্যমনা হয়ে উঠল। 'দেশ' কথাটা মা ছাড়া আর কারুর মুখে সে শোনে না। অনেক আগে বাবার মুখে শুনত। বাবা 'দেশ' না বলে বলতেন 'স্বদেশ'। মা যে দেশের কথা বলেন সেটা এই দেশ নয়। কুড়ি-বাইশ বছর আগে কোন্ শীতলক্ষা নদীর পাড়ে চিরদিনের মত ফেলে আসা মাতৃভূমি। কয়েকবছর আগেও মা দেশের গল্প করত। রাতে আলো নিভিয়ে সুহাসিনী বিছানায় চলে আসতে রেখা বায়না ধরত। বলত, দেশের কথা বলো।—সুহাসিনী অন্ধকারে স্মৃতি হাতড়ে থেমে থেমে দেশের মানুষ নদী মাঠ ফুল পাখি উৎসবের কথা বলত। মার আরেক পাশে শুত অনু। এক একবার অনু বলে উঠত, চুপ করো না মা। আমার ঘুম আসছে না!—দেশের বাড়ির কথা শুনতে ভাল লাগত না অনুর। লাগবার কথা নয়। অনু জন্মেছে এপারে। রেখার ভাল লাগত। গ্রামের নাম কুসুমপুর। বাড়ির পেছন দিকে শীতলক্ষা নদী। সামনে চণ্ডীমণ্ডপ—প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে দেবারতি। সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে বাড়িতে মনসার ভাসানোর গান। উঠোনের একপাশে গোবরছড়া দিয়ে প্রতিবার শীতের সময় মাঘমণ্ডলের ব্রতের আয়োজন। চৈত্রে নীলপুজো। শুনতে শুনতে রেখার মনে হত সে যেন পূর্বজন্মের

কথা জানতে পারছে। এখন মা-ও আর দেশের কথা বলে না। হয়ত বারবার বলে মা-র স্মৃতি থেকে ওপারের শীতলক্ষা নদীতীরের কোন্ কুসুমপুর গ্রামটা ঝাপসা হয়ে গেছে। সজলের মুখে নতুন করে 'দেশ' শব্দটা শুনে রেখার বুকের ভেতর একটা ব্যাথা মোচড় খেয়ে উঠল।

সজল বলল, কি ভাবছ। খেয়ে নাও চটপট। রাত হয়ে যাচ্ছে। ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। আমাদের পাড়ায় দিনকতক হল যা হুজ্জুতি চলছে—

রেখা মলিন হাসল, হ্যাঁ, চলো।—কতদিন হল রেখা একটা পরিকল্পনা এঁটে রেখেছে। সন্ধ্যার দিকে ময়দানে ঘুরবে দুজনে। আগে যেমন ঘুরত। অনেকদিন ধরে যে গোপন কথাটা সজলকে বলা দরকার, সে কথাটা বলবে। তারপর চলে যাবে গঙ্গাতীরে। আরো নির্জনে। বাবুঘাটের জেটিতে নেমে দোতলায় উঠে ছোট্ট রেঁস্তোরাঁটায় বসে ফের এক কাপ করে চা খাবে। তারপর ডাইনে ইডেন বাগান রেখে হাঁটতে হাঁটতে সেই গানটা ধরবে রেখা। যেটা সজলের খুব প্রিয়,—'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা...।'

বয় আসতে রেখা বিল চুকিয়ে দিল। সেই সঙ্গে টিপস। অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছু বেশি। পুরো একটা টাকা।

দুজনে এসে চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়াল। সজল যাবে উত্তরে। দমদম ক্লাইভ কলোনীতে থাকে। সজল বলল, তুমি আগে ওঠো, তারপর আমি বাস ধরব—

রেখা মাথা নাড়ল, না, আগে তুমি ওঠো। আমি একটু দেরি করে ফিরলে কিছু আসে-যাবে না। মেয়েদের সাতখুন মাপ—

সজল বলল, আমারই বা ভয় কিসের। আমি তো আর পলিটিক্স করি না।

রেখা দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, এতসব আজকাল কে আর ভেবে দেখছে বলো। ইয়ংম্যান হলেই হলো। একবার পুলিশের খপ্পরে পড়লে—

'ইয়ংম্যান' শব্দটা রেখা সজলের প্রসঙ্গে সবসময় জোর দিয়ে বলে। সজল রেখার চেয়ে বয়সে বছর দুয়েকের ছোট তো হবেই। আর একারণে রেখা ওর ওপর সব সময় খানিকটা গার্জিয়ানী ফলাতে চায়।

সজল বিজ্ঞের মত বলল, বাজে কথা। পুলিশ ঠিক লোক চেনে। বরং তুমি এই সন্ধ্যা সাতটায় কার্জন পার্কের মুখে একলা পড়ে গেলে —সেদিনের মত বিপদে পড়তে পারো। এসো, আগে তোমায় বাসে তুলে দিই।

রেখা ইচ্ছা করলে জোর জবরদস্তি করে সজলকে আগে বাসে তুলে দিতে পারত। কিন্তু ওর কথায় সে থেমে গেল। একধরনের আত্মপ্রসাদে রেখার কর্তালি-ভাবটা থিতিয়ে এল। তার মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে সজলের এইজাতীয় সতর্কতায় গর্ববোধ করার মত একটা সূত্র খুঁজে পেল মনে মনে রেখা।

রেখা সহাস্যে বলল, ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল। আমি আগে উঠছি। তারপর, কবে দেখা হচ্ছে ফের ?

সজল রেখার বগলের ভেতরে ডান হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে ব্লাউজের ভেতরকার মাংসল অংশে চাপ দিয়ে বলল, আসছে সপ্তাহে। ধরো সোম-মঙ্গলবার,—এর মধ্যে যেকোন একদিন টিউটোরিয়ালে যাব।

রেখা ধমকাল, এই হচ্ছে কি ! চারপাশে লোকজন না।

সজল তাকে টানল। লাফিয়ে এসে তুলে দিল বাসে।

সকাল বেলা। সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ সুহাসিনী ঘরে ঢুকে হাঁক পাড়লেন, কিরে উঠবিনা। কত বেলা হয়ে গেল !

শেষ রাতের দিকে ভাল ঘুম হয়নি। শীত শেষ হতে না হতেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। বৃষ্টি শুরু হলেই সর্দিকাশি শুরু হয়। প্রতিবারই এমনি হয়। ডাক্তারকে দেখালে বলে, শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাব। পুরো এক কোর্স ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকসন নিয়ে নিন।— কোনবার রেখা নেয়, কোনবার নেয় না। শরীর সম্পর্কে ইদানীং

রেখা হতাশ হয়ে পড়ছে। কয়েকবছর আগে টাইফয়েড হয়েছিল। সেই থেকে শরীর ভেঙে গেছে। রেখা জানে, ডাক্তার-বদ্যি করে শরীরের রুগ্নতা ফেরানো আর সম্ভব নয়।

রেখা আড়মোড়া ভেঙে বলল, উঠছি মা।

সুহাসিনী ওঠেন কাক-ডাকা ভোরে। সকালের দিকে সংসারের সব ধকল সুহাসিনীকেই পোয়াতে হয়। ফলে, এসময় তার মেজাজ ঠিক থাকে না। সুহাসিনী ঝাঁঝালো গলায় বললেন, বেলা বাজে আটটা। এখনও বিছানায় পড়ে আছিস। সবকিছুর একটা মাত্রা আছে!

অনু নিখোঁজ হবার পর থেকেই সুহাসিনী কেমন খিটখিটে হয়ে গেছেন। অথচ আগে এমনটা কখনো ছিলেন না।

রেখা কয়েকটা হাই তুলে আলস্য তাড়াল। তারপর উঠে বসতে মাথার ভেতরটা মৃদু যন্ত্রণায় চলকে উঠল। জানালার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রেখা বলল, শরীরটা ভাল নেই মা। রাতের দিকে বোধহয় জ্বর এসেছিল—

সুহাসিনী ঠাকুরের সিংহাসনের কাছ থেকে খাটের দিকে ফিরে এসে বললেন, সেকি, আবার জ্বর! আমার কথা তো শুনবি না। রাতদিন বাইরে বাইরে টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। আমার হয়েছে মরণ—

খাট থেকে নেমে বেশবাস ঠিক করতে করতে রেখা বলল, না মা, ঠিক জ্বর নয়। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে—

সুহাসিনী বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, যা বুঝিস কর। এ সংসারে আমার কথা আর কেইবা শুনছে—

ইদানীং এ জাতীয় কথা প্রায়ই সুহাসিনী বলেন। সংসারের শতপাকে জড়িয়ে আছেন, অথচ ভেতরে ভেতরে সংসার সম্পর্কে একটা উদাসীনতা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে তার। আগে এমনটা তিনি ছিলেন না। সংসার-স্বামী-পুত্র-কন্যা সম্পর্কে রীতিমত গর্ব ছিল তাঁর।

এখনো তিনিই এই পরিবারের কাণ্ডারী। কিন্তু, ক্রমশ চিন্তায় চিন্তায় কেমন আনমনা হয়ে উঠেছেন।

সুহাসিনী চলে যেতে ফের খাটে বসে পড়ল রেখা। পাশের বাড়িতে রেডিওতে চড়া সুরে হিন্দী ফিল্মের গান বাজছে। কয়েকদিন হল রেখার মন মেজাজ ভাল নেই। পনের দিনের ওপর হল সজলের পাত্তা নেই। সেই ধর্মতলায় দেখা হবার পর আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। এসেছিল টিউটোরিয়াল হোমে। সরকারী ইস্কুলের চাকরীটা হয়নি। রিগ্রেট লেটার এসেছে। সেদিন কেমন মতিচ্ছন্ন ছিল সজল। কথাবার্তায় লাগাম ছিল না। এলোপাথাড়ি বকছিল। বাবার চাকরী আর বেশিদিন নেই। মার শরীর খারাপ। পাড়ায় বোমবাজী মারামারি ফের বাড়ছে। ফলে, বাড়ি থেকে আগের মত বেরুতে পারছে না।

রেখা হরবিলাসকে বলে খানিকটা সময় আদায় করে নিয়েছিল। রাস্তায় নেমে পার্কে গিয়ে বসেছিল তুজন। কিন্তু, সেদিন তেমন জমেনি। সজলকে কেমন মারমুখী, উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। ছোটখাটো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অহেতুক চটে যাচ্ছিল।

জানালা গলে ধারালো ছুরির মত একফালি রোদ ঘরে এসে পড়েছে। বৃষ্টির পরের এই রোদটুকু ঝাঁঝালো হলেও চমৎকার একটা আমেজ আনে। মনে খুশির ঢেউ জেগে ওঠে।

মাধুরীর গলার আওয়াজে রেখা ফিরে বসল, ঠাকুরঝি একটা সেফটিপিন দেবে—

রেখা বলল, ত্যাখো, আমার ব্যাগে আছে।

মাধুরী বলল, না বাবা, পরের জিনিস ধরব না। তুমি ওঠো না। —'আপনপর'—এসব শব্দগুলো সুযোগ পেলেই বলে মাধুরী আজকাল। আসলে চাকরী পেয়ে ও রীতিমত আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে।

রেখা উঠে টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিতে মাধুরী পেছন থেকে বলে উঠল, এই উঠলে ঠাকুরঝি?

মাধুরীর প্রশ্নের ভেতর যে খোঁচাটা রয়েছে সেটাকে হজম করা শক্ত হলেও রেখা উত্তপ্ত হল না। এখন মাধুরীর চাকরীর টাকার মোটা একটা অংশ সংসার খরচের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ফলে, ইদানাং ছোট খাটো প্রসঙ্গে আইবুড়ো ননদকে খোঁটা দিলেও রেখার মাধুরীর কথার ওপর ছুটো কড়া কথা বলা সাজে না।

তবু রেখা নিজেকে সম্পূর্ণ শাসন করতে পারল না। তেতোগলায় বলল, দেখতেই তো পাচ্ছো।

এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী মাধুরী নয়। রেখা ব্যাগ খুলে একটা সেফটিপিন মাধুরীর দিকে এগিয়ে দিতে সে বলল, আজকাল খুব একটা যে বেরোও না! সকাল সন্ধ্যা বাড়িতেই দেখি। ব্যাপার কি ঠাকুরঝি।

রেখা সতর্ক হয়ে উঠল, কেন, ঘরে থাকলে তোমার কোন অসুবিধে হয় নাকি!

মাধুরীও গভীর জলের মাছ। উত্তরে নিরাবেগ হাসল। বলল, আমার আবার অসুবিধের কি। এমনি বলছিলাম—

•

ইদানীং রেখার ব্যাপারে মাধুরীর কৌতূহল যথেষ্ট অর্থবহ। কিছুদিন আগে কার্জন পার্কে হাত ধরাধরি করে সজলের সঙ্গে বসেছিল—অফিস ফেরতা ট্রাম থেকে সেই দৃশ্যটা মাধুরীর নজরে এসেছিল। তার দিনকয়েক বাদে রেখাকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিল মাধুরী এর মধ্যে কবে যেন একদিন কার্জন পার্কে একটি ছেলের সঙ্গে তোমাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম ঠাকুরঝি। ছেলেটি কে? —ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেলেও রেখা সেদিন যথাসম্ভব নিরাসক্ত গলায় জবাব দিয়েছিল, সজলের কথা বলছ? ও আমাদের টিউটোরিয়ালে কাজ করত একসময়। —মাধুরী চোখ বড়

করেছিল, তাই বুঝি। তা ছেলেটি দেখতে তো মন্দ নয়। ঝুলে পড়োনা। মাধুরীর প্রস্তাবটা আপাতঃ সরল মনে হলেও তার ভেতর একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। মাধুরীর কথার ইঙ্গিতটা ছিল এইরকম, অন্তত রেখার তাই মনে হয়েছিল—প্রেমটেম করে যদি এ সংসার থেকে বিদায় নেবার সুযোগ পাও তো সেই চেষ্টাই করো। আমরাও বাঁচি।

সজলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না কদ্দিন হয়ে গেছে। তারওপর মাধুরীর এসব অর্থপূর্ণ কটাক্ষ। রেখা ঝট্ করে রেগে উঠেছিল। বলেছিল সোজাসুজি, তুমি কি এই সাতসকালে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছ বৌদি!

মাধুরী হেসেছিল, এই ছাখো, রাগ করে বসলে! আমি এমন কি বললাম যে--

রেখা চড়া গলায় বলেছিল, আমার পেছনে না লেগে নিজের কথাটা যদি একটু ভাবতে বৌদি।—রেখাও মাধুরীর হাড়ির খবর জানে। সে মাধুরীকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রাস্তাঘাটে যেভাবে চলাফেরা করতে দেখেছে—সেটাও আদৌ দৃষ্টিসুন্দর নয়।

মাধুরী ফের হেসে প্রসঙ্গটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চেয়েছিল। বলেছিল হালকা চালে, ঠিক আছে বাবা। তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। সত্যিই তো, তোমার ব্যাপারে আমি বলার কে। তবে, তোমার দাদা বলছিলেন কিনা, তাই—

রেখা দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, বড়দা! বড়দা আবার কি বলেছে—

মাধুরী গোমড়ামুখে বলেছিল, না তেমন কিছু নয়। সজলের কথা জিজ্ঞেস করছিল।

রেখা চোখ বড় করেছিল, আচ্ছা! সজলের খবরটা এর মধ্যে-ই বড়দাকে বলে দেওয়া হয়েছে!

মাধুরী ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলেছিল, কি করব বলো। তোমার বিষয়ে ও কিছু জানতে চাইলে আমি কি মিথ্যে কথা বলব?

সেদিন ঘৃণায় রেখার শরীর রি-রি করে উঠেছিল। সেই সঙ্গে অভিমানও। সে দাদা-বৌদির আশ্রিত বলেই তারা তার সব ব্যাপারে নাক গলাতে সাহস পাচ্ছে। অথচ, ছোটবোন সে। দাদা হয়ে কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছে মহীতোষ! পেটের ভাত জুগিয়েছে মাত্র। স্কুলের গণ্ডী পেরুবার পর পুজোর সময় ছাড়া কখনো একফালি কাপড় কিনে দেয়নি তাকে। এবাড়ি সেবাড়ি টিউশনি করে কলেজে পড়ার খরচ জুগিয়েছে। রেখা চুপ করে গিয়েছিল সেদিন। সেই মুহূর্তে সেসব কথা বলতে গেলে মাধুরী ক্রুদ্ধ হয়ে এমন কিছু কথা বলে উঠত যা রেখার পক্ষে হজম করা সম্ভব হত না।

মাধুরী কি একটা যেন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে রেখা ফের স্থির হয়ে এল। মনে মনে হাসি পেল তার। ইদানীং রেখা লক্ষ্য করছে, মাধুরী কেনই যেন তাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

রেখা উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুহাসিনী রান্নাঘরে। ললিতমোহন বারান্দার একপ্রান্তে। জলচৌকিতে বসে ঝুঁকে কাগজ পড়ছেন। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ। মেজদা এখনো ওঠেনি। কাল নাইট ডিউটি ছিল না। কিন্তু, গভীর রাত অব্দি আলো জ্বালিয়ে বইটই পড়েছে। বাড়ির কারুর সঙ্গে তেমন একটা কথা বলে না। বাড়িতে মেজদা যতক্ষণ থাকে—ঘরের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। এ বাড়ির সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের প্রিয়তোষ। পড়াশুনো আর খেলাধুলো ছেড়ে সংসারের অভাব মেটাতে চাকরীতে ঢুকতে হয়েছিল ওকে। সেই থেকে নিরুত্তাপ সংসারের ঘানি টেনে যাচ্ছে। মা দু'একবার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিল। মা'র প্রস্তাব শুনে মেজদা বলেছিল, তুমি কি পাগল হলে মা। একেই সংসার চলে না, তার ওপর পরের ঘরের একটা মেয়েকে এনে কষ্ট দেওয়া—তাছাড়া রেখা রয়েছে না!

মাধুরী অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বেরুবার পথে রঞ্জুকে

স্কুলে পৌঁছে দেয় মাধুরী। রঞ্জু রেললাইনের ওধারে এক নার্সারি স্কুলে পড়ে। রেখার ধারণায়—রঞ্জুর প্রতি মাধুরীর সতর্কতা-যত্নে যে আতিশয্য রয়েছে তাতে বাৎসল্যের চেয়ে লোক দেখানো ব্যাপারটাই বেশি।

টুথব্রাশ আর গামছা নিয়ে রেখা কুয়োতলায় চলে এল। আজকে আর স্নান করবে না। শরীরটা দিনকে দিন ভাঙছে। একসময় সে সাধ্যমত শরীরের যত্ন নিত! সকাল-বিকেল প্রসাধিত হওয়া, হরলিকস্-টনিক খাওয়া—সবই করে দেখেছে। ফল কিছুই হয়নি। ক্রমশ শুকিয়ে এসেছে। আসলে প্রত্যেক মানুষের বাড়ের একটা সীমা রয়েছে। বিশেষ করে মেয়েদের। রেখার বয়স গত বৈশাখে আঠাশ পেরিয়েছে। এখন সে বুঝতে পারছে, হাজার তদবীর করেও শরীরের ভাঙন রোধ করা যাবে না।

মাথা ধুয়ে গামছায় মুখ মুছে নিল রেখা। দুদিন হল টিউটোরিয়াল হোমে যাওয়া হচ্ছে না। একে সর্দিজ্বর, তারওপর খুব দুর্বল শরীর। ইচ্ছে থাকলেও হোমে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মাথার যন্ত্রণা এ দুদিন খুব জোর ছিল। আজকে যেতেই হবে। কামাই করলেই হরবিলাস মাইনে কাটে। তাছাড়া, ঘরে বসে থাকলে আকাশ-পাতাল ভেবে ভেবে সে আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। এ-দুদিন বিছানায় শুয়ে কেবলই সজলের কথা মনে পড়েছে। শরীর খারাপ হলে ওর কথা বেশি করে মনে পড়ে রেখার।

রান্নাঘরে এসে পিঁড়ি পেতে বসে পড়ে রেখা বলল,—মা, ভাত—

সুহাসিনী বললেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

রেখা বলল, দুদিন হল হোমে যাই না। ছায়ায় ছায়ায় যাব। দেরী করে বেরুলে ফের জ্বর আসতে পারে। যা রোদ—

টিউটোরিয়াল হোমে পৌঁছুতে দারোয়ান বলল, বাবু আপনাকে ডেকেছেন দিদিমণি। আগে একবার ওর সঙ্গে দেখা করে আসুন।

দোতলায় ক্লাশঘর অফিসঘর। তেতালার চিলেকোঠায় হরবিলাস থাকে। হরবিলাস বিপত্নীক! বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই স্ত্রী মারা

যায়। হরবিলাসের ঘরে ওর স্ত্রীর একখানা আরক্ষ ফটো আছে। সুন্দরী না হলেও মহিলা সুশ্রী ছিলেন। অনেক দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই একটা ব্যাপারে ভদ্রলোকের ওপর মায়া হয় রেখার। হরবিলাসের বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। নিঃসঙ্গ জীবন। এই হোমই ওর ধ্যানজ্ঞান। মাঝে মাঝে আফশোস করে বলেন, এক একসময় কি মনে হয় জানেন মিস রায়, সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও চলে যাই। কি হবে এসব করে!

তেতলায় এসে ঘরে ঢুকতে রেখা দেখল, হরবিলাস খাটে আধ-শোয়া হয়ে পড়ে আছেন। রেখার সাড়া পেয়ে নড়েচড়ে উঠে বসে সামনের চেয়ারটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বসুন।

রেখা চেয়ারে বসল। সে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। দুদিন আসেনি। এবার তাকে কিছু অপ্রিয় কথা শুনতে হবে।

হরবিলাস বললেন, এ-ক'দিন আসেন নি। শরীর খারাপ হয়েছিল বুঝি?

রেখা হাসতে চাইল, হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। সর্দিজ্বরের মত—

হরবিলাস চোখ বুজল, অন্নপথ্য করেছেন?

রেখা সর্দি টেনে বলল, হ্যাঁ, আজই ভাত খেয়েছি।

হরবিলাস চোখ খুললেন, সে-কি! আজ অন্নপথ্য করেই হোমে এলেন! আর দু'একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে এলেই তো পারতেন—

হরবিলাসের কথায় রেখা চমকে উঠল। লোকটা চশমখোর ইতর। ওর মুখে এসব কথা! রেখা উঠে দাঁড়াল, না, তাতে কি হয়েছে। ঘরে বসেও তো সময় কাটতে চায় না। উঠি, দেখি নতুন কিছু কাজ আছে কিনা—

হরবিলাস হা হা করে উঠলেন, আহা বসুনই না। সবে এলেন। কাজ কিছুই নেই। ক্লাশ তো সেই বেলা একটায়। আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে—

রেখা ফের চেয়ারে বসে পড়ল। প্রায়ই হরবিলাস একটা জরুরী কথা বলবার প্রসঙ্গ তোলেন। কিন্তু, বলি বলি করে কিছুতেই বলেন না।

রেখাকে বসতে দেখে হরবিলাসের দুচোখ চকচক করে উঠল। মুহূর্তে ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠলেন। হরবিলাস টেনে টেনে বললেন, কদ্দিন ধরে ভাবছি কথাটা বলবো। কিন্তু কিছুতেই—

রেখা প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দিতে চাইল, তাড়াহুড়োর কি আছে। আর একদিন না হয় বলবেন—

এবার হরবিলাস অতর্কিতে খাট থেকে উঠে এগিয়ে রেখার একটা হাত ধরে ফেললেন। উত্তেজনায় তিনি থরথরিয়ে কাঁপছিলেন। জড়ানো গলায় বললেন, আপনি কি কিছুই এতদিনে বুঝতে পারছেন না মিস রায়? আমি আপনাকে যে—

রেখা চেয়ারের সঙ্গে সেঁটে গেল। কি যে উত্তর করবে বুঝে উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে লোকটার গালে একটা চড় কসিয়ে দিলেও অন্যায় হয় না। কিন্তু, রেখা সে পথে গেল না। এখন ওকে অপমান করার অর্থ—তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়া।

রেখা মিনমিনে গলায় বলল, আহা, ছাড়ুন না। কি করছেন—

হরবিলাস ছাড়ল না। বরং জোরে তার হাত ধরে টানলেন। মুহূর্তে ওর চোখমুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। তিনি ঘরঘরে গলায় বললেন, না, ছাড়ব না। তুমি কথা দাও রেখা—

পরিবেশ আরো ভয়াল হয়ে উঠত। যদি সেই সময় প্রভাপদ ঘরে না ঢুকে পড়ত। প্রভাপদকে দেখে রেখার হাত ছেড়ে দিয়ে বিরক্ত গলায় হরবিলাস বলে উঠলেন, কি ব্যাপার!

প্রভাপদ বলল, এক ভদ্রলোক আপনার খোঁজে নিচে বসে আছেন—

রেখা সেই সুযোগে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে গিয়ে বলল, চলি স্যার।

হরবিলাস হতাশ স্বরে বললেন, আসুন—

পাঁচ.

দুর্ঘটনাটা ঘটল ফেরার সময়। রেললাইন পেরিয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বাঁদিকে পড়ে বড় পুকুরটার কাছাকাছি এসে ললিতমোহন পড়ে গেলেন। রাস্তা-ধারের কাঁচা নালায়। সঙ্গে মহীতোষ ছিল। খোওয়া ওঠা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা। ললিত-মোহনের বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। তার ওপর শিরদাঁড়ার গোড়ার একটা হাড় ভাঙা। সোজা হয়ে হাঁটতে পারেন না। বেমক্কা নালায় একটা পা পড়ায় শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারলেন না।

ভোরবেলা মহীতোষকে সঙ্গে নিয়ে ললিতমোহন বেরিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন ভবানীপুরে। হরিশ মুখার্জি রোডে। সাবেককালের পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে।

ফিরে আসতে প্রায় দশটা। সময়টা এপ্রিলের প্রথম, চৈত্রের মাঝামাঝি। নটা বাজতে না বাজতেই রৌদ্র প্রখর হয়ে ওঠে। তখন পথ চলতে জোয়ান মানুষেরও কষ্ট হয়।

মহীতোষ বাবাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে আনতে চায়নি। যাবার সময় ওরা হেঁটে এসেছিল। তখন রৌদ্র তেজী ছিল না। স্টপে নেমেই মহীতোষ বলেছিল, একটু দাঁড়াও বাবা, আমি একটা রিক্সা ডেকে আনছি।

ললিতমোহনই বাদ সেঁধেছিলেন, আবার রিক্সা কেন। কতটুকু আর পথ। হেঁটেই যেতে পারব। খামাকা কতগুলো পয়সা নষ্ট করে কি লাভ—

বাসস্টপ থেকে রেললাইন পেরিয়ে মহীতোষদের বাড়ি হাঁটা পথে মিনিট কুড়ির মতো।

মহীতোষ বলেছিল, যা রোদ—

ললিতমোহন সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বলেছিলেন, তুই আয়তো, রিক্সা ডাকতে হবে না।

ললিতমোহন যখন পড়ে যায় মহীতোষ তখন অন্যমনস্ক ছিল। কিছুদিন হল এই এক রোগে ধরেছে তাকে। কখনই নিজের মধ্যে থাকে না মহীতোষ।

ললিতমোহন নালায় পড়ে চেঁচিয়ে উঠতে মহীতোষের হুঁশ এসেছিল। ততক্ষণে ললিতমোহনের দুই পা ময়লা কাদায় গেঁথে গিয়েছিল। মহীতোষের একার কর্ম ছিল না যে বুড়োকে টেনে তোলে।

মহীতোষের চীৎকারে বাজারের দিক থেকে জনাকয়েক লোক ছুটে এসেছিল। একদিক ধরে টেনেছিল মহীতোষ, আরেক দিকে আরেক জন। তারপর টেনে হিঁচড়ে ললিতমোহনকে রাস্তায় তোলা হয়েছিল।

তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে রাস্তার অপর পারের এক চায়ের দোকানের সামনের বাঁশের মাচার ওপর ললিতমোহনকে শুইয়ে দিয়েছিল।

ললিতমোহন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিলেন দুই চোখ বুজে।

একজন বলল, তাড়াতাড়ি জল নিয়ে এসো তো।

দোকানী ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আরে. এ যে দেখছি রায়মশাই! কি হয়েছে?

এ অঞ্চলের পুরোন বাসিন্দাদের অধিকাংশই ললিতমোহনকে চেনে। এদিককার জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনীগুলোর পত্তনের সময় থেকে তিনি এখানে আছেন। একসময় কলকাতার শহরের উপকণ্ঠে এইসব জায়গা ছিল পাণ্ডববর্জিত। নিষ্ফলা পরিত্যক্ত নাবাল জমি ছিল এসব। দিনে-দুপুরেও কেউ এদিকে আসতে ভয় করত। ভরা ছিল কাঁটাঝোপ আর জঙ্গলে। শেয়াল আর বিষাক্ত সাপের নিরুপদ্রব রাজত্ব ছিল। পঞ্চাশ সালের শেষের দিকে কয়েকজন অসমসাহসী

মানুষ, যারা সাতপুরুষের ভিটেমাটি চিরদিনের জন্যে ওপারে ফেলে কলকতা শহরের আনাচে কানাচে মাথা গুঁজে পড়েছিল, এখানে দল বেঁধে এসে হাতে লাঠি নিয়ে রাতের পর রাত জেগে জমির মালিকদের ভাড়াটে গুণ্ডাদের রুখেছে। তারাই এসব নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। ললিতমোহন ছিলেন সেই আগুয়ান দলের একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি।

মহীতোষ বলল, হঠাৎ নালায় পড়ে গিয়ে—

প্রথম বক্তা ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, ওসব কথা পরে হবে, আগে একটা বালতি নিয়ে আস্থন তো ভেতর থেকে।

দোকানী ভেতরে ঢুকে বালতি নিয়ে এল। একজন তার হাত থেকে বালতিটা ছিনিয়ে নিয়ে পুকুরের দিকে ছুটে গেল।

একজন পথচারী ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সে বলল, দিনে দুপুরে নালায় পড়ে গেলেন কি করে?

মহীতোষ সেকথার কোন উত্তর দিল না।

প্রথম বক্তা জিজ্ঞেস করল, উনি আপনার কে হন?

মহীতোষ বলল, বাবা—

আরেকজন শুধোলো, আপনি সঙ্গে ছিলেন?

মহীতোষ মাথা নাড়ল।

প্রথম বক্তা বলল, আশ্চর্য! আপনি সঙ্গে ছিলেন,—অথচ খেয়াল করেন নি।' বুড়ো মানুষ, এই বয়সে একটা ফ্র্যাক্চার-ট্র্যাক্চার হয়ে গেলে—

একজন বলল, আমার তো মনে হয় হাসপাতালে রিমুভ করাই ভাল। বলা যায় না—

যে লোকটা পুকুরের দিকে বালতি নিয়ে ছুটেছিল সে ফিরে এসেই ললিতমোহনের পায়ের ওপর জল ঢালতে লাগল।

মহীতোষের মুখ থেকে কথা সরছিল না। দিনকে দিন ঘরে বাইরে সর্বত্র সে দায়িত্বহীন অপদার্থ বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে পদে পদে। মাধুরী

তো প্রায়ই বলে, তোমাকে যে ভগবান কেন পুরুষমানুষ করে পাঠাল সংসারে। কোন একটা কাজ ঠিক ঠিক মত করতে পারো না।

ললিতমোহন একটানা গোঙাচ্ছিলেন। আরো কয়েক বালতি জল এনে তার শরীরের নিচের দিকটায় ঢালা হতে লাগল।

আজ সকালে মহীতোষের জন্যেই ললিতমোহনের ভবানীপুরে যাওয়া। দ্বিজপদ মিত্রের বাড়িতে। ললিতমোহনের স্বদেশী যুগের সহ-কর্মী। দ্বিজপদ মিত্র এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ। মস্ত এক লোহার কারখানার মালিক।

দ্বিজপদর কোন খবরই ললিতমোহন রাখতেন না। রাখার কথাও নয়। বহু বছর আগে তারা একই বিপ্লবী গোষ্ঠীতে ছিলেন। তারপর যেমনটা হয়। সময় যে কার দিকে কিভাবে গড়িয়ে যায়! দেশ স্বাধীন হবার আগে তবু যোগাযোগ ছিল খানিকটা। তারপর, কত ওলট পালট। দেশভাগ, দাঙ্গা, বাস্তুত্যাগ। হাওয়ার গতি ঘুরে যেতে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল। কে তার খবর রাখে।

দ্বিজপদ মিত্রের সন্ধান দিয়েছিল বহু বছর পরে মহীতোষের বড়-মামা। কিছুদিন আগে তিনি ওদের বাড়িতে এসেছিলেন। বহুদিন আসেন না। অনু নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর সেই প্রথম। মহীতোষের যে চাকরী নেই তা জানতেন না। খবরটা শুনে বলেছিলেন, একবার দ্বিজপদ মিত্রের সঙ্গে মহীকে নিয়ে দেখা করো না ললিত।

ললিতমোহন প্রথমটায় বড়মামার কথাটা ধরতে পারেননি, জিজ্ঞেস করেছিলেন, কে দ্বিজপদ মিত্র?

বড়মামা বলেছিলেন, সেকি! দ্বিজপদ মিত্রকে চিনতে পারলে না? একসময় তোমাদের সঙ্গে স্বদেশী করত—

ললিতমোহন একটু ভেবে নিয়ে বলেছিলেন, ও হ্যাঁ, এইবার মনে পড়েছে, আমাদের দ্বিজ। তা হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করে কি হবে? সে এখন কোথায় আছে তা-ও তো জানি না—

বড়মামা বলেছিলেন, দ্বিজপদ মিত্র এখন মস্ত ধনী লোক। লোহার কারখানার মালিক। থাকে ভবানীপুরে।

ললিতমোহন বলেছিলেন, তা দ্বিজ'র এত খবর তুমি জানলে কি করে ?

বড়মামা বলেছিলেন, সুনীল যে কোম্পানীতে কাজ করে তারা দ্বিজপদর কারখানার সাপ্লায়ার। সুনীলের কাছ থেকে ওর খবর পেয়েছি। সুনীল ওদের কারখানায় গেলে দ্বিজপদ প্রায়ই ডেকে তোমার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করে। তোমার সম্পর্কে ওর হাই রিগার্ড আছে।

বড়মামার কথা শুনে ললিতমোহন চুপ করে গিয়েছিলেন। দ্বিজপদ মিত্রের ব্যাপারে কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।

কথাবার্তা হচ্ছিল মহীতোষের ঘরে বসে। সেখানে তখন সুহাসিনী আর মাধুরীও উপস্থিত ছিল। সুহাসিনী বলেছিলেন, দ্বিজপদ মিত্রকে ধরলে মহীর চাকরী হতে পারে—একথা বলছ দাদা ?

বড়মামা মাথা নেড়ে উত্তর করেছিলেন, আলবৎ হবে। ওর কলমের একটা খোঁচায় অনেক কিছু হতে পারে, সামান্য একটা চাকরী তো কিছুই না—

বড়মামা চলে যেতে সেদিন থেকেই সুহাসিনী ললিতমোহনের পেছনে লেগেছিল। আর মাধুরী মহীতোষের।

মহীতোষও ললিতমোহনের মত এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই নিরুৎসাহ ছিল। সে মাধুরীকে বলেছে, দূর্, মিছিমিছি বাবাকে টেনে নিয়ে যাওয়া। কতকাল আগের পরিচয়, সে-সব দিনের কথা কি আর মনে আছে ভদ্রলোকের। তারপর এখন তিনি বড়লোক, আমাদের পাত্তা দেবেন কেন ?

মাধুরী মুখঝামটা দিয়ে উঠেছে, সব ব্যাপারে তোমার কেবল এক গাওনা—হবে না, আর হবে না। একবার গিয়েই গ্যাখোনা। আসলে কাজ করার ইচ্ছা নেই তোমার—সেটা বলো।

পাশের ঘরেও তখন একই দৃশ্য।

সুহাসিনী বলছিলেন, শুনছ?

ললিতমোহন বাঁ কানে ভাল শোনেন না। তাই চেঁচিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়। উনিশ শ' ত্রিশ একত্রিশ সালের কথা। মহীতোষ তখন দুধের বাচ্চা। মেদিনীপুর শহরে এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ললিতমোহন ধরা পড়েন। পুলিশ তাকে অকুস্থলে ধরতে পারে না। ধরা পড়েন কলকাতায়। সঠিক প্রমাণাভাবে জেল হয় বছর তিনেকের মত। কথা বের করবার জন্য পুলিশ অকথ্য নির্যাতন চালায় সেবার। যখন ছাড়া পেলেন—দেখা গেল দেশপ্রেমের নমুনা-স্বরূপ তার শরীরে দুটি চিহ্ন পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল! বাঁ-কানের পর্দা ফাটা আর শিরদাঁড়ার গোড়ার দিকের একখণ্ড হাড় জখম। ললিতমোহন ছিলেন যুগান্তর দলের একজন পাণ্ডা।

ললিতমোহন এক সময় সুহাসিনীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, কি বলছ?

সুহাসিনী উত্তর করেছিলেন, হ্যাঁ, একবার দ্বিজপদ মিত্তিরের কাছে যাবে নাকি? মহী কতদিন হল ঘরে বসে আছে।

ললিতমোহন বলেছিলেন, কতকাল ওর সঙ্গে দেখা নেই। এখন টাকা পয়সা হয়েছে, আমার অনুরোধ কি আর রাখবে?

সুহাসিনী বলেছিলেন, তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

সেকথায় ললিতমোহন ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, দোষের কিছু নয়, তবে এত বছর বাদে দ্বিজর কাছে ছেলের কাজের জন্য যাওয়া—আমার ভাল লাগছে না।

এই হল ললিতমোহনের দোষ। ভয়ঙ্কর একরোখা। যেটা একবার না বলল তাকে হ্যাঁ করানো মুসকিল। ওর গোয়ার্তুমির জন্য একসময় সংসারটা অকূলে ডুবতে বসেছিল। নইলে, জীবনে ললিতমোহনের যে কোন সুযোগসন্ধান আসেনি এমন নয়! দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন সরকার তাকে চাকরী বৃত্তি এসব দিতে

চেয়েছিল। ললিতমোহন সেসব নেন নি। বলেছেন: দেশের জন্যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছি—সে কি কিছু পাবার আশায়। এখন পুরানো দিনের কাজের পুঁজি ভাঙিয়ে যদি সুযোগ নেবার জন্যে সরকারের দ্বারস্থ হই —তাহলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব না!— সুহাসিনী তখন ললিতমোহনের পায়ে মাথা কুটতে বাকি রেখেছিল। কিন্তু, তিনি টলেন নি। সেসময় চারপাশের লোকজনদের কাছ থেকে পাওয়া শ্রদ্ধা সম্মান ললিতমোহনকে সংসার ব্যাপারে অন্ধ-বধির করে রেখেছিল। তারপর, কয়েক বছর পার হয়ে গেলে, পুরোন দিনের কথা মানুষ যখন ভুলতে শুরু করল, ঢেউ থিতিয়ে এল,— তখন সংসারটা পাষাণের মত বুকে চেপে বসল। ললিতমোহন তখন কোমর বেঁধে লেগেছিলেন। যাতে স্ত্রী পুত্র কন্যার মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত তুলে দেওয়া যায়। প্রথমে খুললেন বাজাদের দিকে একটা লণ্ড্রী। সেটা চলল না বেশীদিন। যে ছোকরা দোকানের দেখা-শোনা করত—সে একদিন রাত করে সব জামাকাপড় ঠ্যালাগাড়িতে চাপিয়ে ললিতমোহনকে পথে বসিয়ে কেটে পড়ল। তারপর, পঞ্চাশ একান্ন এবং বাহান্ন সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আড়াইটা বছর মহী চাকরীতে ঢুকবার আগ্ পর্যন্ত,—সংসারের ওপর দিয়ে সে যে কি ঝড়ই না বয়ে গেছে! ছেলেমেয়েদের মুখের অন্ন যোগাড় করতে পারেননি ললিতমোহন। সুহাসিনীর হাতে সোনা দানা যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সব টেনে টুনে নিয়ে বিক্রি বন্ধক করে, একে একে ঘরের তামাপেতল সব খুইয়েও নিস্তার পাননি ললিতমোহন। তখন বাস্তব অবস্থা ললিতমোহন একটু একটু করে বুঝতে পারছিলেন। স্ত্রী সন্তানের মুখে ক্ষুধার অন্ন তুলে দিয়ে কায় ক্লেশে বেঁচে থাকাটা যে কি কষ্টের তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। কিন্তু, ততদিনে জল অনেক দূর নিচে গড়িয়ে গেছে। ললিতমোহন বুঝে গিয়েছিলেন, সময় কারুর জন্যে চিরকাল ঘরের চৌকাঠের কাছে অপেক্ষা করে বসে থাকেনা।

সুহাসিনী ললিতমোহনের কথায় তেতে উঠেছিলেন, কেন! ছেলের কাজের জন্যে একবারটি যেতে পারবে না। দ্বিজপদ মিত্তির কি সাপ না বাঘ!

ললিতমোহন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, সে তুমি বুঝবে না—

জল দিয়ে ধুইয়ে ময়লা পরিস্কার করার পর দেখা গেল—ললিত-মোহনের ডান পায়ের হাটুর ওপর একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়াও পায়ের নিচের দিকেও অনেকটা জায়গায় চামড়া ছড়ে গেছে। ইতিমধ্যে কেউ একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিল। ডাক্তারবাবু নিজের হাতে আয়োডিন তুলোয় লাগিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে মহীতোষ বলল, এবার বাড়ি নিয়ে যাব ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, আপাতত তাই যান। আমার তো মনে হয় ইনজুরি তেমন ফ্যাটাল নয়। তবে নোংরা নালায় পড়ে গিয়েছিলেন। তাই ইমিডিয়েটলি অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকসন পড়লে ডেঞ্জারটা আর থাকে না।

মহীতোষ বলল, আপনি যদি একবার আমার সঙ্গে বাড়িতে আসেন। আপনার ফি-টাও, সঙ্গে নেই বলেই—

ডাক্তারবাবুর বয়স বেশি নয়। কিছুদিন হল বাজারে চেম্বার খুলেছেন। প্র্যাকটিশ মন্দ নয়। বললেন, তার জন্যে কি আছে। আপনি আগে ওকে বাড়ীতে নিয়ে যান তো। আমি ইঞ্জেকশন নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।

ললিতমোহন কাৎরাচ্ছিলেন এক নাগাড়ে।

মহীতোষ তার দিকে ঝুঁকে বলল, বাবা খুব কষ্ট হচ্ছে?

ললিতমোহন অর্ধস্ফুট কণ্ঠে কিছু একটা বলতে চাইছিলেন—তার কথা মহীতোষের বোধগম্য হল না।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

চায়ের দোকানী বলল, রিকসা ডেকে আনি তাহলে? মহীতোষ সম্মতি জানাল।

দ্বিজপদ মিত্রের বাড়িতে যাবার আদৌ ইচ্ছে ছিলনা ললিতমোহনের। সুহাসিনী অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। শেষে নিমরাজী হয়ে গিয়েছিলেন ললিতমোহন। বলেছিলেন অনিচ্ছা নিয়ে, ঠিক আছে। এত করে যখন বলছ,—যাব।

রাত থাকতে সুহাসিনী তাদের ডেকে তুলেছিলেন। কুটো—কাটা জ্বেলে চা করে দিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে সুহাসিনী মহীতোষকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, দেখিস মহী, কলকাতার যা রাস্তাঘাট। গাড়িঘোড়ার ভিড়। বুড়োর হাত ধরে পথ চলিস কিন্তু—

যাবার সময় বাসে ভিড় ছিল না। চরকডাঙ্গার মোড়ে নির্বিঘ্নে নেমেছিল ওরা। তারপর পূর্ণ থিয়েটারের পাশ দিয়ে এগিয়ে ভেতরে ঢুকে হরিশ মুখার্জি রোডে পড়ে পার্কটা ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই দ্বিজপদ মিত্রের বাড়ি। চিনতে অসুবিধা হয়নি মহীতোষের।

বিরাট হাল ফ্যাসানের চারতলা বাড়ি। গেটের কাছে পৌঁছুতে দারোয়ান এগিয়ে এসেছিল। প্রথমটায় তো ঢুকতেই দেবে না। অনেক বলা কওয়ার পর দারোয়ান তাদের একতলায় বসার ঘরে নিয়ে গয়েছিল। পাখা খুলে দিয়ে একটা সাদা কাগজ এনে মহীতোষকে বলেছিল, এতে আপনার নাম ঠিকানা লিখে দিন।

আধঘণ্টার মত বসবার পর দ্বিজপদ মিত্র ভেতরের দরজা খুলে আবির্ভূত হয়েছিল। পরণে সিল্কের স্লিপিং গাউন। মুখে পাইপ, মাথায় মস্ত টাক। ছুঁচলো মুখ। বয়সে ললিতমোহনের চেয়ে ছোট। মজবুত স্বাস্থ্য। দুহাতের আঙুল ভরে হীরেমুক্তোর আংটি।

আগের দিন রাতে দ্বিজপদ মিত্র সম্পর্কে মহীতোষকে কিছু তথ্য জানিয়ে রেখেছিলেন ললিতমোহন। উনিশশ' উনচল্লিশ সাল। কোন এক

মফঃস্বল শহরের ট্রেজারী লুঠ করতে গিয়েছিলেন ললিতমোহনেরা। দলে ছিলেন চারজন। দ্বিজপদ সবার ছোট। দলে নতুন রিক্রুট। মোটর ড্রাইভিং-এ ভাল হাত ছিল বলে ওকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিজপদ ছিল ট্রেজারী অফিসের গেটের বাইরে। রাস্তায়। মোটর গাড়ির ভেতর। কলকাতা থেকে চুরি করে নিয়ে আসা মরিস গাড়ি। অপারেশনের লীডার ছিলেন ললিতমোহন। তিনিই প্রথমে অ্যাকশন শুরু করেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। কাজ নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়েছিল। ব্যাগ ভর্তি রাশীকৃত টাকা নিয়ে বাইরের গেটের দিকে ছুটে গিয়েছিল অবিনাশ, দলের আরেকজন। ব্যাগটা মোটর গাড়ির মধ্যে ঠিকমত ছুঁড়েও দিয়েছিল। কিন্তু, নিজে আর গাড়িতে উঠতে পারেনি। ট্রেজারী অফিসের বারান্দা থেকে একজন সেপাই ফায়ার করে অবিনাশকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে দিয়েছিল। দ্বিজপদ অবিনাশকে পড়ে যেতে দেখে দ্রুত গাড়ী ড্রাইভ করে পালিয়ে যায়। ললিতমোহন আর দলের অপর জন—করুণাশঙ্কর সোম, অবস্থা বেগতিক দেখে ট্রেজারীর পেছন দিককার পাচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়। ললিতমোহন সেদিন রাত্রেই সেই শহরে ধরা পড়ে যান। করুণাশঙ্কর অবশ্য সেবারের মত গা ঢাকা দিতে পেরেছিল। পরে শ্রীরামপুরে পুলিশের এক বড়দরের অফিসারকে হত্যা করার দায়ে করুণাশঙ্করের ফাঁসি হয়। ললিতমোহন জেল থেকে ছাড়া পান দেশ স্বাধীন হবার পরে। কিন্তু সেই যে ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে দ্বিজপদ উধাও হল—তার সন্ধান আর কেউ পায়নি।

দ্বিজপদ ঘরে ঢুকতেই ললিতমোহন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, কি দ্বিজপদ, চিনতে পারছ ?

দ্বিজপদ হাসবার চেষ্টা করেছিল, নিশ্চয়ই পারছি। তোমাকে কি ভোলা যায় ললিতদা। বোসো, বোসো—

ললিতমোহন ফের চেয়ারে বসেছিলেন। কোন ভণিতা না করেই বলেছিলেন, তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি দ্বিজ।

দ্বিজপদ বলেছিল, কাজের কথা পরে হবে। আগে বলো—কেমন আছ। কতদিন বাদে দেখা—

সে-কথায় ললিতমোহনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে উঠেছিল। তিনি মলিন মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর—

দ্বিজপদ চোখ বড় করেছিল, বলো কি! এ্যাদ্দিন হয়ে গেছে!

ললিতমোহন বলেছিলেন, সময় তো আর আমাদের জন্যে বসে নেই দ্বিজপদ—

দ্বিজপদ জিজ্ঞেস করেছিল, এখন কোথায় আছো ললিতদা?

ললিতমোহন বলেছিলেন, যাদবপুরের দিকে।

দ্বিজপদ ভাবতে চেয়েছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কার কাছে যেন শুনেছি—তুমি যাদবপুরে আছ।

ললিতমোহন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সুনীলের কাছে। আমার বড় সম্বন্ধীর ছেলে—

দ্বিজপদ প্রশ্ন করেছিল, সুনীল, সে যেন কে?

ললিতমোহন বলেছিলেন, তোমার কারখানায় ওরা কি সব যেন সাপ্লাই করে—

দ্বিজপদ ধরতে পেরে বলেছিল, হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে। সুনীল বোসই বলেছে আমাকে। তারপর বলো কেমন আছো?

ললিতমোহন মুখে হাসি ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, যেমন দেখছ দ্বিজপদ—

কথাটা দ্বিজপদকে বিচলিত করেছিল। সে অন্য প্রসঙ্গে গিয়েছিল তারপর, সঙ্গে এটি কে?

ললিতমোহন বলেছিল, আমার বড়ছেলে—মহীতোষ।

এমন সময় ট্রে-তে সাদা পাথরের গেলাসে করে চাকর সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। গেলাসটা হাতে নিয়ে কয়েক চুমুকে নিঃশেষ করে বলেছিল দ্বিজপদ, বলো, কি খাবে ললিতদা—চা, না সরবৎ?

ললিতমোহন বলেছিলেন, বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি। এখন আর কিছু খাব না। বয়স তো কম হয়নি—

শূন্য সরবতের গেলাস ট্রে-তে তুলে নিয়ে চাকর ভেতরের ঘরে চলে যেতে দ্বিজপদ বলেছিল, এক্‌জাক্টলি! ঠিক বলেছ ললিতদা। বয়স তো আমাদের কম হল না। এই হ্যাখো, এখন আমার প্রেসার টু হানড্রেডের ওপর। ডায়েট কন্ট্রোল করতে হচ্ছে। ভালটা মন্দটা ইচ্ছেমত খেতে পারছি না। কখন যে চোখ ওল্টাই। তার ওপর যা গরম পড়তে শুরু করেছে, কলকাতায় সামার অসহ্য। ভাবছি— একবার দার্জিলিং-এ যাব। মাসখানেকের মত থেকে আসব ওখানে।

ললিতমোহন চুপচাপ বসেছিলেন।

শেষে দ্বিজপদই তুলল প্রসঙ্গটা, তারপর হ্যাঁ, কি যেন বলছিলে? কি একটা কাজে এসেছ—

ললিতমোহন সর্দি টেনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। তারপর ভেঙে ভেঙে বলেছিলেন, মহীতোষ—এই যে, আমার বড়ছেলে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ, পড়ায় মাথা থাকলেও সংসারের চাপে পড়ে লেখাপড়া আর বেশিদূর করতে পারেনি। দশ বছরের ওপর হয়ে গেল এক মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করত। ডিলিং ক্লার্ক ছিল। হঠাৎ গত জানুয়ারী মাসে রিট্রেঞ্চ হয়ে গেল। সেই থেকে ঘরে বসে। ওর চাকরী-বাকরির যদি একটা সুরাহা করে দিতে পারো—

বলতে বলতে ঘেমে উঠেছিলেন ললিতমোহন।

দ্বিজপদ জিজ্ঞেস করেছিল, কোন কোম্পানী?

মহীতোষ কোম্পানীর নাম বলেছিল।

দ্বিজপদ মুহূর্তে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। তার হাস্যময় মুখে একটা বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। বলেছিল বক্তৃতার ঢঙে, হ্যাখো, ললিতদা, এই হয়েছে আমার মুস্কিল। সকলে ভাবে, ষ্টিল ফ্যাক্টরীর মালিক আমি, এক কথায় চাকরী দিতে পারি। কিন্তু আমার যে কি অবস্থা, বোঝাই কাকে। গভর্নমেণ্টের কাছে কয়েক লক্ষ টাকা পাওনা

আছে, দিচ্ছে না। কনষ্ট্যাণ্ট লেবার ট্রাবল্‌। ব্যাঙ্ক থেকে ওভার ড্রাফ্‌ট নিয়ে নিয়ে ফতুর হতে চললাম। মান্থলি স্টাফ পেমেণ্ট করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এ সময় নতুন রিক্রুটমেণ্টের কথা ভাবতেই পারছি না। তবে তুমি যখন বলছ, ওকে আমি দু'এক জায়গায় পাঠাতে পারি। আমার পরিচিত কনসার্নে। লেটার অব ইনট্রোডাক্‌শান দিয়ে। হবে কি না বলতে পারছি না, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

ললিতমোহন ক্রমশ পাথরের মূর্তি বনে যাচ্ছিলেন।

দ্বিজপদ কথা শেষ করলে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসেছিলেন ললিতমোহন। শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন, যখন তোমার হাতের মধ্যে নেই, তখন আর কি করবে বলো।

দ্বিজপদ বলেছিল, একথাটা ক'জন বোঝে বলো ললিতদা। সকলেই ভাবে আমি যেন গড—

এমন সময় দ্বিজপদর চেয়ারের পেছনদিকটায় হোয়াট-নটে রাখা ফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠেছিল। দ্বিজপদ পেছন ফিরে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বকর বকর শুরু করে দিয়েছিল, হ্যালো, কে? অজিত? প্লেনের টিকিট বুক হয়ে গেছে? হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা! নাম শুনিনি যে! ভাল বলছ। দুটো স্যুট পাওয়া যাবে তো? হ্যাঁ.হ্যাঁ, এক মাসের জন্য। কন্টিনেণ্টাল ডিসের অ্যারেঞ্জমেণ্ট আছে তো? কখন আসছো? বিকেলে? আসার পথে একবার আমাদের মিষ্টার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে এসো। ব্যানার্জিকে চিনলে না?. ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। ওই এগার লাখ টাকার পেণ্ডিং কেসটা মনে পড়ছে? ওটার ব্যাপারে ভদ্রলোক কতদূর কি করলেন জেনে এসো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার বলা আছে, সে আমি খাইয়ে রেখেছি।

রিসিভার যথাস্থানে রেখে দ্বিজপদ বলেছিল, কিছু মনে করলে না তো ললিতদা? কোনরকম প্রভিশন থাকলে আমি এক্ষুনি তোমার ছেলেকে আমার ফ্যাক্টরী-অফিসে নিয়ে নিতাম।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্নের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

দ্বিজপদ বলেছিল, জাষ্ট এ মিনিট ললিতদা।

সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে বাইরে থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, বাপি, আমার কিন্তু হয়ে গেছে। তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

দ্বিজপদ বলেছিল, না মলি, তুমি একলা যাও আজ। আমার হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেছে —

দ্বিজপদ ফিরে এসে বলেছিল, আমার মেয়ে মলি। ক্লাবে যাচ্ছে। টেনিস প্র্যাকটিশে। গতবার ও অল বেঙ্গল টেনিস চাম্পিয়নশীপে রানারস্ আপ হয়েছে—

ললিতমোহন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মহীতোষকে উদ্দেশ করে বলছিলেন, চল্ মহী—

দ্বিজপদ বলেছিল, সে কি! লেটার অফ ইনট্রোডাকশনটা নেবে না?

ললিতমোহন দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে উত্তর করেছিলেন, সে আর একদিন হবে দ্বিজ।

রাস্তায় নেমে ওরা দুজন কিছুক্ষণ কোন কথাই বলেনি। ললিত-মোহনের চলার গতি শ্লথ হয়ে পড়ছিল। তিনি বারবার পেছিয়ে পড়ছিলেন।

রোদ ক্রমশ বাড়ছিল।

পূর্ণ থিয়েটারের কাছে এসে মুখ খুলেছিলেন ললিতমোহন, দেখলি তো! দ্বিজপদ আমাকে কি অপমানটা করল! আমি তো ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি।

রিক্সা এসে গেল। ললিতমোহন চোখ মেলে তাকালেন। মহীতোষ বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?

ললিতমোহন মাথা নাড়লেন।

মহীতোষ শুধোল, রিক্সায় উঠতে পারবে?—প্রশ্নটা অবান্তর। তখন ললিতমোহনের যা অবস্থা। হাঁটু মুড়তেই পারেন না।

সবাই মিলে একরকম পাঁজাকোলা করে ললিতমোহনকে রিক্সায় তুলে দিল। তিনি চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা ভুলতে চাইলেন।

খোওয়া-ওঠা পথে রিক্সা চলতে শুরু করলে ঢাল হয়ে শোওয়া ললিতমোহনের মাথাটা মহীতোষ নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিল।

সারাটা পথ বকবক করলেন ললিতমোহন, আমি আগেই জানতাম। ও কিছু করবে না। দ্বিজপদকে আমি চিনি না। ও একটা জ্যান্ত শয়তান। তোর মা পীড়াপীড়ি করল। নইলে যেতামই না—

মহীতোষ সর্বক্ষণ চুপ করে ছিল।

ললিতমোহন, থেকে থেকে ফুঁসে উঠছিলেন, তোদের তো জানার কথা নয়। ট্রেজারী লুটের সব টাকা ও আত্মসাৎ করেছিল। শুধু কি তাই, রাজসাক্ষী হয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল। আমি জানিনা, আজ যে ওর এত ধনদৌলত—বাড়ি-কারখানা— ,এসব হল কোত্থেকে। সব সেই লুটের টাকা থেকেই—। আমাদের দলের লোক ওকে শেষ করে দিতে পারেনি। পারবে কি করে। ও বার্মায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। তারপর, দেশ স্বাধীন হলে ফিরে এসেছিল—

ললিতমোহন বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। বাবাকে এতটা ক্রুদ্ধ হতে এর আগে মহীতোষ কখনো দেখেনি। সে বাবাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল, যা হবার হয়েছে। তুমি এ নিয়ে এত ভাবছ কেন বাবা। চাকরী আমার কপালে নেই—

রিক্সা বাড়ির গেটের সামনে আসতেই মহীতোষ হাঁক ছেড়ে ডাকল, রেখা, রেখা—

সে-সময় বাড়িতে সুহাসিনী ছাড়া কেউ থাকার কথা নয়। মাধুরী প্রিয়তোষ কাজে চলে গেছে। রেখাও টিউটোরিয়ালে, রঞ্জু ইস্কুলে—

সুহাসিনী উঠোনে ছিলেন। তারে কাচা কাপড় ছুড়ে দিচ্ছিলেন।

ভাগ্যক্রমে রেখাও ছিল। ঘরে। মহীতোষের চিৎকারে প্রথমে এগিয়ে এলেন সুহাসিনী।

দূর থেকেই বললেন, কি হয়েছে মহী? চেঁচাচ্ছিস কেন?

রেখাও তার পেছন পেছন এল।

মার কথার জবাব দেবার মত সময় মহীতোষের ছিল না। সে রেখাকে উদ্দেশ করে বলল, যা তো, শিগগীর পাশের বাড়ি থেকে রতনদের ডেকে নিয়ে আয় তো—

সুহাসিনী গেটের বাইরে চলে এলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন ফের, কি হয়েছে রে মহীতোষ?

রিক্সার কাছাকাছি এসে সুহাসিনী যেন পাগলিনী হয়ে উঠলেন, একি, বুড়োর পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন? মহী, ও মহী! বল্ না কি হয়েছে?

মহীতোষ মার চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। বলল, তেমন কিছু না মা। বাবা নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল—

সুহাসিনী বললেন, নর্দমায় পড়ে গিয়েছিল? কোথায়?

রেখা ততক্ষণে পাশের বাড়ির দিকে ছুট লাগিয়েছে।

মহীতোষ বলল, বাজারের কাছে—

সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন তা নর্দমায় পড়ে গেলে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাধা কেন?

অতশত প্রশ্নের জবাব দেবার মত মানসিক ধৈর্য মহীতোষের ছিল না। সে বলল, কিছু হয়নি তেমন। তুমি ঘরে যাও তো। বাবার বিছানাটা পেতে দাও—

প্রতিবেশীরা এসে গেল। সকলে মিলে ধরাধরি করে ললিত-মোহনকে ঘরে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল।

মহীতোষ রেখাকে আড়ালে ডেকে বলল, তুই মাকে সামলাতো রেখা। এর মধ্যে আবার মা যদি অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে যাবে।

সুহাসিনীর ফিটের ব্যারাম আছে। উত্তেজিত হলেই অজ্ঞান হয়ে যান। আগে বেশি হতেন। এখন তেমন একটা নয়। ব্যামোটা সতের আঠারো বছরের পুরণো। রেখার সঙ্গে মহীতোষদের আরেকটি বোন হয়েছিল। লেখা। যমজ। সে সময়টাতে সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। মহীতোষ তখনো চাকরীতে ঢোকেনি। দুবেলা হাড়ি চড়ে না। রেখা-লেখার বয়স তখন আট নয় বছর। ললিতমোহন টাকার সন্ধানে বেরিয়েছেন। বেলা একটার কাছাকাছি। তিনি চাল নিয়ে ঘরে ফিরলে তবে সুহাসিনী কাঠকুটো জ্বালাবেন। কিছুদিন আগে লণ্ড্রীর ব্যবসা ফেল পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন ললিতমোহন। মহী-প্রিয় ঘরে নেই। অনু তখন দুধের বাচ্চা। ওকে পাতলা করে আটা জ্বাল দিয়ে তাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে সুহাসিনী গিয়েছিলেন পাশের বাড়িতে। একবাটি ভাতের খোঁজে। রেখা-লেখার জন্য। ফিরে এসে দেখেন ঘরে নেই ওরা। রেখাকে কিছুক্ষণ বাদে পাওয়া গেল। ও ছাঁচ তলায় বসে কাদামাটি দিয়ে পুতুল বানাচ্ছিল। সুহাসিনী রেখাকে লেখার খবর জিজ্ঞেস করায় ও বলতে পারল না। সুহাসিনী এদিক সেদিক খুঁজলেন খানিকক্ষণ। লেখাকে পেলেন না। ধার করে আনা ভাতের অর্ধেকটা রেখাকে খেতে দিলেন। একে একে সবাই বাড়ি ফিরল। ললিত-মোহন, মহী-প্রিয়। বেলা বেড়ে বিকেল হয়ে এল। কলোনী তোল-পাড় করে দুই দাদা খুঁজল। শেষে খোঁজ পাওয়া গেল লেখার। বাড়ির সামনের কচুরীপানায় ঢাকা বড়পুকুরটা থেকে ওর লাশ উদ্ধার করা হল সন্ধ্যার কিছু আগে। লেখার মৃত্যুর পর থেকেই ফিটের ব্যারামে ধরেছিল সুহাসিনীকে।

ললিতমোহন বিছানায় চোখ বুজে পড়ে রইলেন। তার কাৎরানি কমে আসছিল।

সুহাসিনীর ব্যাপারে মহীতোষ যতটা ভয় পেয়েছিল তেমন কিছু ঘটল না। প্রাথমিক আবেগটা মরে যেতে তিনি অনেকটা সংযত হলেন।

রেখা বসল শিয়রের কাছে। ললিতমোহন নিজের হাতটা বুকের কাছে টেনে নিলেন।

রৌদ্র ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল। টিনের চাল গন গনে হয়ে উঠছিল। মহীতোষ দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। ওধারে বাগান। গাছগাছালির ছায়া। যদি খানিকটা হাওয়া আসে এই ভেবে।

ভিড় পাতলা হয়ে এলে দরজার কাছ থেকে ললিতমোহনের সামনে এলেন সুহাসিনী। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন লাগছে?

ললিতমোহন চোখ মেললেন। বলতে চাইলেন, ভালই—

সুহাসিনী বললেন, খাবে কিছু? সেই সকালে চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছ। গরম দুধ এনে দেব একটু?

ললিতমোহন মাথা নাড়লেন, না।

ওর দু'চোখ যন্ত্রণা উপচে উঠছিল।

সুহাসিনী ছেলেকে শুধোলেন, একবার চট্ট ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসবি নাকি মহী?

মহীতোষ বলল, বাজারের এক ডাক্তার দেখেছে। তিনিই তো ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন।

সুহাসিনী ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন, কি বললেন তিনি? ভয়ের কিছু?

মহীতোষ বলল, বললেন তো তেমন কিছু নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বাড়িতে আসবেন। ইনজেকশন দিতে।

সুহাসিনীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বললেন হতাশ সুরে, ভয়ের কিছু না থাকলেই ভাল। আমার যা পোড়াকপাল--

মহীতোষ ইশারায় মাকে ডাকল। সুহাসিনী ললিতমোহনের কাছ থেকে উঠে এলেন।

বারান্দায় এসে খাটো গলায় বলল মহীতোষ, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে মা। ডাক্তারের ফি, ইনজেকশন আর ওষুধের দাম।

মহীতোষের কাছে তেমন কিছুই ছিল না। একটা টাকা আর কিছু

খুচরো পয়সা। আজকাল রিক্ত মহীতোষ। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেতে এখনো মাসখানেকের মত দেরী। তখন টাকার মুখ ফের দেখবে মহীতোষ।

সুহাসিনী বললেন, কত টাকা ?

মহীতোষ ভেবে বলল, গোটা কুড়ির মত।

রতনের মা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, টাকার জন্যে চিন্তা করো না মহী। আমি এনে দিচ্ছি—

রতনের মা চলে গেলে সুহাসিনী জিজ্ঞেস করলেন, দ্বিজপদ কিছু বলল মহী, চাকরীর ব্যাপারে ?

ফের ঘরের ভেতর ললিতমোহনের গোঙানী শুরু হয়ে গেল।

মহীতোষ বিরস মুখে বলল, না মা—

সে-কথায় সুহাসিনীর মুখ কালো হয়ে এল। মহীতোষ ফের ঘরের ভেতরে চলে গেল। সুহাসিনী বারান্দার থামে হেলান দিয়ে উদাস চোখে উঠোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রতনের মা টাকা নিয়ে ফিরে বারান্দায় উঠে বলল, একি জেঠিমা, আপনি কাঁদছেন ?

সুহাসিনী দাঁতে শাড়ির আঁচল চেপে একটা পলকা গাছের মত কাঁপছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল—ওর সারা শরীরে যেন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

রতনরাও কলোনীতে আছে অনেক কাল। সুহাসিনীকে রতনের মা খুব মান্য করে। সে এগিয়ে এসে বলল, এখন কি আপনার কাঁদার সময়। আপনি কাঁদলে জ্যাঠামশায়ের অকল্যাণ হবে যে !

সুহাসিনী এবার শব্দ করে কাঁদতে শুরু করলেন।

অসহ্য কষ্টের ভেতরেও ঘরের ভেতর থেকে কিভাবে যেন ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন ললিতমোহন। তিনি রেখাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে কে কাঁদছে রে রেখা ? তোর মা—

রেখা বাবাকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, কই, না তো বাবা—

সুহাসিনী শেষপর্যন্ত স্থির থাকতে পারলে না। রতনের মাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, আমার জন্যে বুড়োর এই দশা, বুঝলে বউ। আমিই ওকে জোর করে দ্বিজপদর কাছে পাঠিয়েছিলাম—

রতনের মা সুহাসিনীকে সান্ত্বনা দিতে চাইল, আপনার দোষ হবে কেন জেঠিমা। সবই অদৃষ্ট। নইলে রোজই তো উনি সকালের দিকে বাজারে যান। আজই হঠাৎ পড়ে গেলেন কেন!

ঘরের ভেতরে তখন বিরবির করে ললিতমোহন আওড়ে যাচ্ছিলেন, আমার ভুল। প্রথমেই বেঁকে বসলে হত। মতিচ্ছন্ন হয়েছিল আমার। নইলে কেন যাব দ্বিজপদ'র মত একটা অমানুষের কাছে। আমি ভেবেছিলাম—হয়ত মানুষটা শেষপর্যন্ত আমার অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। আমি আহাম্মক। আমি লোভী। আমি পাপী। লোভ করতে গিয়েছিলাম। তারই ফল পেলাম হাতে-নাতে। শাস্ত্রে বলে না, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমার দশাও তাই হতে চলেছে—

এরপর আর কথা বলতে পারেন নি ললিতমোহন। ফের গোঙাতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

ছয়

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে সুহাসিনী দেখলেন—প্রিয়তোষ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। দু'পা গোটানো। মাথা বালিশ থেকে বুকের দিকে নেমে এসেছে। জানালার ওধারে একটা পেয়ারা গাছ। গ্রীষ্মের দিন। দক্ষিণের বাতাসে ঝিনুক-কুচির মত গোলাপ-রঙের কয়েকটা পাপড়ি উড়ে এসে প্রিয়তোষের মাথার চুলে জড়িয়ে আছে।

সুহাসিনীর হাতে চায়ের কাপ। কাছে এসে ডাকলেন, প্রিয়, ও প্রিয়—

কাল পর্যন্ত নাইট ডিউটি ছিল। আজ রেষ্ট-ডে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর থেকেই ঘুমুচ্ছে প্রিয়তোষ।

সুহাসিনীর গলার আওয়াজে প্রিয়তোষ নড়েচড়ে উঠে ঘাই মেরে জানালার দিকে পাশ ফিরল। অনেকক্ষণ হল ঘুমুচ্ছে বলেই তার ঘুম হালকা হয়ে এসেছিল।

পরপর কদিন অসহ্য গুমোটের পর আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। দু'এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে। এখন সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

ফের ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন সুহাসিনী। বাইরে মেঘলা দিন। বেলা খানিকটা থাকলেও বিকেলের আলোটুকু আর দেখা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতরে আবছায়া। চাকরী নেবার পর থেকে প্রিয়তোষের ঘুম বেড়ে গেছে। গরম পড়লে ঘুমুতে পারে না। আয়েসী ধরনের ছেলে। মাথার ওপর টিনের চাল। পাঁচ ইঞ্চির ইটের দেয়াল। ফলে গ্রীষ্মের দাপট জোর। বেশি গরম পড়লে ঘুম ভাল হয় না। পাশের ঘর থেকে সুহাসিনী টের পান—রাতে অন্তত তিন চারবার প্রিয়তোষ দরজা খুলে বাইরে বেরোয়।

দেশভাগের পর ললিতমোহন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে এসে ঠাই

নিয়েছিলেন চেতলার দিকে। সবজি বাগানে। বস্তী এলাকায়। তারপর, এই উদ্বাস্তু উপনিবেশে চলে আসেন। জমি পোনে তিন কাঠা। কুয়ো পায়খানা রান্নাঘর বাদে বসবাসের মত ঘর তিনখানা। আগে আলাদা রান্নাঘর ছিল না। বারান্দাতেই রান্না হত। প্রথম দিকে বাড়ির চেহারা ছিল অন্যরকম। মাটির ভিত। দরমা মূলীবাঁশের ঘেরাটোপ। রঞ্জন হবার পর বাড়ি পাকা হয়েছিল। গেঞ্জীর কলের চাকরী ছাড়ার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদির টাকা কুড়িয়ে বাড়িয়ে বাড়ির বর্তমান চেহারাটা দাঁড় করিয়েছিল মহীতোষ। সেও আজ ন'দশ বছর আগের কথা।

তারপর, সরকার যখন এইসব জবর দখল জমির স্বত্ব-স্বামিত্ব মেনে নিল, কলোনীর প্রত্যেক প্লটের মালিককে অর্পণপত্র দিল,—তখন থেকেই ভেতরে-বাইরে কলোনীর ভোল পাল্টে গেল। টিন-টালী-বেড়ার ঘরগুলো একে একে পাকা বাড়ির চেহারা পেতে লাগল। রাতারাতি সব একতলা দোতলা সুদৃশ্য দালানকোঠা যেন মাটি ফুঁড়ে আকাশে মাথা তুলল। উপরন্তু, কলকাতা কর্পোরেশনের বদান্যতায় কলোনীর পাকদণ্ডী আর মেটে রাস্তায় খোওয়া পড়তে লাগল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েল বসতে লাগল। ওভারহেড বৈদ্যুতিক তার এসে কলোনীর নিশুতি দূর করল। একদা এই কলোনী অঞ্চল ছিল মুসলমানদের গোরস্থান। তারপর ঠ্যাঙাড়ে তাড়িখোড়দের আড্ডা।

শুধু বাইরের হাল হকিকতই পালটালো না, সেইসঙ্গে কলোনীর সামাজিক চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটল। আগে ছিল জমি রক্ষার প্রশ্ন। ফলে সকলে ছিল সমবেত। এক কাট্টা। গ্রাম-পঞ্চায়েতের মত কলোনীর জমির দখলদারদের ভোটে নির্বাচিত কমিটির ছিল প্রচণ্ড দাপট। জমির ব্যাপারে একটা পাকাপাকি নিরাপত্তার ব্যবস্থা যখন হল তখন আর কারুর দায় রইল না কলোনী-কমিটির নীতি-নিয়ম মেনে চলার। প্রত্যেকে হয়ে উঠল স্বাধীন। হল বিচ্ছিন্ন। এর ফলে

কলোনীর প্রাথমিক অবস্থায় যে সমাজ-চরিত্রটা ছিল সেটা পাল্টে গেল।

পরিবর্তন এবং উন্নতি হয়েছে অনেকেরই। কিন্তু ললিতমোহনের নয়। একষট্টি সালের পর এ বাড়ির আর কোন উন্নতি তো দূরস্থান—উল্লেখযোগ্য সংস্কার পর্যন্ত হয়নি। প্রিয়তোষ চাকরী পাওয়ায় সবে পরিবারটা একটু মাথা তুলছিল। হঠাৎ মহীতোষের চাকরী যাওয়ায় স্থিতাবস্থা অটুট রয়ে গেল।

সকালে একবার বেরিয়েছিল প্রিয়তোষ। বাড়ি ফিরে চা-টা খেয়ে. রিনার সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই। মাঝে একবার দেখা হয়েছিল। তা-ও সামান্য কিছুক্ষণের জন্য। ইচ্ছে করলে প্রিয়তোষ আগের থেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে পারত। দেখা-সাক্ষাৎটাকে আগের মত দীর্ঘতর করতে পারত। কিন্তু, প্রিয়-তোষই সে-ভাবে উদ্যোগী হয়নি। নিজের অপদার্থতা এবং সংকোচ তার উৎসাহে মন্দা এনেছে। রিনাকে একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রিয়তোষ। কিন্তু, প্রত্যেকবারই সে পেছিয়ে গেছে। একে দূরদৃষ্ট ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। প্রথমবার বাদ সাধল অনু। নিখোঁজ হয়ে গিয়ে। দ্বিতীয়বার মহীতোষ। ওর চাকরী গেল। গেরোর পর গেরো। যতই তেড়েফুঁড়ে প্রিয়তোষ জট খুলতে গেছে ততই নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নইলে এতদিনে সে রিনাকে বিয়ে করে নতুন বাড়িতে উঠে দিব্যি সংসার পাততে পারত।

আজ সকালে বেরিয়ে রিনাকে ফোন করেছিল প্রিয়তোষ। গড়িয়াহাটের দিকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সন্ধ্যার সময় ওকে হাজির থাকার অনুরোধ জানিয়ে। গত দুদিন ধরেই প্রিয়তোষ মনে মনে কাছে চাইছিল রিনাকে।

টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে রেকাবে ঢেকে জানালার দিকে তাকাতে সুহাসিনী দেখল মহীতোষ বাগানে। খালি গা। পরণে

লুঙ্গি। হাতে খুরপি। এই ক'মাসের ভেতরেই ওর শরীর ভেঙ্গে গেছে। বুকের হাড়পাঁজরাগুলো এখন গোনা যায়। ঘরের পেছনের সীমানায় শিয়াকুলের ছিটেবেড়া পর্যন্ত চৌকোণা জমিটুকু বহুকাল পরিত্যক্ত ছিল। চাকরী চলে যাবার পর জমিটুকুর সংস্কারে উঠে পড়ে লেগেছে মহীতোষ। পঁয়পরিস্কার করে একটা বাগান তৈরীর কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এদিক সেদিকে কয়েকটা ভালো জাতের আমগাছের কলম পুঁতেছে। মাঝখানে সবজি বাগান। একসার পেঁপে গাছ, ভুঁই কুমড়ো, ডাঁটা গাছের চারায় বাগানটা সবুজ হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

আগে এসব বাতিক ছিল না মহীতোষের। সময়ই ছিল না হাতে। এখন অগাধ সময়। হাতে কোন কাজ নেই। এই হতাশা মনের গভীরে হারিয়ে যেতে মহীতোষ সময় কাটানোর মত একটা অবলম্বন খুঁজতে চেয়েছে। তারই পরিণাম এই বাগান। সকালের টিউশনি আর সন্ধ্যার পর থেকে রাতটুকু বাদ দিলে বলতে গেলে সারাক্ষণই এই বাগান নিয়ে মেতে আছে ও। প্রকৃতির সংসারে জড়িয়ে পড়ে মহীতোষ দিন দিন গাছপালার মতই কেমন যেন নিরুত্তাপ এবং শান্ত হয়ে পড়ছে। ওর এই পরিবর্তনটা সুহাসিনীর চোখ এড়ায় নি।

সুহাসিনী ফিরে যাবার আগে আর একবার ডাকল, প্রিয়, তোর চা রেখে গেলাম—

ততক্ষণে প্রিয়তোষের ঘুম পুরোপুরি ভেঙে গেছে। ও আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরল। তারপর আলস্যজড়িত গলায় বলল, আচ্ছা।

প্রিয়তোষের মাথার কাছে কয়েকটা বই। গল্প-উপন্যাস জাতীয়। ছেলেটা একটা আস্ত পাগল। বাড়িতে যতক্ষণ আছে—ততক্ষণ এই ঘরে পড়ে আছে। সব সময় চোখের সামনে বই কিংবা পত্রপত্রিকা। গোগ্রাসে সেসব গিলছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময় ছাড়া ওর অস্তিত্ব বাড়ির কেউ টের পায় না। চুপচাপ থাকে। কিন্তু, তুচ্ছ কারণে রেগে গেলে আর কথা নেই। সেদিন যেন বাড়িতে আগুন লাগে। আসলে, সুহাসিনী খানিকটা আঁচ করতে পারেন, সংসারের দিকে তাকিয়ে মুখ

বুজে খেটে গেলেও,—মাঝে মাঝে প্রিয়তোষের ভেতরের মানুষটা বিদ্রোহ করে ওঠে।

প্রিয়তোষ উঠে বসে পর পর কয়েকটা হাই তুলল। হাতপা নেড়ে-চেড়ে শরীর থেকে আলস্য তাড়াল। তারপর টেবিল থেকে চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ঘুমে বসে-যাওয়া ভারি গলায় বলল, আশু কম্পাউণ্ডার এসেছিল মা?

আশু কম্পাউণ্ডার প্রতিদিন একবার করে আসে। ললিতমোহনের হাটুর ক্ষতস্থানে মস্ত এক ঘা হয়েছে। ঘা ওয়াশ করে ড্রেস করে দিয়ে যায়।

সুহাসিনী বললেন, হ্যাঁ। করে যাচ্ছে তো। কতদিন হয়ে গেল। এখনো ঘা-টা যে শুকুচ্ছে না কেন—

প্রিয়তোষ একটা সিগ্রেট ধরাল, ও সেরে যাবে মা। আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো। এখনওতো ইন্‌জেকশন শেষ হয়নি—। —গত দুসপ্তাহ ধরে পেনিসিলিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে ললিতমোহনকে। একনাগাড়ে প্রতিদিন।

সুহাসিনী কালোমুখে বললেন, ভাল হলেই ভাল। এই বয়সে বিছানায় পড়ে থাকলে—। প্রিয়তোষ ঠিক এটাই ভেবেছিল। সুহাসিনীর উত্তরটা এরকমের হবে। ললিতমোহনের চেয়েও মনের দিক থেকে সুহাসিনী অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন। সব সময় ওর মুখ থেকে আক্ষেপ আর হতাশার কথা ঝরে পড়ছে। অথচ আগে, সংসারে যখন এর চেয়েও দুর্দিন এসেছিল, সে মাকে এতটা ভেঙে পড়তে দেখেনি।

চায়ের কাপ শেষ করে প্রিয়তোষ কাপটা এগিয়ে দিতে সুহাসিনী বললেন, তোর কাছে ক'টা টাকা হবে প্রিয়?

প্রিয়তোষ মুখ ব্যাজার করে বলল, কত টাকা?

সুহাসিনী বললেন, যা পারিস। পাঁচ, দশ—

প্রিয়তোষ রুষ্ট গলায় বলল, আজ সকালেও তোমাকে পাঁচটা টাকা দিলাম না মা—

সুহাসিনী হাসতে চাইলেন, সে তোর বাবার ইনজেকশনের টাকা। এটা আমি চাইছি। ধার হিসেবে। সামনের মাসে শোধ করে দেব।

প্রিয়তোষ জ্বলে উঠল মুহূর্তে। এভাবে 'ফিরিয়ে দেব, শোধ করে দেব' কবুল করে এর আগে অনেকবার সুহাসিনী তার কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছেন। কিন্তু, কোনবার ফেরত দেয়নি। দেওয়া সম্ভবও নয়। সুহাসিনী টাকা কোথায় পাবেন।

প্রিয়তোষ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, না, টাকা-ফাকা আমার কাছে আর নেই।

বাইরে রঞ্জন চেঁচিয়ে ডাকল, ঠাকুমা, ও ঠাকুমা—

রঞ্জন স্কুল থেকে ফিরেছে। বিকেলের জলখাবার ও ঠাকুমা ছাড়া আর কারুর কাছে খেতে চায় না।

সুহাসিনী ফিরে যাচ্ছিলেন। প্রিয়তোষ পেছু ডাকল, টাকা দিয়ে কি করবে?

সুহাসিনী দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রসন্নতার আভা ফুটে উঠল তার মুখে। তিনি মা। তিনি জানেন—প্রিয়তোষ মুখে যতই রূঢ় হোক না কেন—ওর ভেতরটা মাটির মত নরম।

সুহাসিনী ভাববাচ্যে বললেন, এই, একটা দরকার পড়ে যাওয়ায়—

প্রিয়তোষের চোখেমুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। মা যতক্ষণ পারিবারিক এবং স্বাভাবিক ততক্ষণ তাকে চেনা মানুষ বলে মনে হয় না। যখন সুহাসিনী বিচলিত হয়ে ওঠেন তখনই তাকে কাছের মানুষ বলে মনে হয়।

প্রিয়তোষ সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, দরকাটা কি আগে বলো। তারপর দেব—

সুহাসিনী মিন মিন করে বললেন, কালীতলায় একজন সিদ্ধাই পুরুষ এসেছেন। শুনেছি দৈব তাবিজকবজ দেন। একবার ওর কাছে যাব—

দেবদ্বিজ-মাতুলি-জলপড়া-জড়িবুটিতে বরাবর সুহাসিনীর অগাধ বিশ্বাস।

প্রিয়তোষ সুহাসিনীকে বাজিয়ে নিতে চাইল, তাবিজকবজে কি হবে মা?

সুহাসিনী সহজ ভাবে বললেন, কেন, আমি ধারণ করব।

প্রিয়তোষ বলল, তাতে লাভটা কি?

সুহাসিনী জোর পেয়ে গেলেন, লাভ লোকসানের কথা জানিনা। অনু এতদিন হয়ে গেল ফিরল না। মহীর চাকরী নেই। বুড়ো বিছানায় পড়ে আছে। ধারণ করলে স্বস্তি পাব মনে।

এর ওপর আর কোন কথা চলে না। মার প্রতি সমবেদনায় প্রিয়তোষের বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। এই হালভাঙা সংসারে এখনো একটা মাত্র মানুষই জেগে স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে। তিনি আর কেউ নন। সুহাসিনী। বিয়ের পর থেকে কত জল-ঝড়-ঝাপ্টা, দুঃখ কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। তবু, তার স্বপ্ন দেখার বিরাম নেই। তিনি এই আশায় বুক বেঁধে আছেন—সুদিন নিশ্চয়ই আসবে। যে আশ্বাসের কথা একদিন তার সামনে অনুও উচ্চারণ করেছিল!

তাই সুহাসিনী রাত থাকতে ওঠেন। উঠোনময় গোবর ছড়া দেন। প্রতি শীতে ছাঁচতলায় এখনো পাড়ার কচিকাচাঁ মেয়েদের ডেকে এনে মাঘমণ্ডলের ব্রত কথার আসর জমান। সন্ধ্যা হয়ে এলে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠলে সেই সব তারাদের নাম করে আঁচলে গিঁট দেন। বিরবির করে ছড়া কাটেন। সন্তানদের মঙ্গল কামনায়।

প্রিয়তোষ আর ঘাঁটাল না। বলল, পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে যাও মা। বেশী নিয়ো না কিন্তু—

সুহাসিনী এগিয়ে টাকাটা নিলেন। খুশি মুখে বললেন, বাঁচালি প্রিয়—

এইরকম মুহূর্তে সুহাসিনী অন্যমানুষ। পরিপূর্ণ মা হয়ে উঠেছেন। রোগশোকতাপের সব গ্লানি তার মুখ থেকে মুছে গেল।

সুহাসিনী চলে যেতে আরেকটা সিগ্রেট ধরাল প্রিয়তোষ। কয়েকটা নিটোল ধোঁয়ার রিং আঁকল শূণ্যে। শিয়রের কাছের জানালা দিয়ে ফুর ফুর করে সজল হাওয়া আসছে ঘরে।

প্রিয়তোষ উঠে সুইচ অন করে আলো জ্বালাল। সুইচ বোর্ডের পাশে দেয়ালে-আঁটা কাঠের তাকে পর পর সাজানো রূপোর কাপ আর মেডেল অনেকগুলো। এ সবই খেলে পেয়েছে প্রিয়তোষ। ইনসাইড ফুটবলার হিসাবে তার সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। স্পীড—ড্রিবলিং-ডজিং-দম,—সবদিক থেকেই যথেষ্ট প্রমিজ ছিল তার। এখনো কেউ কেউ সে-সব কথা বলে। এই তো সেদিন, টালীগঞ্জের ব্রীজের কাছে বাস থেকে নেমে লেকের ভেতর দিয়ে হেঁটে আসছিল প্রিয়তোষ। বিকেলের দিকে। হঠাৎ কি খেয়াল হল—স্টেডিয়ামের গা ধরে উত্তরের মাঠে এসেছিল। যেখানে এক সময় সে রোজ বিকেলে প্র্যাকটিশ করত। ছেলের দল খেলছিল। তাকে দেখতে পেয়ে মাঠ থেকে ছুটে এসেছিল জটা ঘোষ। কোচ। আধপাগলা লোক। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ছেলে জোগাড় করে। প্রাণপাত করে তালিম দেয়। বিয়ে থা করেনি। ছেলেদের খেলোয়াড় করে তোলাই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ওর কোচিং পেয়ে দক্ষিণ কলকাতার অনেক ছেলেই ডিভিশনে চান্স পেয়েছে। প্রিয়তোষও ছিল ওর আবিস্কার।

জটা ঘোষ ছুটে এসে বলেছিল, প্রিয় যে! খবর কি?

একটা অপরাধবোধ তখন কাজ করছিল প্রিয়তোষের ভেতর। সে নিচু গলায় বলেছিল, ভাল। তুমি কেমন আছো জটাদা?

জটাদা বলেছিল, আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। তুই হঠাৎ খেলাটা ছেড়ে দিলি! এত ভাল পায়ের কাজ ছিল তোর—

আত্মরক্ষার চেষ্টায় একটা যুক্তি খাড়া করেছিল প্রিয়তোষ, কি করব বলো, কারখানার চাকরী। যা খাটুনি। তার ওপরে সংসারের চাপ।

জটাদা সে-কথা মানতে চায় নি। বলেছিল, ওসব বাজে অজুহাত। চাকরী করে কেউ কি খেলে না? আর অভাব, এদেশে কোন সংসারে নেই বলতে পারিস?

প্রিয়তোষ সে-কথার কোন উত্তর দিতে পারেনি।

জটাদা বলেছিল, আসলে তুই বুড়িয়ে গেছিস। যে স্পোর্টস-ম্যান হয় সে কি আর ছোটখাটো বাধা পেয়ে পেছিয়ে পড়ে? শেষ পর্যন্ত লড়ে যায়—

গুছিয়ে কথা বলতে জানেনা জটাদা। তবু, সেদিন ওর কথাগুলো প্রিয়তোষের বুকের ভেতরে আলোড়ন তুলেছিল।

জটাদা ফের বলেছিল, একবার মাঠে নামবি নাকি?

প্রিয়তোষ বলেছিল, আজ না জটাদা। আরেকদিন না হয়—

জটাদা বলেছিল, তাহলে বসে খেলা ছাখ। থাকিস কিন্তু শেষপর্যন্ত।

প্রিয়তোষ জটাদার অনুরোধ রাখেনি। কিছুক্ষণ মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেদের খেলা দেখেছিল। জটাদা ছুটছিল ওদের সঙ্গে। মুখে হুইসেল নিয়ে। আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ছেলেদের ট্যাকলিং পাশ রিসিভিং সম্বন্ধে ভুল ধরিয়ে দিচ্ছিল।

খেলা দেখতে দেখতে প্রিয়তোষের বুকের ভেতরটা থেকে থেকে মুচড়ে উঠছিল। জার্সি পরে বুট সক্‌স নিক্যাপ পায়ে গলিয়ে সে আর কোনদিন নামবে না মাঠে! জটাদার ব্যাখ্যায়—সে আর স্পোর্টস-ম্যান নেই। অথচ, কোনদিন সে একথা তার পরিচয় থেকে মুছে ফেলতে পারবেনা যে একদা সে ফুটবলার ছিল। যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল তার!

কাপ-মেডেলগুলোয় ধুলোর সর পড়েছে। আগে রেখা মাঝেমাঝে এগুলো পরিস্কার করত। তারপর সময় গড়িয়ে গেলে, সে খেলা ছেড়ে

দিলে—কেউ আর এগুলোর দিকে ফিরেও তাকায় না। একমাত্র সে নিজে ছাড়া।

এখনো মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে প্রিয়তোষ। বিরাট মাঠ। বল নিয়ে তীরের গতিতে সে ছুটছে। দুধারের গ্যালারী দর্শকে ভরে আছে। তারা তারস্বরে চেচাঁচ্ছে, এগোও, এগোও। —কিন্তু, প্রিয়তোষ কেবলই ছুটে যাচ্ছে বল নিয়ে, সামনে কোন গোলপোষ্ট দেখতে পাচ্ছেনা। শেষে একসময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মাটিতে।

সেদিন প্রিয়তোষ পালিয়ে এসেছিল প্র্যাকটিশ শেষ হবার আগেই। নতুন করে জটাদার মুখোমুখি হবার মত সাহস ছিলনা তার।

কুয়োতলায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে অভ্যাসমত একবার প্রিয়তোষ মাঝের ঘরে ঢুকল।

খাটে চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন ললিতমোহন। ডান পায়ের অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যাণ্ডেজ। শান্ত মলিন মুখ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

প্রিয়তোষ ললিতমোহনের কাছে গিয়ে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসল। তারপর বলল, কেমন আছো বাবা— ?

ললিতমোহনের চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে এল। তিনি বললেন, ভালই।

প্রিয়তোষ প্রশ্ন করল, ব্যথা-যন্ত্রণা এখন কেমন ?

ললিতমোহন বললেন, মনে তো হয় কমের দিকে—

সুহাসিনী রঞ্জনকে খাইয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, কম না ছাই। সারা দুপুর সে কি ছটফটানি—

ললিতমোহনের সহ্যশক্তি সুহাসিনীর চেয়ে কম নয়। সারাটা জীবনই যুদ্ধ করতে হয়েছে মানুষটাকে।

প্রিয়তোষ উঠে আসার আগে ললিতমোহন বলেছিলেন, আমার জন্যে একটা বই কিনে আনবি প্রিয়। তুই তো প্রতিদিনই বেরোস ?

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করেছিল, কি বই বাবা ?

ললিতমোহন বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছিলেন, অরবিন্দের 'পূর্ণযোগ'। শুয়ে শুয়ে আর সময় কাটতে চায় না—

আচ্ছা।—বলে প্রিয়তোষ বেরিয়ে এসেছিল।

চিরকালের উদাসীন ললিতমোহন। কিন্তু, ছেলেমেয়েদের ওপর টান-ভালবাসা যথেষ্ট। এমন কি, বোধ হয়, সুহাসিনীর চেয়েও কম নয়। সুহাসিনীর ভালবাসার অভিব্যক্তিটা প্রত্যক্ষ। আর ললিত-মোহন চাপা স্বভাবের বলে সেটা চট করে ধরা যায় না।

প্রিয়তোষের খেলাধুলো যে এগুলো না—এর জন্যে ললিতমোহনের কম আক্ষেপ নেই। আগে প্রায়ই বলতেন, ছেলেটা সংসার সংসার করে সব খোওয়াল। খেলোয়াড় হিসাবে ওর কত নামডাক ছিল!

ললিতমোহনের ভালবাসার প্রশ্রয় সবচেয়ে বেশি ছিল অনুর ওপর।

কলেজে ঢুকে যখন একটু একটু করে অনু বিগড়ে যাচ্ছিল, সারাদিন কাটাত বাইরে বাইরে, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক একবারে চুকিয়ে দিয়েছিল,—তখন মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে সুহাসিনীর জোর কথা কাটাকাটি হত।

সুহাসিনী এক একদিন ভীষণ রেগে যেতেন। বলতেন, পড়াশুনো কি একেবারে ছেড়েই দিলি অনু?

অনু বলত, পড়তে আমার ভাল লাগেনা মা।

সুহাসিনী বলতেন, তাহলে কি করে পেটের ভাত জোগাড় করবি? ভদ্রঘরের ছেলে—

অনু হাসত, পড়াশুনো করলেই কি পেটের ভাত জুটবে মা?

সুহাসিনী বলতেন, কেন জুটবে না। আর দশজন বেঁচে আছে না!

অনু বলত, তুমি থাকো ঘরে। সব খবর রাখো না। জানো, ঘরে ঘরে কত ছেলে পাশ করে বসে আছে?

সুহাসিনী আরো ক্ষেপে যেতেন, তাতে তোর কি। তোর পড়াশুনোটা করতে বাধা কোথায়? বসে যেমন আছে তেমনি কেউ কেউ তো কাজও পাচ্ছে—

অনু রাগ জল-করা হাসি হাসত, আমি তো সেই 'কেউ কেউ'র দলে নাও পড়ে যেতে পারি মা—

সুহাসিনী ফুঁসে উঠতেন, দাদাদের অন্ন ধ্বংস করে এসব বড় বড় কথা বলা তোর সাজে না অনু। —বলতে বলতে কেন জানি ক্রোধটা নিভে আসত সুহাসিনীর।

তখন সুহাসিনীর কথার মাঝখানে এসে পড়তেন ললিতমোহন। বলতেন, আঃ, থামবে তুমি! কি শুরু করেছ।

তিক্ততার পর্ব ওইখানেই শেষ। অনুতোষ হেঁটমুখে চলে যেতে ললিতমোহন সুহাসিনীকে বোঝাতেন, ছেলে বড় হয়ে উঠেছে। এখন কি ওকে এভাবে আঘাত দিয়ে কথা বলতে হয় সুহাস!

সুহাসিনীর রাগ পড়ে গেলেও কথার ঝাঁঝ কমত না। বলতেন, বড় হয়েছে বলে কি করব। ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করব!

ললিতমোহন বলতেন, আহা, বয়সকালে এরকম একটু আধটু হবেই। দেখবে সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অনু আর যা-ই করুক, খারাপ কিছু করবে না। এ বিশ্বাস নিশ্চয়ই তোমার আছে—

সুহাসিনী গোমড়ামুখে বলতেন, ভাল-খারাপ বুঝি না। লেখাপড়া না করলে ওর ভবিষ্যৎটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—

এর উত্তরে ললিতমোহন স্মিত হেসে বলতেন, সবই কালের গতি আর বয়োধর্ম সুহাস। আমাদের সময়েও ছিল। তোমার তো অজানা নয়,—আমিওতো একদিন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

সুহাসিনী বলতেন, সেটা কোনো গুণের কাজ করো নি। সেই পাগলামি করে সারাটা জীবন নিজেকে দগ্ধালে। আর আমাদেরও কষ্ট দিলে—

ওদের কথাবার্তা শুনে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মহীতোষ

মার পক্ষ নিত। বলত, তোমাদের সময়ে একটা আদর্শ ছিল, লক্ষ্য ছিল বাবা। তোমরা শুধু ভাঙতেই চাওনি—

একটু থেমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে মহীতোষের কথার উত্তর দিতেন ললিতমোহন, বিষয়টাকে আগাগোড়া তলিয়ে দেখলে সবটা ধরতে পারবি মহী। সত্যি কথা—আমাদের স্বপ্ন ছিল, সামনে একটা আদর্শ ছিল। সেই আদর্শ আর স্বপ্নের জন্যে আমরা জীবন-পণ করেছিলাম। কিন্তু অনুরা! ওদের সামনে কি আছে। অভাব-দারিদ্র্য-ক্ষুধা-অনটন,—এছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে? দেশজুড়ে কোথাও কি আছে আলো, আদর্শ? যেদিকে তাকাও শুধু ভণ্ডামি আর ছল-জোয়াচুরি। 'দেশপ্রেম' শব্দটা এখন কতগুলো অর্থহীন অক্ষরের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ধকারে এগোচ্ছে ওরা। তাই লক্ষ্যটা স্থির করে উঠতে পারছে না। কিন্তু, ওদের বিদ্রোহটা তো কারণহীন নয়।

সুহাসিনী প্রসঙ্গের ছেদ টানতেন এভাবে, এসব তো তুমি বলবেই। তুমি নিজে নষ্ট হয়েছ। এবার ছেলেটাকেও নষ্ট করতে চাইছ। আমি বুঝি না, তোমার আসকারা পেয়েই তো অনু এত উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে—

গড়িয়াহাটের মোড়ে আসতে প্রবীর পাকড়াও করল। সঙ্গে ছিল সুবোধ। গীটার হাতে।

বাস থেকে নেমে প্রিয়তোষ তড়িঘড়ি এগোচ্ছিল। প্রিয়তোষ সময় দিয়েছিল রিনাকে ছটা। দাঁড়াবে বাসন্তী দেবী কলেজের কাছে।

প্রবীর বলল, এই যে চাঁদ। হঠাৎ এসময়ে কোথায় যাচ্ছিস।

বড়লোকের আদরের দুলাল প্রবীর। থাকে বালীগঞ্জ প্লেসে। প্রিয়তোষের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সুবোধ। সুবোধ ওদের পাড়ায় অনেককাল ধরে টিউশনি করে। বেশ রগুড়ে ছেলে।

টাকা পয়সার চিন্তা নেই। ধর্মের ষাড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকে গড়িয়াহাটের মোড়ে এলে ওকে দেখা যাবেই। টিপটপ থাকে সবসময়। হাতে দামী সিগারেট। চেহারাটাও রমনীরঞ্জন। তবে দিলখোলা। প্রাণবন্ত ছেলে। কবে একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সুবোধ। তারপর থেকে দেখা হলেই যেচে কথা বলে। চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায়। সিগারেট খাওয়ায়।—প্রিয়তোষকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বলল, এই একটু ট্র্যাংগুলার পার্কের দিকে যাচ্ছি। জরুরী কাজে—। দুহাতের তালু দিয়ে চুলের কেয়ারী ঠিক করে নিয়ে প্রবীর বলল, কেবল কাজ আর কাজ। তোরা লাইফটাকে এনজয় করতে শিখলি না প্রিয়—

বাটার দোকানের সামনে একটি মেয়ে উগ্র সাজপোশাক পরে দাঁড়িয়ে ছিল। আড়চোখে তাকাচ্ছিল প্রবীরের দিকে।

সুবোধ সেটা লক্ষ্য করে বলল, কে রে মেয়েটা? বারবার তোর দিকে তাকাচ্ছে—

প্রবীর বলল, নতুন চিড়িয়া। থাকে কাঁকুলিয়ার দিকে। একবার সফরি-তে আলাপ হয়েছিল। সেই থেকে পেছু নিয়েছে—

সুবোধ অবাক গলায় বলল, তা তুই ছেড়ে দিচ্ছিস এই সুযোগ! ব্রহ্মচারী হয়ে গেলি নাকি?—মেয়েটা প্রবীরের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। প্রবীর খাটো গলায় বলল, ছাড়্‌ কিরে। তবে, এখন ওর সঙ্গে জমে গেলে, মাইরি, বিপদ আছে—

প্রিয়তোষও একবার আড়চোখে দেখে নিল মেয়েটিকে। বেশ ঠাট ঠমক আছে চেহারায়। সে বলল, বিপদটা কি?—প্রবীর বলল, এখন এ পথ দিয়ে যে মনাষা যাবে। ওকে পাকড়াবো বলে সেই বিকেল থেকে স্নো পাউডার মেখে দাঁড়িয়ে আছি—

মাঝখানে লোকজনের নিয়ত চলাচল। তাই মেয়েটি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না।

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, মনীষা আবার কে?

প্রবীর নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, মেয়েটাকে একবার দেখলে বুঝতে পারতিস। ডানাকাটা পরী। শরীরের কাটিং একেবারে হেমা মালিনীর মত। আর মুখখানা। শ্লা, ভাষাটাষা আমার আবার ভাল আসে না। সে যে কি বলব—

প্রিয়তোষের হাসি পেয়ে গেল, মেয়েটা কোথায় থাকে ?

প্রবীর বলল, ডোভার লেনে। আমার এক বন্ধুর বাড়ির পাশের বাড়িতে। এখন পড়ছে। প্রেসিডেন্সীতে। ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে। একদিন আলাপ হয়েছিল। সিংহীপার্কের মিউজিকাল কনফারেন্সে। রোজ এসময় এপথ দিয়ে যায়। গোল পার্কের দিকে গান শিখতে—

সুবোধ প্রসঙ্গটাকে উসকে দেবার জন্য বলল, তা এতদিনেও গাঁথতে পারিস নি—

প্রবীর বলল, নারে। মেয়েটার বড্ড অহংকার। কথাই বলতে চায় না। আমিও তেমনি। চুনোপুটি হলে কখন ডাঙায় তুলে নিতাম। শ্লা, মনীষা একেবারে কালীবোয়েস। অনেক খেলিয়ে তবে—বলতে বলতে থেমে গেল প্রবীর।

মেয়েটা এবার হাত নেড়ে ডাকল। প্রবীর বলল, একটু দাঁড়া তোরা। মেয়েটাকে ভাগিয়ে আসছি—

কি কথা হল তুজনে। প্রবীর একটু বাদেই ফিরে এল। মেয়েটাও চলে গেল গোলপার্কের দিকে। সুবোধ জিজ্ঞেস করল, কি বলে মেয়েটাকে হটালি ?

প্রবীর ওদের সিগারেট দিয়ে বলল, কি আবার। কাল তুপুরে একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করলাম। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে। মেয়েটার বড্ড ছোকছোকানি—

প্রিয়তোষ আহত হল প্রবীরের কথায়। বলল, এসব কি ভাল করছিস প্রবীর ! একদিন কিন্তু পস্তাতে হবে তোকে—

প্রবীর হাত নেঁড়ে বলল, রাখ্ তোর সতীপনার প্যানপ্যানানি। প্রেম-টেম বলে কি কিছু আছে। সব ব্যাপারটাই শারীরিক। তাই

মেয়েদের আমি অ্যালবামের ষ্ট্যাম্পের চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করি না—

সুবোধ বলল তার মানে !

প্রবীর আধ জ্বলন্ত সিগারেটটা ফাঁকায় ছুড়ে দিয়ে বলল, ছেলেবেলায় যেমন অ্যালবামে নানান দেশের ষ্ট্যাম্প সেঁটে রাখতাম —মেয়েছেলেদেরও আমি তেমনি ব্যবহার করি—

প্রিয়তোষ চঞ্চল হয়ে উঠল, চলি এবার। বড্ড দেরী হয়ে গেল—

প্রবীর তার একটা হাত ধরে টেনে বলল, কোথায় যাবি। গুলি মার্ জরুরী কাজে। তার চেয়ে দাঁড়া এখানে। মনীষার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তারপর চল্। যাবি আমাদের বাড়ি ? ভাল হুইস্কি আছে। ইম্পোর্টেড মাল। ফরাসী জিনিস। নেপোলিয়ান—

প্রিয়তোষ এক রকম কাকুতিমিনতি করে প্রবীরের হাত থেকে ছাড়া গেল।

রিনা যথাস্থানে দাঁড়িয়েছিল।

প্রিয়তোষ কাছে এসে বলল, কতক্ষণ এসেছ ?

রিনা উল্টো প্রশ্ন করল, এখন কটা বাজে ?

প্রিয়তোষ তখনো বুঝতে পারে নি। মণিবন্ধে চোখ রেখে বলল, ঠিক ছ'টা পঁয়ত্রিশ—

রিনা জেরার ভঙ্গীতে বলল, কখন আসার কথা ছিল তোমার—

প্রিয়তোষ মুহূর্তে নরম হয়ে গেল, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। কি করব, বিশ্বাস করো রিনা, ঠিক সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। গড়িয়াহাটের মোড়ে এক বন্ধু আটকে দিল—

রিনা ট্রামলাইনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কর্পোরেশন ইলেকসনে দাঁড়ানো উচিত। নির্ঘাৎ কাউন্সিলার হয়ে যাবে—

প্রিয়তোষ বলল, অন্যায় হয়ে গেছে রিনা। আর কখনো এমনটা হবে না। কথা দিচ্ছি—

রিনা বলল, এইজন্যেই তো বলছি কাউন্সিলার সীপের জন্যে দাঁড়াও তুমি। প্রেম-টেম এসব তুচ্ছ ব্যাপার তোমার জন্যে নয়। পলিটিক্সে নামলে উন্নতি করবে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর সেটা রক্ষা না করা এটাই তো পলিটিশিয়ানদের বড় কোয়ালিফিকেশন—

প্রিয়তোষ বুঝল রিনা বেজায় খেপে গেছে। সুতরাং, একটা নাটকীয় কাণ্ড ঘটাতে না পারলে ওকে শান্ত করা যাবে না। এই ভেবে আরো ঘনিষ্ট হয়ে ঝট করে রিনার একটা হাত টেনে নিয়ে বলল, দোহাই রিনা। আর ঝগড়া করোনা। ঘাট মানছি। এখন চলো কোথাও। নিরিবিলিতে। লেকের দিকে যাবে?

রিনা বলল, লেকের দিকে? অসম্ভব। ভুট্টার দল দেখে ফেললে—

প্রিয়তোষ সে-কথায় উষ্ণ হয়ে উঠল, তোমার কেবল ভুট্টা আর ভুট্টা। ভুট্টাকে এত ভয় পাবার কি আছে! আমরা তো কোন অন্যায় করছি না।

রিনা বলল, ভুট্টাকে ভয় পাব কেন। তবে, কাউকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়—

প্রিয়তোষ রিনার কথার গূঢ়ার্থ ধরতে না পেরে বলল, তার মানে? ভুট্টার বলা না বলাকে তুমি খুব গুরুত্ব দেও বলে মনে হচ্ছে—

রিনা বলল, আলবৎ। ভুট্টা আমাদের প্রতিবেশী। তাছাড়া—

প্রিয়তোষ প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, তাছাড়া—

রিনা বিকারহীন বলল, তাছাড়া ভুট্টা আমাকে ভাল চোখে দেখে। যথেষ্ট প্রেস্‌টিজ দেয়। ও কিছু একটা বললে সেটা শুনতে আমার ভাল লাগবে না—

প্রিয়তোষ আর কথা বাড়াল না। এইটুকু বুঝতে পারল— রিনার মধ্যে একটা নতুন ধরনের ব্যক্তিত্ব হঠাৎ প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে মর্যাদা দেবার ব্যাপারে ও খুবই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে।

প্রিয়তোষ বলল, তাহলে কোথায় যাবে বলো? ময়দানের দিকে?

রিনা বলল, তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল! গেরস্থ ঘরের মেয়ে আমি। আছি মামাদের করুণায়। বেশী রাত করে ফিরলে—

প্রিয়তোষ কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না। বলল, তাহলে কোথায় যাবে বলো—

রিনা একটু ভাবল। তারপর বলল, চলো, দেশপ্রিয় পার্কে গিয়ে বসি খানিকক্ষণ—

প্রস্তাবটা খারাপ লাগল না প্রিয়তোষের কাছে। আকাশের গতিক ভাল নয়। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বেশিদূরে গেলে—হঠাৎ যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে।

প্রিয়তোষ একটা ট্যাক্সি ডাকল।

রিনা একবার বলেছিল, এইটুকু তো পথ। ট্যাক্সি ডাকবার কি ছিল—

প্রিয়তোষের আর ধৈর্য ছিল না। ট্যাক্সির পাল্লা খুলে বলল আদেশের ভঙ্গীতে, উঠে এসো বলছি—

—উফ্। কতদিন বাদে একসঙ্গে বেড়ানো—

—এই হচ্ছে কি! তুমি ভারি অসভ্য—

—রিনা, রিনা—

—আহ্, সামনে সর্দারজী বসে আছে না!

—সর্দারজী ভাল মানুষ। কিছু বলবে না।

—এই কি করছ?

—কলকাতা কি নিষ্ঠুর শহর। কোথাও নিরিবিলি বসার মত জায়গা নেই। কোথাও তোমাকে নিয়ে গিয়ে যে মনের মত করে ভালবাসব—। সর্দারজী মনোহরপুকুর দিয়ে ট্যাক্সি ঘোরান। গাঁজা-পার্কে যাব—

—এই না বললে দেশপ্রিয় পার্কে যাবে—

—না, ওখানেও বড্ড ভিড়। গাঁজা পার্কে তেমন লোকজন থাকে না—

—সেটা কোথায়, অনেক দূরে নাকি ?

—না, জগুবাবুর বাজারের ঠিক পরেই—। কতদিন তোমাকে এমন করে কাছে পাইনি রিনা—

—আঃ—

—রিনা—, তোমাকে ইচ্ছে করে—

—কি আজেবাজে বকছ—

—আজেবাজে আবার কি। তোমার কাছে এসে গীতার শ্লোক আওড়াবো নাকি !

—আজ দেখছি খুব মুডে আছো ?

—তোমায় দারুণ দেখাচ্ছে রিনা। ইচ্ছে করে—

—কি ইচ্ছে করে ? দুষ্টু, পাজী কোথাকার—

—একি, তুমি আমায় চড় মারলে ! আমি না তোমার গুরুজন—

—গুরুজন না হাতি। একশ' বার মারব।

—সর্দারজী, পার্কের কাছে থামিয়ে দিন।

—এসো রিনা। কত হলো। তিন টাকা পঁচিশ··—

—একি, পাঁচটাকার নোট দিয়ে খুচরোটা নিলে না ?

—সর্দারজী এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ফুর্তি করতে দিল—

—দাতা কর্ণ ! তা আমাকে কিছু দান-খয়রাত করো না।

—তোমাকে ! আমার সর্বস্বই তো তোমার !

—আহা-হা ! ন্যাকামো হচ্ছে—

তোমার দাদার চাকরীর কি হল ?

—হবে আবার কি। অষ্টরম্ভা। যা কুনো স্বভাবের, কোন উদ্যমই নেই। দাদা একটা আস্ত গাড়ল—

—একটা ব্যবসা-ট্যবসায়ও তো লেগে যেতে পারে।

—ব্যবসা করবে! তবেই হয়েছে। সংসারের কথা ছাড়ো রিনা। বাড়ির কথা মনে পড়লে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—

—আবার নতুন কি হলো?

—হয়েছে আমার কপাল। তোমার ভাগ্যও জড়িয়ে যাচ্ছে আমার সঙ্গে। দিন পনেরো আগে খানায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বাবা ঘরে পড়ে আছে—

—বলো কি, এই বুড়ো বয়সে?

—ওষুধে, ডাক্তারে জলের মত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

—এদিকে বড়মামা খুব হম্বীতম্বী করছেন। বড়মামী উঠতে বসতে খোটা দিচ্ছেন। ভাবছি বাবার কাছেই চলে যাব—

—তার মানে! মধ্যপ্রদেশে?

—কি করব, বড় হয়েছি। সব সময় কথা শুনতে ভাল লাগে?

—এই বাদাম। দাও তো পনেরো পয়সার করে।

—বসে থাকতে ভাল লাগছে না। চলো হাঁটি প্রিয়—

—আমি তো তোমার ছোটমামীকে বলেছি। আর কিছুদিন সময় চাই। বাড়ির অবস্থা একটু স্বাভাবিক হয়ে এলে—

—তুমি বড় স্বার্থপর প্রিয়। দেখা হলেই বাড়ির দোহাই দেও। আমার দিকটা কখনো ভেবে দেখছ না—

—তুমি এই কথা বলছ রিনা!

—কি করবো বলো। তুমি যখন আমার ব্যাপারে চোখ বুজে আছো তখন না বলে উপায় কি?

—চমৎকার! আর আমি বুঝি খুব সুখে আছি? বাবা বিছানায় পড়ে আছে। অন্তুর খবর নেই। দাদার কোন হিল্লে হল না—

—এই জন্যেই আমি কিছু বলতে চাই না প্রিয়। তুমি কেবল

একতরফা গাওনা গেয়ে যাও। তোমার বাবার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। দিনকে দিন তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাতো বাড়বেই। আর দাদা। কেন, তোমার বউদি তো চাকরী করছে। একবারে জলে পড়েননি তো ভদ্রলোক—

—বেশ ঠিক আছে। ভাববো না ওদের কথা। তুমি যখন আমার ব্যাপারে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছো, এসো সামনের সপ্তাহে রেজিষ্ট্রিটা করে ফেলি—

—বেশ বললে! এতে কি কোন সমস্যার সমাধান হবে। রেজিষ্ট্রি করলেও তো তুমি আমাকে ঘরে তুলে নিচ্ছ না। আমাকে সেই মামাদের সংসারেই পড়ে থাকতে হচ্ছে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার ওপর রাগ ওদের আরো বেড়ে যাবে।

—তাহলে অমলকে সব কিছু জানিয়ে একটা চিঠি দেব নাকি। তুমি কি বলো?

—এই বুদ্ধি তোমার। অমলদা তোমার বন্ধু হতে পারে, কিন্তু আমার দাদা। তোমার চেয়ে আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকটা সে বেশি করে ভাববে। অর্থাৎ, সে এসে আরো চাপ সৃষ্টি করবে তোমার ওপর।

—তাহলে উপায়?

—চমৎকার! তুমি না পুরুষ মানুষ! আমি তোমাকে উপায় বাৎলে দেব?

হাওয়া দিচ্ছিল বেশ। আকাশ মরচে-ধরা লোহা রঙের মেঘে ছেয়ে আছে। হাওয়ায় একটা আরামদায়ক শীতলতা ছিল। মাঝে মাঝে মেঘের তর্জন-গর্জন শোনা যাচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। রিনাকে যতদিন ধরে দেখে আসছে প্রিয়তোষ—ওর চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু আগাগোড়া রয়েই গেছে। অত্যন্ত অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ। কোনকিছুকেই খুব শান্তভাবে নিতে চায় না। বিয়ের ব্যাপারটাও তাই। যেমন ছিল প্রেম-নিবেদনের ব্যাপারে। একদিন সরাসরি প্রিয়তোষকে

বলেছিল আচমকা, তোমাকে ছাড়া আমি পুরুষ হিসাবে আমার জীবনে আর কাউকে ভাবতেই পারি না প্রিয়দা। তোমাকে আমার চাই-ই। —বিয়ের ব্যাপারে ও আগে বলত, সকলকে দারুণ ভাবে চমকে দিয়ে আমরা বাড়ি ছাড়ব। কাউকে জানতে দেব না। আমাদের বিয়েটা যে একটা রীতিমত উত্তেজনাকর ব্যাপার—এটা সকলকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিতে হবে।

পার্কের অন্ধকার ও নির্জনতা আর ভাল লাগছিল না প্রিয়তোষের। রিনা যে তার স্বপ্নলোকের নায়িকা নয়—একেবারেই বাস্তবের প্রেমিকা,—এই বোধটা তার সারাদিন ধরে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গড়ে তোলা মনটাকে চুপসে দিয়েছিল।

প্রিয়তোষ বলল, এখানে আর ভাল লাগছে না রিনা। চলো, ওধারে কোন রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বসি।

রিনা বলল, কটা বাজে?

প্রিয়তোষ ল্যাম্প-পোষ্টের দিকে এগিয়ে গেল, আটটা দশ—

রিনা চঞ্চল হয়ে উঠল, ওরে বাব্বা! আর রেষ্টুরেণ্ট নয়, বাড়ি ফিরব—

প্রিয়তোষ কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার মনে হল: রিনা ক্রমশ তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আগে হলে প্রিয়তোষ জোর খাটাত। আজ কেন জানি পারল না। বলল দীর্ঘনিশ্বাসের স্বরে, তুমি কেমন পাল্টে গেছ রিনা—

ওরা পার্কের গেটের দিকে এগিয়ে আসছিল।

রিনা বলল, শুধু কি আমি, তুমি নও? তুমি আমার চেয়েও পাল্টে গেছ। নিজেকে নিজে কি কেউ দেখতে পায়।

প্রিয়তোষ বলল, এতবড় কথাটা বললে! আমি কি কেবল আমার কথাই ভাবছি—

রিনা বলল, ভাবলেই বা ক্ষতি কি! সেটাই স্বাভাবিক। ছেলেবেলায় ঈশপের একটা গল্পে পড়েছিলাম—ভগবান মানুষকে দুটো থলি

দিয়েছিলেন। একটা থলিতে আছে নিজের দোষগুলি, আরেকটায় অপরের। বলেছিলেন, সব সময় অপরের দোষের থলিটা পেছনে রাখবে। আর নিজেরটা সামনে। মানুষ করেছিল তার উল্টো। তাই নিজের দোষ কেউ দেখতে পায় না।

ফিরতি পথেও ট্যাক্সি নিয়েছিল প্রিয়তোষ।

প্রায় সারাটা পথ দুজনে চুপচাপ ছিল।

যেটুকু বলেছিল রিনা—কি, রাগ করলে নাকি?

প্রিয়তোষ বলেছিল, না, রাগ করব কেন! তুমি যা বলেছ তা তো আর অন্যায় কিছু নয়।

রিনা কাছে এসে প্রিয়তোষের একটা হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিল, কিছু মনে করো না। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সব দিন কি আর মেজাজ একরকম থাকে?

প্রিয়তোষ বলেছিল, না-না, মনে করব কেন—

ঢাকুরিয়া ব্রীজের নিচে ট্যাক্সি থামলে রিনা নেমে জানালার কাছে এসে বলেছিল, আবার কবে আসছ?

প্রিয়তোষ বলেছিল, ঠিক বলতে পারছি না।

সে-কথায় রিনা শরীর কাঁপিয়ে হেসেছিল, বুঝলাম। এখনো রাগ পড়েনি তোমার। আচ্ছা লোক, তুমি আমার কথাগুলো সব দেখছি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছ—

প্রিয়তোষ বলেছিল, তা নয়। এরপর আর একবারই আসব। আগে বাড়ি ঠিক করব। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে জানিয়ে রাখব। সাক্ষী জোগাড় করে তবেই আসব। তোমাকে নিয়ে সোজা নতুন বাড়িতে উঠব রেজিষ্ট্রির পর। তার আগে আর আসছি না।

থানার সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল প্রিয়তোষ। তাড়াটা ছিল নিজের দিক থেকেই। ললিতমোহন বিছানা নেবার

পর এদিকে আর আসা হয়নি। তাই ভাবল—একবার নেমে যাই। যদি কোন খবর থাকে। সুহাসিনীর দিক থেকে অবশ্য কোন চাপ ছিল না। সুহাসিনী ইদানীং ললিতমোহনকে নিয়েই পড়ে আছেন। প্রিয়তোষকে উদ্ব্যস্ত করার মত অবকাশ পান নি তিনি।

প্রিয়তোষ থানায় এল। সে জানে—নতুন খবর কিছুই নেই। তবু সুহাসিনীর মত তারও অনুর ব্যাপারে দুশ্চিন্তিত হয়ে ওঠা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সেই ছোকরা পুলিশ অফিসারটি থানা অফিসেই ছিল।

প্রিয়তোষকে দেখে বলল, বসুন মিষ্টার রায়। তারপর কি খবর। অনেকদিন বাদে এলেন—

থানার পরিবেশ এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত। আগের মত লোক-জনের ভিড় ব্যস্ততা নেই।

প্রিয়তোষ বলল, বাবা কিছুদিন হল পা ভেঙে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন—

অফিসারটি একটা হাই তুলল, উফ; সেই দুপুর থেকে যা খাটুনি যাচ্ছে—

প্রিয়তোষ বিরক্তগলায় বলল, কোন ইনফরমেশন আছে ?

অফিসারটি বলল, না। তবে কয়েকটা নতুন ফটো এসেছে। এখনো দেখে উঠতে পারিনি। দেখবেন নাকি একবার—

প্রিয়তোষ বলল, এলামই যখন দেখে যাই—

অফিসারটি উঠে আলমারী থেকে ফটোর এ্যালবামটা বের করে প্রিয়তোষের হাতে দিল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রিয়তোষ এ্যালবামটা হাতে নিল। শেষের দিকের পাতা ওল্টাতে লাগল। প্রথম দিকের গুলো বহুবার দেখা হয়ে গেছে।

একটা জায়গায় এসে চোখ আটকে গেল প্রিয়তোষের।

একেবারে শেষের পাতার আগের পাতা। পাতায় ফটো ছুটো। ডানদিকের ফটোটা সে দেখছিল।

প্রিয়তোষ নিশিতে পাওয়া মানুষের মত জিজ্ঞেস করল, এই ফটো ছুটো কি নতুন লাগানো হয়েছে?

পুলিশ অফিসার সেদিকে একবার চোখ রাখল। তারপর বলল, হ্যাঁ নতুন এসেছে। কেন, চেনা মনে হচ্ছে নাকি আপনার—

শেষের কথাগুলো আর কানে গেল না প্রিয়তোষের। তার ছুই চোখ ফটোটার দিকে স্থির হয়ে আছে। মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তার কাটাকুটি চলছিল। আর বুকের ভেতরে একটা আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছিল যেন।

হ্যাঁ, এই তো অনুর ছবি। ছুচোখ বোজা। মৃত্যুর পরে তোলা হলেও চিনতে কষ্ট হচ্ছে না। গালের বাঁদিকে জুলপির নিচে একটা কাটা দাগ। খুব ছেলে বেলায় বারান্দা থেকে উঠোনে পড়ে গিয়েছিল অনু। উঠোনে জড়ো করা ছিল কিছু আধভাঙা ইট। কুয়োতলা বাঁধাবার পর ওগুলো উদ্বৃত্ত ছিল। ইটের ওপর পড়ে গিয়ে সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। গালের বাঁদিকের অনেকটা গভীর হয়ে কেটে গিয়েছিল অনুর। যথাসময়ে ক্ষত শুকিয়ে গেলেও ছুর্ঘটনার চিহ্নটা থেকে গিয়েছিল পাকাপাকিভাবে।

শুধু গালের কাটা দাগ নয়—সব কিছুই মিলে যাচ্ছিল ধাপে ধাপে। সিড়ি ভাঙা সরল অঙ্কের মত প্রিয়তোষের অনুমান ক্রমশ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছে যাচ্ছিল।

কোঁকড়া একমাথা চুল জোড়া ভ্রু চওড়া কপাল টিকোলো নাক নিচের ঠোঁট পাতলা ছড়ানো চিবুক—অনু তার ভাই, ললিতমোহন রায়ের ছেলে, শ্রীঅনুতোষ রায়, বয়স উনিশ, ফেরার আজ প্রায় এক-বছর হতে চলল—

প্রিয়তোষের চিনতে ভুল হবার কোন কারণ নেই।

পুলিশ অফিসার একটা কেস-ফাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল।

সে একসময় বলল, কি ব্যাপার মিষ্টার রায়। খুঁজে পেলেন নাকি?

প্রিয়তোষের সারা শরীরের ভেতরকার অসংখ্য ঝাঝরি দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে রক্তস্রোত বইছিল। চোখ আর্দ্র হয়ে উঠছিল। কানের কাছে কেউ যেন জোরে হুইসেল বাজাচ্ছিল। আর চারপাশ থেকে একটা নাম, দুটি অক্ষর, যেন তাকে ছেঁকে ধরছিল—অনু, অনু, অনু!

পুলিশ অফিসারটি ফাইল ছেড়ে উঠে সামনের দিকে ঝুঁকে দুহাতে ধরল প্রিয়তোষকে। সে বলল, কি হয়েছে মিষ্টার রায়!

ফটোর এ্যালবামটা একপাশে সরিয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ টেবিলে মাথা ঠুকতে ঠুকতে অস্পষ্ট আওড়ে চলল, অনু, অনু, অনুরে—

প্রিয়তোষের বিলাপোক্তি শুনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সিপাইটি ছুটে ভেতরে এল।

পুলিশ অফিসার প্রিয়তোষের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, কোন ফটোটা মিষ্টার রায়—

তারপর, থানাপর্ব চুকতে খুব একটা বেশি সময় লাগল না। কয়েকটা কাগজে সই করতে হল প্রিয়তোষকে। মৃত ব্যক্তির মার্ডার রিপোর্টটা একবার প্রিয়তোষকে পড়ে শোনানো হল। অনু মারা গেছে হুগলী জেলার এক গ্রামে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের সময়। মৃত্যুর কারণ—গুলিবিদ্ধ হওয়া। অকুস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিল। মারা যাবার দিন—অক্টোবর উনিশ শ' একাত্তর। দুর্গাপুজোর পরে। অনু ফেরার হয়েছিল জুন মাসে।

পুলিশ অফিসার নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিল প্রিয়তোষকে। ডোণ্ট বি নার্ভাস। যা ঘটার তো ঘটেই গেছে। ভেরি স্যাড। এরকম কত ব্রাইট ইয়ংম্যান যে মিসগাইডেড হয়ে প্রাণ দিয়েছে—

প্রিয়তোষ ওর কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করেছিল, আবার

আইডেন্টিফিকেশনের জন্য ডাকবেন না তো?—পুলিশ অফিসারটি বলেছিল, না, তার আর দরকার হবে না। সেই কাজটা তো আপনিই করে সই সাবুদ দিয়ে গেলেন। তবে, ফিউচারে কেসটা নিয়ে কোন মহল থেকে যদি নাড়াচাড়া করা হয় তবে সে অন্য কথা।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়াছল।

প্রিয়তোষ উঠতে পুলিশ অফিসার বলেছিল, আরো একটু বসে যান না। বৃষ্টিটা থামুক।

প্রিয়তোষ সে কথা শোনেনি।

পুলিশ অফিসার থানা-বিল্ডিং-এর বাইরের দরজা অব্দি এসেছিল। বলেছিল একবার, একলা যেতে পারবেন তো মিষ্টার রায়। নাহলে বলুন, জিপের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে সঙ্গে লোক দিই। আপনাকে না হয় বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দেবে—

প্রিয়তোষ বলেছিল, না, তার আর দরকার হবেনা। আমি একলাই যেতে পারব—

রেললাইন বাজার ছাড়িয়ে বাড়ির রাস্তায় পড়তে অন্ধকার যেন হৈ হৈ করে প্রিয়তোষকে আক্রমণ করেছিল। সেই সঙ্গে বৃষ্টি আর হাওয়ার গতিও বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। রাস্তার ইলেট্রিক বাতি-গুলো জ্বলছিল না। এমনকি কাছাকাছি বাড়িগুলোতেও না। সম্ভবত জলঝড়ে এদিকটায় লোড শেডিং হয়েছে। প্রিয়তোষের বৃষ্টিতে অন্ধকারে পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল।

প্রিয়তোষ একবার ভেবেছিল—অনুর খবরটা আর কিছুদিন পরে পেলে ভাল হত। বাড়ি ঠিক করে রিনাকে নিয়ে নতুন বাসায় চলে যাবার পর। অনু মারা গেছে অক্টোবর মাসে। ঘটনাটা ঘটার সাতমাস বাদে খবরটা সে পেল। আরো একমাস বাদে পেলে এমন কিছু ক্ষতি হতনা। অনু তো আর ফিরে আসছে না! ছেলে-বেলার নানা স্মৃতি ছবি হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে সুরু

করেছিল। সব ছবিই অন্নুর! সব স্মৃতিই অন্নুকে ঘিরে। সেসব পুরোণ দিনের কথা ভাবতে ভাবতে প্রিয়তোষের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির জলধারা তার কান্নাকে ধুইয়ে দিয়েছিল। হাওয়ার গর্জনে তার গলা থেকে চিরে চিরে বের হয়ে আসা ধ্বনিগুলো চাপা পড়ে গিয়েছিল।

অন্ধ এবং খোঁড়া মানুষ যেমন পথ হাঁটে তেমনি আন্দাজ অনুমানে নির্ভর করে প্রিয়তোষ বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছিল। এবং গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকবার মুখে সে এক মুহূর্তের জন্য হলেও নিশ্চিত হয়েছিল এই ভেবে যে—আজ এই জলঝড়ের দিনে সুহাসিনী আর লেবু গাছতলায় দাঁড়িয়ে নেই। অন্নুর খবরের অপেক্ষায়।

সাত.

বরাবর সকালে ওঠে মহীতোষ। কদিন হলো টিউশনিতে যাচ্ছে না। সামার ভেকেশনের ছুটি। ছাত্রটি দিনকয়েকের জন্য মামা-বাড়িতে বেড়াতে গেছে। বাজার করে মহীতোষ যখন ফিরল—তখন বেলা সাতটার কিছু বেশি হবে।

রেখা কুয়োতলায় কি সব ধুচ্ছিল। ললিতমোহন শয্যালগ্ন হবার পর থেকে প্রিয়তোষ রান্নার জন্য একজন ব্রাহ্মণ মহিলা রেখেছে। সুহাসিনী একহাতে রান্না এবং ললিতমোহনের শুশ্রূষার কাজ সেরে উঠতে পারবে না ভেবেই।

সুহাসিনী রান্নাঘরেই ছিলেন। রাধুনীকে কিসব যেন বলছিলেন। মহীতোষ এসে বলল, সস্তায় মাগুরমাছ পেয়ে গেলাম মা। কয়েকটা বাবার জন্য জিইয়ে রেখো—

কাঁটা-অলা মাছ ললিতমোহনের গলা দিয়ে নামতে চায় না।

সুহাসিনী বাজারের থলিটা ছেলের হাত থকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডাক্তারখানায় গিয়েছিলি মহী?

মহীতোষ বলল, এখনো খোলেই নি। যাব আর একটু বেলা বাড়লে—

একমাসের ওপর হয়ে গেল—ললিতমোহনের ঘা কিছুতেই শুকুচ্ছে না। তাই ডাক্তার ব্লাড একজামিনের নির্দেশ দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

সুহাসিনী বললেন, তুই ঘরে যা। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি—

ঘরে ঢুকতে মহীতোষ দেখল—মাধুরী বিছানায় লাটপাট হয়ে পড়ে আছে। মাথার দিকের মশারীর দড়ি খোলা। হাতের সামনের টুলের ওপর চায়ের কাপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে ওপরে সবুজ সর পড়ে আছে।

চায়ের অপেক্ষায় শিয়রের কাছের জানালাটা খুলে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল মহীতোষ। আকাশের গতিক ভাল নয়। ঘরের ভেতরে পর্যাপ্ত আলো নেই। বছরের শুরু থেকেই যেরকমটা দেখা যাচ্ছে—এবার বৃষ্টি ভোগাবে।

খাটের ওদিক থেকে মোড়ামুড়ি খেয়ে মাধুরী কর্কশ গলায় বলে উঠল, জানালাটা খুলে দিলে! শান্তিতে যে একটু ঘুমুব—

মাধুরীর অভ্যাস আর স্বভাবের পরিবর্তনের তল পায় না মহীতোষ। এক সময় ও ছিল এই সংসারের হৃদ্‌যন্ত্র। ও না চললে সংসার অচল হয়ে পড়ত। অথচ এখন, বিশেষ করে ললিতমোহন পা ভেঙে পড়ে যাবার পর, সংসারে কাজের চাপ যখন বেড়েছে,—ও কেমন নির্বিকার হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধা সুহাসিনী যে উদয়াস্ত খেটে খেটে হন্যে হয়ে যাচ্ছে—এটা কি ওর চোখেই পড়ে না। কিংবা, পড়লে জেগে ঘুমাবার ভাণ করে থাকে কি করে মাধুরী!

রাঁধুনী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। মহীতোষ নিজের দোষটাকে সংশোধন করে নিতে চাইল, তুমি যে জেগে আছো বুঝতে পারিনি—

মাধুরী খাট থেকে নামল। ব্যঙ্গের হাসি হাসল আপনমনে। ড্রেসিং টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে এলো-চুল গুছিয়ে নিয়ে একটা আলগা খোঁপা তৈরি করতে করতে বলল, অনেক কিছুই তো বোঝ। আর এটুকু বোঝ না—

চায়ের কাপে চুমুক দিতে গিয়ে বিসম গেল মহীতোষ। সে আর যাই হোক অচেতন পদার্থ নয়। মাধুরীর কথায় মাথার ভিতরকার একটা শিরা যেন টং করে ছিঁড়ে গেল। তবু, সে উদ্ভিদেরই মত প্রতিক্রিয়াহীন বসে রইল। আর ভাবল: আজকাল তুচ্ছ ব্যাপারে মাধুরী কেন যে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠে—

ড্রয়ার খুলে ব্রাশের ডগায় পেস্ট ধরে নিয়ে ফের বলল মাধুরী, রঞ্জন কোথায়?

এবার আর নিজেকে বিকারহীন রাখতে পারল না মহীতোষ।

সে ঠোঁটের কোণায় নীরব হাসি ধরল। এবং ভাবতে চাইল: এটা নির্ঘাৎ কোন অপরাধবোধের ফল মাধুরীর। নইলে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে—মহীতোষের মুখোমুখী হয়—ওর মুখে ততক্ষণ শুধু একটাই প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে ওঠে কেন। রঞ্জন কোথায়? মহীতোষ বলল, রতনদের বাড়ি। ওর বাবার কাছে পড়তে গেছে—

রতনের বাবা রিটায়ার্ড সরকারী চাকুরে। সময় কাটেনা। রঞ্জনকে ছোট থেকে খুব ভালবাসেন।

ওঃ, তাই বলো। —মাধুরীর কথার মধ্যে একটা ইংগীত ছিল। মহীতোষ সেটা ধরতে পারল না। মাধুরী দাঁতে ব্রাশ চেপে বেরিয়ে গেল।

চাকরীতে ঢুকবার পর থেকেই মাধুরী অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এটা মহীতোষের মত আর কারুর বুঝবার কথা নয়।

কিন্তু, মাধুরী এতটা পালটে যাচ্ছে কেন এটা মহীতোষ বুঝে উঠতে পারে না। এর জন্য তার মাঝে মাঝে আত্মগ্লানি হয়। অবশ্য এই আত্মগ্লানিটা সাম্প্রতিক। নিজে ছাটাই হয়ে যাবার পর থেকে বেকার বলেই কি তবে মাধুরী তাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে। এই জাতীয় হীনমন্যতাবোধ আজকাল প্রায়ই মহীতোষকে বিষণ্ণ করে তোলে।

আবার কখনো মহীতোষের ভাবনা আশঙ্কার রূপ নেয়। চাকরীটা নিজের চেষ্টাতেই জুটিয়েছিল মাধুরী। ওর এক মামাকে ধরে। গোপনে গোপনে সব করেছিল। কিন্তু, মহীতোষের অনুমতি না থাকলে কি মাধুরী কাজে জয়েন করতে পারত। মাধুরীর ওপর তখন মহীতোষের আস্থা অগাধ। সমবেদনাও ছিল যথেষ্ট। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে দিন আর রাতকে আলাদা করে চেনার ফুরসৎ পায়নি মাধুরী। তাই শুধু অর্থ নৈতিক কারণেই নয়—মাধুরী সংসারের ঘুপচি থেকে বেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে নিজেকে মেলে দিয়ে সজীব হয়ে উঠুক—এই ছিল মহীতোষের ইচ্ছা। নইলে, সুহাসিনী আর

ললিতমোহনের তরফ থেকে ঘরের বউ চাকরীর জন্য বাইরে বেরোক—এ ব্যাপারে সায় ছিল না।

ইণ্টারভিউ লেটারটা এসেছিল আকস্মিকভাবে। বাড়ীর সবাইকে তাক লাগিয়ে। চিঠিটা প্রথমে হাতে পড়েছিল প্রিয়তোষের। বৌদির নামে আসা আধাসরকারী অফিসের সিলমোহর আঁটা চিঠি দেখে কৌতূহলবশত খুলেছিল প্রিয়তোষ। এসেছিল বিকেলের ডাকে। দিনটা ছিল শনিবার। তখন সবে মহীতোষ অফিস থেকে বাড়িতে ফিরেছে।

প্রিয়তোষের যা স্বভাব। রাগের মত ওর আনন্দের অভিব্যক্তিও প্রচণ্ড। 'বৌদি' বলে হাঁক পেড়ে এঘরের দিকে ছুটে এসেছিল বারান্দা থেকে।

মাধুরী তখন শুকনো কাপড়চোপড় আলনায় গুছিয়ে রাখছিল। প্রিয়তোষের হাঁকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কি ব্যাপার ঠাকুরপো—

প্রিয়তোষের গলা আরো তেজী হয়ে উঠেছিল, বলো বৌদি, কি খাওয়াবে?

মাধুরী বলেছিল, হঠাৎ তোমায় খাওয়াতে যাব কোন দুঃখে?

প্রিয়তোষ খেপে উঠেছিল, খাওয়াবে না মানে। একশ'বার খাওয়াবে। ভরপেট মুরগীর মাংস—

মহীতোষ অফিসের জামা কাপড় ছাড়ছিল। চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে বলেছিল, চেঁচাচ্ছিস কেন। কি হয়েছে বলবি তো—

প্রিয়তোষ হাততালি দিয়ে ওঠার ভঙ্গীতে বলেছিল, বৌদি চাকরী পেয়েছে। এই ছাখো, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার—

মহীতোষের মগজে সংবাদটা ঢুকবার কথা নয়। সে এব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানত না। বলেছিল, কই দেখি—

চিঠিটা বার দুই পড়ে বলেছিল ফের মহীতোষ, তাই তো দেখছি। কবে অ্যাপ্লিকেশন করলে—আর কবেই বা ইণ্টারভিউ দিয়ে এলে! কিছুই তো জানিনা—

মাধুরী খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠছিল, ইচ্ছে করেই বলিনি। তোমাকে চমকে দেব বলেই।

ললিতমোহন এবং সুহাসিনীও পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

সুহাসিনী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি হয়েছে মহী?

প্রিয়তোষ উত্তর করেছিল, বৌদির চাকরী হয়ে গেছে মা—

ললিতমোহন জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোথায়?

মহীতোষ জবাবটা দিয়েছিল, একটা আধাসরকারী অফিসে।

ললিতমোহনের মুখ মুহূর্তে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছিল, ভাল। তবে ঘরের বউ। সংসার ফেলে—। মাধুরীকে ললিতমোহন নিজের সন্তানদের মতই ভালবাসেন।

প্রথম রাউণ্ড মাধুরীর হয়ে লড়াই করেছিল প্রিয়তোষ, আজকাল তো অনেক ঘরের বউ চাকরী করছে। তারা সংসার করে না?

সুহাসিনী বলেছিলেন, এতকাল ঘরের ভেতরে আছে। হঠাৎ বাইরের দশজনের সঙ্গে ও কি মানিয়ে চলতে পারবে। তার ওপর যা লাজুক—

প্রিয়তোষ বলেছিল, ওসব কোন কথা নয় মা। না বেরুলে মিশবে কি করে। দুদিন অফিসে গেলেই দেখবে সব সড়গড় হয়ে গেছে—

সুহাসিনী কিংবা ললিতমোহন আর কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। তবে ওদের মৃদু আপত্তি পরিবেশকে গম্ভীর করে তুলেছিল।

সেদিন রাতে বিছানায় উঠে মাধুরী নিজের সবটুকু উষ্ণতা দিয়ে মহীতোষকে আবৃত করে শুধিয়েছিল, তুমি কি বলো। চাকরীটা নেব না! যা দিনকাল। কত কষ্ট করে জোগাড় করেছি। তাছাড়া আমি পাশে দাঁড়ালে তোমার কষ্টটাও তো কিছু কমে। সেই সকালে বেরিয়ে যাও। দুটো পয়সার জন্য ফেরো রাত্তিরে। ওভারটাইম করে—

মহীতোষ আগেই মাধুরীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল।

তবু ওকে ঘাবড়ে দেবার জন্য বলেছিল, মা বাবার যখন ইচ্ছে নেই তখন কি চাকরী নেওয়াটা ঠিক হবে মাধুরী ?

মাধুরী মহীতোষের শরীরে ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়েছিল, প্রিয় ঠাকুরপো তো বলল। তুমি যদি আর একবার ওদের বুঝিয়ে বলো—

মহীতোষ তার বক্তব্যের জের টেনেছিল, তাছাড়া, মার বয়স হয়েছে। সংসারের কাজ তো কম নয়। তুমি যদি বাইরে বাইরে থাকো—তাহলে, মার পক্ষে একা সবদিক সামলানো—

মাধুরীর শরীর আলগা হয়ে এসেছিল সে-কথায়, তাতে কি। সকালবেলা রান্নার জন্য একটা লোক ঠিক করব। আর রাতে তো তেমন কিছুই রান্নার থাকে না। ভাত রুটি। সে আমি অফিস থেকে ফিরে এসেও করতে পারব—

মহীতোষ আরো একটু নিরুৎসাহিত করতে চেয়েছিল মাধুরীকে, সারাদিন অফিস করে বাড়ি ফিরে ফের উনুনের কাছে বসলে তোমার শরীরের যে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—

ঘরের ভেতরকার অন্ধকারের চেয়েও শব্দহীন নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল মাধুরী। মহীতোষের কথায়। সরে গিয়ে চুপচাপ বালিশে মাথা রেখেছিল একসময়।

মহীতোষ বেশিক্ষণ অটল থাকতে পারেনি। কয়েক মিনিট বাদেই ডেকেছিল মাধু, মাধু—

ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে—এমনি ভাণ করে বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল মাধুরী, কি ?

মহীতোষ অন্ধকারে প্রাণভরে নিঃশব্দে হেসে বলে উঠেছিল, রাগ করলে মাধু—

মাধুরীর শরীরটা পাক খেয়ে উঠেছিল, না, রাগ করার কি আছে। তোমাদের কারুর যখন মত নেই। তখন আর—

মহীতোষ বলেছিল, আমার কথাটা তো তুমি জানতে চাইলে না। আমি তো তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—

মাধুরী অভিমানহত গলায় জবাব দিয়েছিল, আর জানবার কি আছে। তুমি তো মনের কথাটা ঘুরিয়ে বলেই দিলে—

মহীতোষ বলল, কিছুই বলিনি। যদি বলি আমার মত আছে—

মাধুরীর শরীরে প্রাণের সাড়া এসেছিল, সত্যি বলছ ?

মহীতোষ একটানা বলে গিয়েছিল, কখনো তোমাকে মিথ্যে বলেছি! আমি চাই—চাকরীটা তুমি নাও। স্বামী হয়ে তোমার কোন সখ-আহ্লাদই তো আমি মেটাতে পারিনি। এবার তুমি সুযোগ পেয়েছ। সেই সুযোগটা আমি নষ্ট হতে দেব! একথা তুমি কি করে ভাবলে মাধু—

মাধুরা উঠে বসেছিল। ওর কণ্ঠস্বর ঝরণার শব্দের মত কল-কলিয়ে উঠেছিল, আমি জানতাম। তুমি কখনো আমার ওপর নির্দয় হতে পারো না।

মহীতোষ ফের বলে চলেছিল, মা বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে নেব। ওদের জন্য ভেবোনা তুমি —

মহীতোষ জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। এখন খানিকক্ষণ বাগানের তত্ত্বতদারকিতে কাটাবে। তারপর একবার বেরুবে। প্রথম যাবে শিয়ালদ'য়। নীরদের কাছে। নীরদ মহীতোষের এককালের বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ত। ওর পাল্লায় পড়ে দিনকতক কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিল মহীতোষ। তার দুচারটে ছোটখাটো লিটল্ ম্যাগাজিনে বেরিয়েওছিল। তারপর যা হয়। ওসব উত্তেজনা কদিন টেকে!

নীরদের সঙ্গে এর মধ্যে একদিন দেখা হয়েছিল যাদবপুর ষ্টেশনে। নীরদের শ্বশুর বাড়ি এদিকেই কোথায় যেন। কথায় কথায় মহীতোষের সব কথা জেনে বলেছিল, একদিন আয় না আমার বাড়িতে। সকালের দিকে থাকি। বেলা একটা পর্যন্ত। দেখি তোর জন্যে যদি কিছু একটা করতে পারি—

বাগানে এসে মাটিতে খুরপি চালাতে চালাতে ভাবছিল মহীতোষ : সুহাসিনী এবং ললিতমোহনের মাধুরীর চাকরী নেবার ব্যাপারে আপত্তির হয়ত আরো একটা কারণ ছিল। যেটা ওরা মুখ ফুটে বলতে পারেনি। ওরা দূরদর্শী। জীবনে অনেক দেখেছেন। দেখে শিখেছেন। ঘরের বউ বাইরে বেরুলে তার মনটা আর আগের মত থাকে না। এটা আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মহীতোষ। সেই নম্রস্বভাবা মাধুরী এখন কত অসহিষ্ণু, বেপরোয়া এবং উদ্ধত। মহীতোষ যখন এটা উপলব্ধি করতে পারছে তখন জল অনেকদূরে গড়িয়ে গেছে। আজ আর সে মাধুরীকে ফেরাতে পারে না। স্বামিত্বের অধিকার নিয়ে মনের কথাটা বলতে পারেনা : মাধু, তুমি চাকরী ছেড়ে দাও। তুমি আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছ। শাকভাত খাই তা-ও ভাল। কিন্তু,— চাকরী করে আর দরকার নেই।—একথা বলবে কি করে মহীতোষ। কেননা আজ সে বেকার। স্ত্রীকে ভরণপোষণের যোগ্যতা সে হারিয়েছে। চাকরীটা তার থাকলে বলতে পারত।

বৌবাজারে নীরদের বাড়িতে গিয়ে ওকে পাওয়া গেল না। নীরদদের রঙের বনেদী ব্যাবসা। ব্যবসার কাজে কদিন আগে বিহারের কোন এক জেলা শহরে চলে গেছে।

বৌবাজার থেকে শিয়ালদ' ষ্টেশনের দিকে ফিরে আসতে পরিচিত গলার ডাকে দাঁড়িয়ে পড়ল মহীতোষ। কাছাকাছি কেউ ডাকছিল, রায়দা, ও রায়দা, এই যে—

ঘুরে দাঁড়িয়ে নজর করতে মহীতোষ দেখল—ফুটপাতের ওপর ত্রিপল দিয়ে ঢাকা রাস্তার রেলিঙে সাজানো রেক্সিনে তৈরী এক ব্যাগের দোকানের সামনে কমলেশ সেন দাঁড়িয়ে আছে।

মহীতোষ এগিয়ে গিয়ে বলল, তুমি এখানে ?

কমলেশ বলল, এটা আমার দোকান—

কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল না মহীতোষের। বলল, তুমি আবার কবে দোকান দিলে ?

কমলেশ বলল, জৈন-মুরারকা কোম্পানী থেকে চাকরী যাবার পরেই—

মহীতোষ বলল, কেন, চাকরীটাকরির আর চেষ্টা করছ না—

কমলেশ হাসল, চাকরী ! এই বাজারে চাকরী জোটানো কি সহজ কথা রায়দা। তাই ভাবলাম, মিছেমিছি ঘরে বসে হাতকামড়ে লাভ কি। একটা কিছু করি।

মহীতোষ মাথা নাড়ল, বেশ করেছ। স্বাধীন ব্যবসা—

কমলেশ বলল, ওসব বুঝি না। একটা কিছু তো করতে হবে। নইলে পেট চালাব কি করে ?

মহীতোষ অন্য কথা ভাবছিল। ডিষ্টিংশনে বি-কম পাশ। কোয়ায়েট ইয়ংম্যান। অ্যাকাউন্টস-অডিটে তুখোড় ছেলে কমলেশ। শেষপর্যন্ত ও-ও রাস্তায় নেমেছে।

মহীতোষ বলল, তারপর কেমন আছো বলো। বাড়ির খবর টবর ভাল তো ?

কমলেশ একটা সিগারেট ধরাল, মোটামুটি। একটা স্পেশাল খবর আছে। একটি ছেলে হয়েছে আমার—

মহীতোষের চেষ্টাকৃত হাসিটা নীরস হয়ে গেল, আচ্ছা ! তাই নাকি ! তাহলে তো সুখবর—

কমলেশ বলল, একটু চা খাবে নাকি রায়দা ?

মহীতোষ না করতে পারল না।

কমলেশ বলল, তারপর তোমার কি খবর ? কিছু করছটরছ ?

এই ভয়েই ছিল মহীতোষ। হীনমন্যতাবোধ তার চরিত্রে এতদূর চারিয়ে গেছে যে পরিচিত লোকেদের সে পারত পক্ষে এড়িয়ে চলে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ফেলে—এখনো কিছু হল না তোমার ? —এইভেবে।

মহীতোষ নিজেকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করল, না, তেমন কিছু নয়। সবে তো প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কটা পেলাম। এবার ভাবছি—

চায়ের খুড়ি এগিয়ে দিয়ে কমলেশ বলল, হ্যাঁ, এবার একটু উদ্যোগী হও। বাঁচতে তো হবে—

মহীতোষ ওকে অন্যমনস্ক করতে চাইল, তারপর, তুমি আর আগরওয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলে ?

এক চুমুকে খুড়ি শূন্য করল কমলেশ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। আবার ওই লোকটার কাছে যাব !

এই কারণেই কমলেশকে বেশ লাগে মহীতোষের। শুধু কমলেশকে নয়—ওদের বয়সের সব ছেলেকেই। ওরা মনের দিক থেকে ভারমুক্ত। সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলেই চিনতে শিখেছে। তাদের মত কোন ব্যাপারে ওদের বাস্তবতাবর্জিত মোহ নেই। সব পরিস্কার করে জানতে চেষ্টা করে ওরা। অস্পষ্টতা নেই ওদের দৃষ্টিতে। নেই কোন পিছু টান। অহেতুক প্রত্যাশা।

মহীতোষ বলল, তারপর, ব্যবসা কেমন চলছে কমলেশ ?

কমলেশ বলল, মন্দ নয়। তবে অল্প ক্যাপিটাল নিয়ে নেমেছি তো। ঠিকমত দাঁড়াতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

মহীতোষ প্রশ্ন করল, পজিশন ভাল। বিক্রি তো মন্দ হবার কথা নয়—

কমলেশ বলল, খুচরো বিক্রি করে কি আর তেমন কিছু করা যাবে। পেটের ভাতটা হয়ত জুটবে। অর্ডার সাপ্লায়ের কাজে নামব ভাবছি। এই জন্যেই দোকানটা দেখাশুনার জন্য একটা ছেলেকে রেখেছি এমাস থেকে।

মহীতোষ শুধোল, কোথায় অর্ডার পেলে ?

কমলেশ হাসল, তুমি দেখছি আগের মতই আছো রায়দা। কোন প্র্যাকটিক্যাল সেন্স হল না তোমার এখনো। আমি এক চুনোপুঁটি।

রাস্তায় দোকান সাজিয়েছি। অর্ডার দিতে কে এখানে আসবে ছুটে?

মহীতোষ বলল, তাহলে—

কমলেশ বলল, নিজেই ছুটাছুটি করছি। এ অফিস ও-অফিসে—

মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, রেসপন্‌স্ কিরকম?

একজন খদ্দের এসে দাঁড়াল। কমলেশ বলল, মন্দ নয়। টুকটাক হচ্ছে—

রোদ চড়তে শুরু করেছে। পায়ের নিচের রাস্তার পীচ ফুটছে। কমলেশ খদ্দেরটিকে ব্যাগ দেখাচ্ছিল। মহীতোষ বলল, আজ তাহলে চলি কমলেশ। ট্রেনের সময় হয়ে গেল—

কমলেশ বলল, আচ্ছা। এদিকে এলে আবার এসো রায়দা—

মহীতোষ মাথা নাড়ল।

ষ্টেশনে পৌঁছুতেই একটা ট্রেন পাওয়া গেল। জানালা-ধারের সীটে বসল মহীতোষ। কমলেশের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই তার ভাবনায় বসন্তের গুটি ওঠার মত একটা পরিকল্পনা চারিয়ে উঠছিল।

মহীতোষ ভাবল: কমলেশের মত ব্যবসায় নেমে পড়লে কেমন হয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাক'টা হাতে থাকতে থাকতে!

কিন্তু, পরমুহূর্তে মাধুরীর কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সে চুপসে গেল। মাধুরীকে পরিকল্পনার কথাটা বললে তেতে উঠবে। বলবে, তুমি করবে ব্যবসা! এ দুর্বুদ্ধি তোমার মাথায় আবার কে ঢোকাল? —মহীতোষ নিজের মতটাকে সবল করতে চেষ্টা করবে, কেন, হাজার হাজার লোক ব্যবসা করে কলকাতা শহরে বেঁচে আছে না! —মাধুরী বলবে, সে তো আছে। আবার হাজার হাজার লোক তো ব্যবসা করতে গিয়ে যথাসর্বস্ব খোয়াচ্ছেও। মহীতোষ বলবে, চেষ্টা করে দেখি না একবার। ঘরে বসে থেকে লাভটা কি।—মাধুরীর চোখের দৃষ্টি

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে, তা, কি ব্যবসা করবে? —মহীতোষ আমতা আমতা করবে, এখনো ভেবে দেখিনি। তবে দু'চার দিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলব। —এরপর মাধুরী আর কথা বাড়াতে দেবে না তাকে। বলবে, হ্যাঁ, ব্যবসা করার ঐতিহ্য তো তোমাদের বংশে আছে। শুনে-ছিলাম—শ্বশুরমশায় নাকি একবার লণ্ড্রীর ব্যবসা খুলেছিলেন। তুমি তার যোগ্য ছেলে। নেমে পড়ো। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাক'টা শেষ না করা পর্যন্ত কি আর স্বস্তিতে ঘুমুতে পারবে!

প্রায় হুড়মুড়িয়ে প্ল্যাটফরমে লাফিয়ে নেমে পড়েছিল মহীতোষ। যাদবপুর ষ্টেশনে কখন এসে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করতে পারেনি।

বেলা তখন প্রায় বারোটা। চেম্বার থেকে ডাক্তার উঠে রাস্তায় নামছিলেন। এমন সময় মহীতোষ হাজির হল। তাকে দেখতে পেয়ে ডাক্তার বললেন, এই তো, এসে গেছেন। এতক্ষণ আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

কম্পাউণ্ডার এসে ব্লাড রিপোর্টের খামখানা মহীতোষের হাতে দিল।

মহীতোষ প্রশ্ন করল, রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেল?

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম। প্রচুর পরিমাণে সুগার পাওয়া গেছে। ডায়াবেটিসের পেসেণ্ট। তাই এতদিনে ঘা শুকুচ্ছে না।

এতক্ষণ রোদে, তার ওপর ডাক্তারের কথা শুনে মহীতোষ চোখে অন্ধকার দেখল। বলল কাতর গলায়, খুব খারাপ কিছু মনে হচ্ছে আপনার ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার বললেন, ভাল বলেও তো মনে হচ্ছে না। তবে এবার ঠিকমত চিকিৎসা করতে পারব। আসল রোগটা যখন ডিটেক্টেড হয়ে গেছে—

মহীতোষ বলল, সারবে তো?

ডাক্তার ঈষৎ হাসলেন, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কিছু কি আমরা বলতে পারি মহীতোষবাবু? তবে চেষ্টা করে দেখব। তেমন ফল না হলে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই পাঠাতে হবে।

দিনরাতের মধ্যে দুপুরটা অসহ্য বোধ হয় মহীতোষের। সকাল-সন্ধ্যা এটা-সেটা কাজে কেটে যায়। দুপুরটা কিছুতেই ফুরুতে চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি। খাওয়াদাওয়ার পর রঞ্জনকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়েছিল মহীতোষ। হাতেপায়ে ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে রঞ্জন। সেই সঙ্গে দুষ্টুও।

রঞ্জন ঘুমিয়ে পড়তে উঠে বসল মহীতোষ। বাইরে ঘন রৌদ্র। গ্রীষ্মের দুপুরে ঘুমটা বেশ জমে। উঠতে বিকেল হয়ে যায়। শরীর রসস্থ হয়ে পড়ে, ম্যাজম্যাজ করে। সবচেয়ে বড়কথা, সেদিন আর রাতে ঘুম আসতে চায় না।

দুপুরে মহীতোষ যেন কলে-পড়া ইঁদুর। ঘরে বসে ছটফট করে কেবল। যা রোদ! বাগানে গিয়ে যে বসবে তারও উপায় নেই। কোন কোন দিন বৃষ্টি হয়। তখনো একই অবস্থা—ঘরবন্দী।

সময় যে কত দুর্বহ, অসহনীয় তা চাকরী চলে যাবার পর থেকে ভাল করেই বুঝছে মহীতোষ। হাতে কোন কাজ নেই, প্রচুর অবকাশ, অথচ যে অবকাশটা কাঙ্ক্ষিত নয়, বসে বসে শুধু ভাবা। অসহায়ের মত। অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা! ভেবে কেবলই দুর্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা। কেবলই তিল তিল করে ক্লীবত্ব অর্জন করা।

অথচ, কয়েক মাস আগেও মহীতোষ ছিল অন্যরকম। সময়ের নাগাল পেত না। সময় ছুটত পাগলা ঘোড়ার মত। দিন-মাস-বছর কিভাবে যে বয়ে যেত জীবনের ওপর দিয়ে।

মহীতোষ একবাব বাইরে এল। কুয়োতলায় গেল। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসার মুখে একবার মাঝের ঘরে উঁকি দিল।

ললিতমোহন ঘুমিয়ে আছেন। ঘুম নয়, আচ্ছন্নতা। ব্যথা ক্রমশ বাড়ছে। সেই সঙ্গে ঘা-ও ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে।

সুহাসিনী পাশের খাটে বসে ঢুলছেন। এই কিছুক্ষণ সময় সুহাসিনী শ্বাস ফেলার মত একটু সময় পায়। একটু বাদে ঠিকে ঝি আসবে। উনুন ধরাবে। সুহাসিনী উঠবেন। গরমজল চাপাবেন। তখন ললিতমোহনের পা ওয়াশ সুহাসিনীই করেন। ঘা ক্রমশ দগদগে হয়ে উঠছে। পচনটা প্রকট হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

ব্লাড রিপোর্টের কথা মহীতোষ এসে বলেনি সুহাসিনীকে। বলে কি লাভ—যা হবার তা তো আর খণ্ডানো যাবে না। মাঝখান থেকে সুহাসিনীকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। একেই অনু নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে আধখানা হয়ে আছে সুহাসিনী।

ঘরে ফিরে আসতে আবার সেই অস্বস্তি। মহীতোষ জানালার কাছের চেয়ারে এসে বসল। সামনের টেবিলে ডাঁই করা জিনিসপত্র। প্রোটিনেক্সের হরলিক্‌সের শিশি, চুলের ফিতে, কাটা, শূন্য ক্রিমের কৌটো। এসবই মাধুরীর। এলোমেলো ছড়িয়ে আছে টিন।

হঠাৎ টেবিলে চোখ পড়তে দেখল একটা পুরোণ খাতা—অনেক-কালের পুরোণ। ওপরেরর শক্ত মলাটটা ছেঁড়া। কৌতুহল বশতঃ খাতাটা টেনে নিল মহীতোষ। পরপর কয়েকটা পাতায় মাসের বাজার খরচের হিসাব লেখা। উনষাট সালের মাঝামাঝি সময়ের সাংসারিক আয় ব্যয়ের খতিয়ান। তখন মহীতোষ গেঞ্জীর কলে চাকরী করত। হাট বাজার সব নিজের হাতেই করত। তারপর—কয়েকটা পাতা সাদা। বোঝা গেল—এরপর থেকে বাজারের দায়িত্ব নিয়েছিল প্রিয়তোষ। তারপরে কয়েকটা ছবি। পেন্সিল স্কেচ। কয়েকটা ক্যারেক্টার স্টাডি, কয়েকটা নেচার স্টাডি। একসময় ভাল ছবি আঁকার হাত ছিল মহীতোষের। ও-গুনটা ছিল মহীতোষের স্বভাবগত। সবশেষে একটা কবিতা—মহীতোষের স্বরচিত কবিতা। বিয়ের এক বছর বাদে লেখা। সম্ভবত এটাই মহীতোষের শেষ

কবিতা। এরপর আর কখনো কবিতা লিখবার মত প্রেরণা পায়নি নিজের ভেতর থেকে।

জানালার ওধারে পেয়ারা গাছের পাতায় রৌদ্রের হীরা চলকাচ্ছে। রৌদ্রের রঙ ক্রমশ মোহময় হয়ে উঠছে। মহীতোষ ঝাপসা গলায় কবিতাটা পড়তে চেষ্টা করল ঃ

এখনো নক্ষত্রগুলি কাঁপে স্থির জানালার পাশে
জলের শব্দের মত অবিরল দিন বয়ে যায়,
গ্রামে-গঞ্জে তুলসীমঞ্চে কি বিপুল কোলাহল ফাটে
আমন ধানের গন্ধে সম্মোহিত হরিয়াল তালে পৈঠায়।
প্রেম কি দূরস্থ স্মৃতি? না, বিষাদ। যার কাছে
নতজানু থেকে আমি একদিন মিশে যাব
মাটির ভিতরে। যতই কাঁপুক তারা, জানলা দরজা কড়িকাঠ
আমি কিন্তু স্থির। মিশে থাকব চিরকাল, অনন্ত অবধি—

অসম্পূর্ণ কবিতা, পংক্তিগুলোও ঠিকমত সাজানো হয়নি। তবু পড়তে পড়তে বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নিজের হারিয়ে ধূসর হয়ে যাওয়া অস্তিত্বটা মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছিল। আরেক-বার পড়ার ইচ্ছা ছিল কবিতাটা। পারল না—গলা থেকে শব্দ বেরুল না।

মহীতোষ আগের একটা পাতা ওল্টাল। সমুদ্রের ছবি। সফেন অশান্ত ঢেউ। বহুদূরে আর্তদিগন্ত। ডানায় সমুদ্রের লবণ মেখে পাখীরা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

মহীতোষের অস্বস্তি প্রখর হয়ে উঠল। সে খাতাটাকে বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। না, আর এক মুহূর্তও সে এই বদ্ধ ঘরে থাকতে পারবে না। খাটের কাছে এসে ঘুমন্ত রঞ্জনের গায়ে হাত রেখে ডাকল, রঞ্জু, রঞ্জন—

মহীতোষের ডাকাডাকিতে রঞ্জনের ঘুম চটে গেল। একসময় উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে বলল, কি বাবা?

মহীতোষ চাপা গলায় বলল, যাবি রঞ্জু ?

রঞ্জন শুধোল, কোথায় ?

মহীতোষ বলল, ঝিলের ওপারে। গ্রামের দিকে ?

রঞ্জন খাট থেকে নেমে পড়ল।

কলোনীর দক্ষিণ সীমানার পর দুটো মস্ত ঝিল। পুবে-পশ্চিমে ছড়ানো। একটা পরিস্কার। স্নানের উপযোগী। আরেকটা কচুরী-পানা শ্যাওলা দামে ভর্তি। ব্যবহারের অযোগ্য। দুই ঝিলের মাঝ-খানে সরু মেঠো পথ। তার দুধারে জঙ্গল। নাড়া-কাঁটাবন আঁশ-সেওড়া আর কালকাসুন্দের।

ওরা দুজনে সেই সংকীর্ণ পথ ধরে পূব-মুখো হেঁটে ঝিল ছাড়িয়ে বাঁধানো রাস্তায় পড়ল। রাস্তার ওধারে নিচু জমি। তালের সারি। এদো পুকুর। তারপর গ্রাম। এক নতুন জগৎ।

অনেক আগে এদিকটায় আসত মহীতোষ। মাঠে নেমে গ্রাম পেরিয়ে বহুদূর হেঁটে আকাশ-মাটির সীমানার কাছাকাছি চলে যেত। সে অনেককাল আগেকার কথা। পনের ষোল বছর তো হবেই।

সড়ক থেকে মাঠে নেমে আসতে এপার ওপারের ব্যবধানটা প্রকট হয়ে ওঠে। ওধারে ঘরবাড়ি, জনবসতি, আলো, কলরব। এধারে খোলা মাঠ। আকাশ। ক্রমশ নতুন সব দৃশ্য। গাছগাছালির সংসার। পাখিদের উদাসকরা ডাক। মাটির গভীরে বীজেদের নিঃশব্দ চলাচল। পাশাপাশি এ এক অদ্ভুত অনুচ্চারিত প্রতিযোগিতা। শহরের সঙ্গে গ্রামের। উদ্যোগী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির।

মাটির কাছাকাছি আসতে মহীতোষ সজীব হয়ে উঠল! মন থেকে অস্বস্তি মুছে গেল।

ওরা দুজনে সংকীর্ণ আলপথ ধরে এগুচ্ছিল। দুপাশের মাঠ বুকে স্বচ্ছ জল ধরে শান্ত পড়ে আছে! আলপথ ঘাসে ছেয়ে আছে। আর সেই ঘাসের ওপর বৃষ্টিবিন্দুর মত ছোট সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে।

মহীতোষ বলল, এগুলো কি ফুল বল্ তো রঞ্জু ?

রঞ্জন বলল, কি ফুল বাবা ? আমি চিনিনা—

ছেলের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে মহীতোষ বলল, কুরচি ফুল। এসময় হয়—

আলপথ ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে রঞ্জন প্রশ্ন করল, ওটা কি পাখি বাবা ?

একটা বাজ-পড়া মুণ্ডহীন তালগাছের মাথায় একটা মেটে রঙের পাখি বসেছিল। ছেলের প্রশ্নে সচকিত হয়ে পাখিটাকে ভাল করে দেখল মহীতোষ। তারপর বলল, হরিয়াল ! না না, ওটা কাদাখোচা—

ধানের মরাই গোয়ালঘর ঢেঁকিশালের পাশ দিয়ে হেঁটে গ্রামের পথটুকু পার হয়ে ওরা এসে পৌঁছুল এক বিরাট ফাঁকা মাঠের ভেতর। তারপর হাঁটতে হাঁটতে এক খালবাঁধের ওপরে উঠে এল। খালের ওধারে বিশাল প্রান্তর। দিক চিহ্নহীন। বাঁধের ওপর দাঁড়াতে পৃথিবীর আধখানা বলয়রেখা চোখের সামনে জেগে উঠল। নিচু জমি। কোথাও ডাঙা। কোথাও জল। কোথাও হোগলার জঙ্গল, বাদাবন। আবার কোথাও জলাভূমি।

গ্রামের লোকেরা এ খালকে বলে পঞ্চান্ন গ্রামের খাল। দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদী থেকে বেরিয়ে কলকাতা শহরকে দূর পশ্চিমে রেখে উদাসীন অলস গতিতে এই জলপথ লবনহ্রদ ছাড়িয়ে উলটোডাঙার কাছে গিয়ে বর্গীয় খালের সঙ্গে মিশে গেছে।

অনতিদূরে একটা বাঁশের সাঁকো। গ্রামের মানুষের পারাপারের পথ। বৃষ্টির জলে খাল গর্ভিনী নারীর মত ভরন্ত।

মহীতোষ রঞ্জনের হাত ধরে টেনে বলল, চল রঞ্জু ওই সাঁকোটায় গিয়ে উঠি।

রঞ্জন বলল, না বাবা। আমার ভয় করবে—

আকাশে বিকেলের রঙ ক্রমশ লালচে হয়ে আসছিল। ওপাশের

বাদায় কয়েকটা ডাহুক অনবরত ডেকে ডেকে জনহীন প্রান্তরের মৌন ভেঙে দিচ্ছিল।

সাঁকোর কাছাকাছি এগিয়ে ফের পেছিয়ে এল মহীতোষ হঠাৎ। তার গলা থেকে একটা আর্তনাদ ছিটকে বেরুল, সাপ! সাপ!

দুটো সাপ খেলা করছিল সাঁকোর ঠিক কাছে। ছাই-কালো রঙের। বেশ লম্বা। সাপদুটো অদ্ভুত ভঙ্গীতে পরস্পরের গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে উঠছিল। আর বাতাসের তালে দুলছিল। মাটি থেকে প্রায় দেড়-দুই হাত শূন্যে উঠে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ফণা তুলছিল। আবার অল্পক্ষণের জন্য নেমে পড়ছিল মাটিতে।

মহীতোষ রঞ্জনের কাছে এসে বলল, কথা বলিস না রঞ্জু—

রঞ্জন নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল ভয়ার্ত গলায়, ওরা কি করছে বাবা?

মহীতোষ বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল। বলল, খেলা করছে—

সাপদুটো ফের মাটি থেকে ঠেলে শূন্যে উঠছে। ওদের লেজের ঝাপটায় কাছের ঘাসঝোপ নড়ে উঠছিল। রঞ্জন জিজ্ঞেস করল, কি সাপ বাবা?

মহীতোষ বলল, গোক্ষুর।

রঞ্জনের প্রশ্ন শেষ হতে চায় না, ওরা কি কামড়ায় বাবা?

মহীতোষ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এখন ওদের দাঁতে ভয়ঙ্কর বিষ। একবার কামড়ালে—

বাঁধ থেকে পেছনের মাঠে নেমে এসে রঞ্জন শুধোল, এখন যদি ওরা ছুটে এসে আমাদের কামড়ায়—

মহীতোষ বলল, না, তা করবে না। ওরা যে এখন খেলা করছে—

গ্রামের ভেতরে ঢুকতে চারদিক আঁধার হয়ে এল। মহীতোষ তাড়া লাগাল, একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারিস না রঞ্জু। মহীতোষের ভয় ধরে গিয়েছিল। পথঘাট ভাল নয়—তার ওপর যা অন্ধকার।

হাটতলায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রঞ্জন। একটা বটগাছের নিচে খানিকটা উঁচুমত জায়গা। চৌকো। বাঁধানো। তার ওপর এক দেবী-মূর্তি। অদ্ভুত ধরনের। গ্রামের লোকেরা এ জায়গাটাকে বলে বন-বিবির থান। দেবীকে দেখতে কিশোরী বালিকার মত। মাথায় লতাপাতা আঁকা কাপড়ের টুপী। বিনুনী করা চুলের গোছা পেছন-দিক থেকে বুকের ওপর এসে নিচের দিকে নেমে পড়েছে। মাথায় টিকলি। গলায় নানান ডিজাইনের হার। বনফুলের মালা। পরনে ঘাঘরা এবং পাজামা। বুকের ওপর পাতলা ওড়না। পায়ে জুতো-মোজা। একহাতে আশাবাড়ি, আরেক হাতে ঝাণ্ডা। বাহন মুরগী।

মহীতোষও লোভ সামলাতে পারল না, দাঁড়িয়ে গেল।

বেদীর সামনে কিছুটা জায়গা নিকানো। সেখানে নৈবেদ্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা পেতলের গামলায় সিরনী। সাদা বাতাসা, কদমা, পাটালি গুড়, ফলমূল রয়েছে বিভিন্ন থালায়।

নৈবেদ্যের চারপাশে কয়েকটা লণ্ঠন। বেশ কিছু লোকের জমায়েত হয়েছে। জোব্বাজাব্বা পরা একজন ফকির সমবেত লোকেদের টোটকা, হেকিমি ওষুধ বিতরণ করছে। আরেকজন ফকির থানের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। হাতে চামর। সুর করে গাইছিল ঃ

বনবিবির রূপের কথা না যায় কহন।
রূপে তাঁর কেঁদখালি হয়েছে রৌশন॥

রঞ্জন ফেরার পথে মহীতোষকে জিজ্ঞেস করছিল, ওখানে কার পুজো হচ্ছে বাবা ?

মহীতোষ বলেছিল, বনবিবির পুজো।

রঞ্জন বলেছিল, বনবিবি ! সে আবার কে ?

মহীতোষ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। বনবিবি বনের দেবতা। গাছপালা পশুপাখির দেবতা। ওর পুজো করলে কল্যাণ হয়। বনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মনস্কামনা পূর্ণ হয়—

রঞ্জনের আরো কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। মহীতোষ ধমকে উঠেছিল। হাত ধরে টেনে বলেছিল, সাবধানে চল্ রঞ্জু, এখন আর বকর বকর করতে হবে না। অন্ধকার পথ—

সেদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল মহীতোষ। দুর্ভেদ্য বন। বনের মধ্যে সে একা। কোথাও কোন জনপ্রাণী নেই। সে বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তার। পথজুড়ে কাঁটা ছড়ানো।

একসময় তার সামনে এসে দাঁড়াল এক নারীমূর্তি। মাথায় তার উষ্ণীষ, হাতে ঝাণ্ডা, গলায় বনফুলের মালা। নারীমূর্তি হাসছিল।

মহীতোষ জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

নারীমূর্তি হেসে উঠল, আমায় চিনতে পারলে না তুমি?

মহীতোষ মাথা নাড়ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে—

নারীমূর্তি : এই গহন বনে তুমি একলা ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

মহীতোষ : আমি বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না যে—

নারীমূর্তি : তোমার আপন বলতে কেউ কি নেই?

মহীতোষ : আছে, সবাই আছে। স্ত্রী, সন্তান, মা, বাবা, ভাই, বোন—

নারীমূর্তি : তারা সব কোথায়?

মহীতোষ : জানি না। আমি তো তাদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছি—

নারীমূর্তি : আমাকে কেমন দেখছ?

মহীতোষ : ভাল, খুব ভাল—

নারীমূর্তি : (হেসে) তোমার স্ত্রীর চাইতেও —

মহীতোষ : (মাথা হেঁট করল)

নারীমূর্তি : কি, আমার প্রশ্নের জবাব দেবে না?

মহীতোষ : আমি জানি না, জানি না—

নারীমূর্তি : বলো, কি বর চাও তুমি। তুমি যা চাইবে তা-ই দেব আমি—

মহীতোষ: আমি এই বন থেকে বেরুতে চাই—

নারীমূর্তি: (হেসে) শুধু এইটুকু! আর কিছু নয়। ভেবে ছাখো আর একবার—

মহীতোষ: (আর্তনাদের ভঙ্গীতে) ননা। আমি আর কিছু চাই না।

নারীমূর্তি: কেন, তুমি অর্থ চাও না! সুখ চাও না! নারীর ভালবাসা চাও না!

মহীতোষ: আমি যে ঠিক কি কি চাই তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না—

নারীমূর্তি সজোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে মূর্তিটা আগুনের শিখার রূপ ধারণ করল। খানিকবাদে দেখা গেল সামনে আর মূর্তিটা নেই। সেখানে একটা প্রকাণ্ড সাপ দাঁড়িয়ে আছে। মস্ত ফণা তুলে। ফণায় পদ্ম-চক্র আঁকা।

মহীতোষ ভয়ে পিছু হটতে লাগল। তারপর ঘুরে ছুটতে শুরু করল। কাঁটায় তার পা রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল। তবু দৌড়োতে লাগল। ক্রমশ তার চলার গতি শ্লথ হয়ে আসছিল। বনের লতাপাতায় পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। সে এগুতে পারছিল না।

এমন সময় মহীতোষের ঘুম ভেঙে গেল। তার সারা শরীর তখন বিদ্যুৎশূন্য। গলার ভাঁজে ঘাম জমেছে। হাত পা অসাড়। শুধু মস্তিষ্কের কোষে কোষে একটা তীব্র আলোড়ন স্পন্দিত হচ্ছিল।

অন্ধকার ঘর। রাত কটা ঠাহর করার উপায় নেই। অন্ধকারে সে একা। হাত বাড়িয়ে যে রঞ্জনকে ছোঁবে সে সাহসটুকু পর্যন্ত নেই। তার সারা শরীরে একটা ভয় তরল হয়ে ক্লেদাক্ত প্রাণীর মত চলাফেরা করতে লাগল।

শেষপর্যন্ত রঞ্জনকে ডিঙিয়ে মহীতোষ মাধুরীর কাছে এসে পৌঁছেছিল। মাধুরীকে ছুয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ডেকেছিল, মাধুরী, মাধু—

মাধুরীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একসময়। সে মহীরকারী উপস্থিতি টের পেয়ে কর্কশগলায় বলেছিল, একি, তুমি এখানে। আর

মহীতোষ বলতে চেয়েছিল, আমি, আমি ভীষণ ভয়। জানো, মাধুরী— াছ থেকে

মাধুরী তীক্ষ্ণতর গলায় বলেছিল, তার মানে! কিসের ভয় তার

মহীতোষের কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এসেছিল, সে আমি তোমাকে বুশের বলতে পারব না মাধু—

মাধুরী ক্রুদ্ধ সাপের মত ফুঁসে উঠেছিল, আমাকে ছেলেমানুষ ভেবেছ। ছিঃ ছিঃ, তুমি কি মানুষ! এই মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে—। আমি কি বেশ্যা—! সরে যাও বলছি।

মহীতোষের দুচোখ ফেটে জল নামছিল। সে তবু বলবার চেষ্টা করেছিল, বিশ্বাস করো মাধুরী—

মাধুরী এক ঝটকায় মহীতোষকে সরিয়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে একবার গর্জে উঠেছিল, সব তো নিয়েছ আমার। আর কি চাও তুমি। নির্লজ্জ, বেহায়া পুরুষমানুষ -

মহীতোষ তাড়া খাওয়া বন্যপ্রাণীর মত চার পায়ে হেঁটে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছিল। তারপর একখণ্ড বরফের মত পড়েছিল। অসাড়। রাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

মহীতে

নারীমূ

ছাখো আর

মহীতোষ

চাই না। .জং ডাইরেক্টর মুখার্জি সাহেব দ্বিতীয় দফায় দিল্লী থেকে এলেন মুখ কালো করে। এবারের ফাইনান্সিয়াল ইয়ারের শেষে দেখা গেল বাৎসরিক লোকসান দাঁড়িয়েছে ন' লাখ টাকা। অন্যান্যবারের চেয়ে লাখ তিনেকের মত বেশী। এই কারণেই অল্প দিনের ব্যবধানে দু-দুবার মুখার্জি সাহেবকে দিল্লীতে ধর্ণা দিতে হয়েছে। সরকারী অনুদানের অঙ্ক বাড়াবার তদ্বিরে। ছোটাছুটি আশাব্যঞ্জক হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সাফ জানিয়ে দিয়েছে—কুটিরশিল্পের খাতে অতিরিক্ত টাকা ঢালতে আর তারা রাজী নয়।

খবরটা কানে যেতে মাধুরী বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তার চাকরীর বয়েস এক বছরের কিছু বেশি। পার্মানেন্ট হতে এখনো অনেক দেরী।

আশঙ্কার কথাটা মাধুরী প্রথমে জানিয়েছিল সন্দীপকে। সন্দীপ যথারীতি অভয়বাণী দিয়েছে। বলেছে, তুমি তো আচ্ছা ভিতু। এতে ঘাবড়ে যাবার কি আছে। আমি তো এখানে প্রথম থেকেই আছি। এ প্রতিষ্ঠানের লাভ কি হয়েছে কোনদিনও। শুরু থেকেই লোকসানে চলছে। আমরা আছি না এ্যাদিন ?

মাধুরী বলেছে, এবারের মত লোকসান তো আগে কখনো হয়নি। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার এবার সরাসরি বলে দিয়েছে—তারা বরাদ্দ টাকার এক পয়সাও বেশি দিতে পারবে না—

সন্দীপ আদৌ মাধুরীর কথাটা গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। বলেছে, ও ওই রকম বলে। পরে ঠিক দেবে—

মাধুরীর দুর্ভাবনা সন্দীপের কথায় ঘোচেনি। বলেছে, কিন্তু, এভাবে ভিক্ষে করে কদ্দিন চলবে এই প্রতিষ্ঠান—

সন্দীপ বলেছে, লোকসান কি শুধু আমরাই করছি। খাস সরকারী সংস্থাগুলোর হাল দেখছ না। ওদের অবস্থাতো আরো কাহিল। আর ভিক্ষের কথা বলছ। কে ভিক্ষে করছে না বলতে পারো। জানো, —দেশ স্বাধীন হবার পর পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে আমাদের গভর্ণমেণ্ট কত হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে? তার হিসেব করলে দেখবে গোটা ভারতবর্ষটাই বাধা পড়ে আছে বিদেশের রাষ্ট্রগুলির কাছে—

মাধুরী সন্দীপের গালভরা যুক্তি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। বরং, উষ্মা প্রকাশ করেছে ওর কথায়, তোমার আছে কেবল বড় বড় কথা। আমি জ্বলছি আমার চিন্তায়—

সন্দীপ বলেছে, এই জন্যেই তো বলি—তোমার মন থেকে এখনো গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিদের আঁশটে ভাবনাগুলো দূর হয়নি

মাধুরী ওর কথার অভিপ্রেত অর্থটা বুঝতে চেয়েছে। বলেছে, তার মানে?

সন্দীপ হালকাচালে বলেছে, 'আমি তো অভয় দিলাম। বলছি—তোমার চাকরী খায় কোন শা—', বলেই জিভ কেটেছে সন্দীপ।

মাধুরীর রাগ বেড়ে গেছে তাতে, তুমি কোত্থেকে বুঝবে' বেশ আছ। খাচ্ছদাচ্ছ, ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছ। আমার মত প্রবেশন পিরিয়ড চলত তোমার। তা হলে বুঝতাম—

সন্দীপ তরল হতে চেয়েছে, এটা তোমার কিন্তু স্বার্থপরের মত কথা হল। তোমার চাকরী গেলে যে লোকসানটা সবচেয়ে বেশি আমার—

মাধুরী বলেছে, যাও, তোমার সব ব্যাপারেই ফাজলামো—

সন্দীপ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছে।

সত্যি, খবরটা পাবার পর থেকে মাধুরীর মনমেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। সন্দীপের কথায় গুরুত্ব দেয়নি। দেওয়া চলে না বলেই। সন্দীপ কোন ব্যাপারকেই সিরিয়াসলি নেয় না।

চাকরী চলে গেলে কি হবে। ভাবতে গিয়ে থই পায়নি মাধুরী। পুনর্মূষিক ভবঃ। আবার সেই সংসারের কুম্ভীপাকে গিয়ে পড়া! ক্লান্তিকর একঘেয়েমীতে নিজেকে সঁপে দেওয়া! অসহ্য!

চাকরী যখন করত না তখন এক কথা ছিল। মুক্তির আনন্দটা যে কি তা সে জানতই না। তখন তার অবস্থা—অন্ধের কিবা দিন কিবা রাতের মত। আর এখন আবার যথাস্থানে ফিরে যাওয়ার মানে, বন্দীকে কিছুক্ষণের জন্যে খোলা মাঠে ঘুরতে দিয়ে ফের কয়েদখানার চারদেওয়ালে নিক্ষেপ করার মতই।

দুর্ভাবনা থেকে অস্বস্তি আর অস্বস্তি থেকে বিরক্তি—এইভাবে মাধুরীর মনটা ছিঁড়ে ছত্রিশ হয়ে গেলে সেই বিরক্তিটা বিক্ষোভের আকার নিত। আর সেই বিক্ষোভ সে আর কাকে দেখাবে, পতি-দেবতা মহীতোষ ছাড়া।

দিনকতক তুচ্ছ কারণে সে মহীতোষকে আক্রমণ করত। মুখোমুখি হলেই মুখিয়ে উঠত।

বলত মাধুরী, সারাদিন ঘরে বসে শুয়ে গড়িয়ে কি করে যে কাটাও ভেবেই পাই না।

মহীতোষ বলত, কি করবো বলো। চেষ্টার তো কসুর করছি না। কত জায়গায় এপ্লিকেশন ছাড়লাম। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমার কপালই মন্দ--

মাধুরী তাতে আরো রেগে উঠত। বলত, ওসব কপাল-টপাল বাজে কথা। আসলে তোমার কোন উদ্যোগই নেই—

মহীতোষ আহত গলায় বলত, আমি জানতাম তুমিও একদিন একথা বলবে—

মাধুরী আরো নিষ্ঠুর হয়ে যেত, বলব না তো কি। তোমায় দেখলে হিংসে হয়। বেশ আছো। খাচ্ছদাচ্ছ ঘুমুচ্ছ। আর আমি উদয়াস্ত মুখে রক্ত তুলে মরছি—

মহীতোষ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারত না। বলত, ঠিক

আছে। আর কটা দিন দেখব। যদি কিছু না হয় তো একটা কিছু করবই। এ তুমি দেখে নিয়ো মাধু—

মাধুরী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলত, কি করবে শুনিই না।

মহীতোষ বলত, কিছুই যদি করতে না পারি ভিক্ষে করব। কুলি-গিরি করব!

মাধুরী তবু থামতে চাইত না, বলত, দেখা যাবে মুরোদ—

মহীতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলত, হ্যাঁ, তা-ই দেখে নিয়ো।

মহীতোষের ওপর হম্বীতম্বী করলেও মাধুরীর দুশ্চিন্তা হালকা হবার কথা নয়। শেষ পর্যন্ত না পেরে একদিন, যখন ডলি সরখেল ছিল না, মুখার্জি সাহেবের ঘরে ঢুকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিল, স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

মাধুরী বড় একটা মুখার্জি সাহেবের কাছ ঘেঁসে না। যা রাশভারী মানুষ। মুখার্জি সাহেব কিন্তু তাকে ভালভাবেই নিয়েছিলেন, বসুন মিসেস রয়।

প্রশ্নটা নিছক ব্যক্তিগত বলেই বাধো বাধো ঠেকছিল। মাধুরী বলেছিল, যদি কিছু মনে না করেন—

মুখার্জি সাহেব সহৃদয়তার সঙ্গেই বলেছিলেন, মনে করার কি আছে। বলেই ফেলুন না—

মাধুরী এরপর মুখ খুলেছিল, প্রতিষ্ঠানের যা অবস্থা। এখনো পারমানেণ্ট হইনি। বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। আমার চাকরীটা শেষপর্যন্ত থাকবে তো?

'হোয়াটস্' রাশভারী মানুষটা মাধুরীর প্রশ্নের নির্গলিতার্থ ধরতে চেয়েছিল।

না মানে, এবার লোকসান ন' লাখ টাকার ওপর। তাই ভাবছিলাম যদি চাকরী চলে যায়,—মাধুরী খোলসা করেছিল তার বক্তব্যকে।

মুখার্জি সাহেব মিটিমিটি হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, আমাদের চাকরী যদি থাকে তাহলে আপনারও থাকবে এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি মিসেস রয়—

মাধুরীর আর কিছুই জিজ্ঞাস্য ছিল না। সে সাহেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

সেদিন ছুটি হতেই সন্দীপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাধুরী। রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে ওকে ভরপেট খাইয়েছিল। একটা কলম প্রেজেণ্ট করেছিল।

তারপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে মাধুরী বলেছিল, চলো সন্দীপ, খানিকক্ষণ ময়দানে গিয়ে বসি। যা গরম পড়েছে। বাড়ি ফিরে তো সিদ্ধ হতে হবে।

সন্দীপ বলেছিল, উহুঁ, ব্যাপার-স্যাপার তো ভাল বুঝছি না। আজ হঠাৎ যে তুমি এতটা খুশি—

ওরা দুজনে গিয়ে একটা বড় অশ্বত্থ গাছের নিচে অন্ধকারে বসেছিল। মাধুরী বলেছিল, ব্যাপার আবার কি। এমনি। ভাল লাগল তাই এখানে এলাম।

সন্দীপ মাথা নেড়ে মাধুরীর কথাটাকে নাকচ করে দিয়েছিল, না, তা হতেই পারে না। প্রত্যেকদিন অফিস থেকে বেরিয়েই বলো— তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। শ্বশুরমশায়ের শরীর ভাল নেই। আজ হঠাৎ—

মাধুরী হাত দিয়ে সন্দীপকে নিজের কোলের মধ্যে শুইয়ে চুলের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিতে দিতে বলেছিল, তুমি তো আচ্ছা বেরসিক মানুষ। তুমিই না বলো আমার মন থেকে গেরস্থ বউঝিদের আঁশটে ভাবটা যায়নি। এখন দেখছি—

সন্দীপ আর ওকে কথা বলতে দেয়নি। দুহাতে মাধুরীর গলা জড়িয়ে নিচের দিকে টেনে এনেছে। মাধুরীও আপত্তি করেনি তাতে।

বরং, যথাসম্ভব নিচু হয়ে সন্দীপের ঠোঁটে পর পর কয়েকটা চুমু এঁকে দিয়েছে।

সন্দীপ সেদিন আরো দুঃসাহসী হতে চেয়েছিল। অন্ধকারে ওর দুহাত দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল।

মাধুরী মৃদু ভর্ৎসনা করে থামিয়ে দিয়েছিল ওকে, হচ্ছে কি! তোমাদের পুরুষমানুষের এই দোষ। বড্ড হ্যাংলা তোমরা। সবকিছু তাড়াহুড়ো করে পেতে চাও।

সন্দীপ বলেছিল কাতর গলায়, আর কতদিন অপেক্ষা করব মাধুরী?

'আর কতদিন অপেক্ষা করব', মাধুরী ভেংচে বলেছিল, খুব ফিল্মী নায়কদের মত কথা বলতে শিখে গেছ দেখছি। নাও এবার ওঠো তো। আমি যদ্দিন বলব তদ্দিন অপেক্ষা করবে। বুঝলে হাঁদা-গঙ্গারাম—

এখন মাধুরীদের সেক্সন ফাঁকা। মঞ্জু কাজের চাপ কমে যেতে এপ্রিলের শুরুতেই ফের জেনারেল সেক্সনে চলে গেছে। ডলি সরখেল নিজেকে নিয়ে মত্ত। ফলে সারাদিন মাধুরী সন্দীপের সঙ্গে গল্প-গুজব করার সুযোগ পায়। ডলি কখনো তাদের মাঝখানে এসে পড়ে। সেটা কোন মেয়েলি কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নয়। কে কোথায় কি করছে এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অবকাশ কোথায় ওর। ডলি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

এসেই বকবক করে। নিজের নতুন ভেঞ্চারের কথা বলে। রুদ্রকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ছোকরাকে ধরেছে ডলি। বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। কোন এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করছে। মাইনে ফোর ফিগারের। নিউ আলিপুরে বাড়ী। বিয়ে করেনি। বাপের টাকা পয়সা আছে প্রচুর। এক কথায় বলতে গেলে রীতিমতো শাঁসালো পার্টি। এখনো ঠিকমতো ডলি গেঁথে তুলতে পারেনি।

ডেটিং পর্ব চলছে। পার্ক ষ্ট্রীটের দামী হোটেলে গিয়ে স্যাংটো মেয়েমানুষের নাচ দেখা আর সেই সঙ্গে চাইনীজ ডিসে উদরপূর্তি করার পর্ব চলছে। অবশ্য দু'একদিন লিফ্‌ট দিতে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ডলির হাতফাত ধরেছিল। তার বেশী ওকে এগুতে দেয়নি ডলি। বেশ ভাল করে খেলিয়ে ওকে হাতের মুঠোয় আনতে চায় ডলি।

মাধুরী বলে, তোমার ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়। তবু বলি ডলি, এভাবে একের পর এক ছেলেদের সর্বনাশ করাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

ডলি সেকথা মানতে চায় না। বলে, আমি সর্বনাশ করার কে? ওরা নিজেরাই তো এগিয়ে আসে হ্যাল হ্যাল করতে করতে—

মাধুরী বলে, তাহলেও তোমার দিক থেকে এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়—

ডলি বলে, কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক তা আমি ভালই বুঝি মাধুরী। পুরুষ জাতটাকে আমি ঘেন্নার চোখে দেখি। ওদের কি হৃদয় বলে কোন পদার্থ আছে। তাই, ওদের ব্যবহার করতে চাই

মঞ্জুর সঙ্গে আজকাল কম দেখা হয়। হলেও মঞ্জু মাধুরীকে এড়িয়ে চলতে চায়। মঞ্জুকে দেখলে আজকাল চেনাই যায় না। কি চেহারা হয়েছে মেয়েটার। মুখটা পুড়ে যেন ঝলসে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে! মুখখানা সব সময় থমথমে। কয়েকদিন আগে ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল মঞ্জু। সময়মত হাসপাতালে পাঠানোয় বেঁচে গেছে। কথাটা ছড়িয়ে গেছে সারা অফিসময়। তারপর থেকেই মেয়েটা যেন বোবা হয়ে গেছে।

মঞ্জুর জন্য কষ্ট হয় মাধুরীর। অমন নিষ্পাপ সরল মেয়ে! গৌতম মিত্র মার্চ মাসের গোড়ার দিকে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিল আসামে। ওদের কোম্পানী গৌহাটিতে একটা নতুন শাখা কেন্দ্র খুলেছে। তারই

ইনচার্জ হয়ে। তখন পর্যন্ত মঞ্জু নিজের সব গোপন কথা মাধুরীকে বিশদ বলত।

একদিন মঞ্জুকে পাকড়াও করে পাড়ার পার্কে নিয়ে গিয়েছিল গৌতম মিত্র ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে।

গৌতম সব খুলে বলেছিল, আমি তো আসামে চললাম মঞ্জু—

মঞ্জু বলেছিল, কবে ?

গৌতম উত্তর করেছিল, আসছে মাসের গোড়ার দিকে।

মঞ্জু জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ আসামে কেন ? কোন আত্মীয়ের বাড়ি ?

গৌতম বলেছিল, না, অফিসের কাজে।

মঞ্জু প্রশ্ন করেছিল, ক'দিনের জন্য ?

গৌতম মলিন হেসে জবাব দিয়েছিল, কদিন-টদিন নয়, পাকাপাকি ভাবে থাকতে হবে গৌহাটিতে —

মঞ্জু চমকে উঠলেও নিজেকে যতটা সম্ভব শাসনে রেখে বলেছিল, কই, একথা তো আপনি আমাকে আগে বলেন নি !

গৌতম বলেছিল, আমিও কি জানতাম। হঠাৎ হেড অফিস থেকে নির্দেশ এল। আসামে আমাদের ভাল মার্কেট। কলকাতার অফিস থেকে সেই মার্কেট কণ্ট্রোল করা সম্ভব নয়। তাই গৌহাটিতে নতুন ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। আর সেই ব্রাঞ্চের ইনচার্জ হয়ে যাচ্ছি।

মঞ্জু কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলেছিল, তা আর লোক পেল না। হঠাৎ আপনাকেই বা পাঠাতে চাইছে কেন—

গৌতম বলেছিল, আমি পুরোন, অভিজ্ঞ কর্মী, তাই। তাছাড়া, হয়ত আমাকে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে—

মঞ্জু আড়াল ভেঙে ফেলেছিল, তা আপনি বলুন না—এখানে আপনার মা বাবা ভাই বোন সবাই আছে। হঠাৎ আপনার পক্ষে অতদূর যাওয়া সম্ভব নয় —

গৌতম বলেছিল, অতকিছু না বললেও চলে। ইচ্ছে করলেই আমি কলকাতায় থেকে যেতে পারি—

মঞ্জু পায়ের তলায় মাটি পেয়ে গিয়েছিল, তাহলে আপনি যেতে চাইছেন কেন?

গৌতম বলেছিল, ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা ভেবে। এখানে থাকলে চিরকাল আমাকে রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরী করেই যেতে হবে। ভবিষ্যতে উন্নতির সুযোগ এলেও সেটা আমি পাব না। কোম্পানী বলবে—তোমাকে তো আমরা একবার সুযোগ দিয়েছিলাম। সেটা নিলে না। বারবার তো একজনকে চান্স দেওয়া যায় না।

মঞ্জু কি বলবে বুঝে উঠতে পারেনি। নিরুপায় হয়ে শেষপর্যন্ত বলেছিল, তাহলে তো আপনার যাওয়াই উচিত।

গৌতম আর নিজেকে শাসনে রাখতে পারেনি। বলেছিল, তুমি যদি কথা দাও তাহলে আমি থেকে যাই মঞ্জু—

মঞ্জুর ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। সে বলেছিল, আমি! আমি কি কথা দেব আপনাকে।

গৌতম মঞ্জুর দুহাত চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল, তুমি বল্লে আমি যাব না মঞ্জু—

মঞ্জু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, কি ছেলেমানুষী করছেন বলুন তো। আমি কি বলব --

গৌতম অধীর হয়ে উঠেছিল, একবার বলো মঞ্জু,—তুমি আমার—

মঞ্জুর দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছিল, আমি তো আপনাকে গোড়া থেকেই বলে আসছি—ঘরে আমার অথর্ব বাবা মা অপোগণ্ড ভাইবোনেরা রয়েছে। স্বার্থপরের মত ওদের ভাসিয়ে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

গৌতম তবু বলেছিল, মঞ্জু, আমার দিকটা একবার ভেবে ছাখো—

মঞ্জু উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এভাবে আমাকে দুর্বল করে দেবেন না গৌতমবাবু।

তারপর হঠাৎ একদিন গৌতম মিত্র আসামে চলে গিয়েছিল। মার্চের শুরুতে। মঞ্জুকে কিছু না বলে কয়েই। মঞ্জু খবরটা পেয়ে মাধুরীকে বলেছিল, মাধুরীদি, আমি এতটা ভাবতে পারিনি। উনি আমাকে না বলে এভাবে চলে যাবেন—

মাধুরী বলেছিল, খুব ভুল করেছিস মঞ্জু। পুরুষের মন,—আঘাত পেলে ওরা আর পেছনের দিকে তাকায় না। মেয়েদের মত ধৈর্য-সহিষ্ণুতা ওদের নেই।

মঞ্জু কান্নাভেজা গলায় বলেছিল, আমি কিন্তু ওকে প্রথম থেকেই অন্যরকম ভেবেছিলাম। মানুষটার সংযম আর উদারতার তুলনা হয় না। কিন্তু ওর ভেতরটা যে এত নরম তা আগে বুঝতে পারিনি মাধুরীদি।

মাধুরী বলেছিল, ওইখানেই তো ভুল করেছিস মঞ্জু। যতই সংযমী আর উদার হোন, গৌতমবাবু রক্তমাংসের মানুষ তো। আর মানুষ বলেই তার আকাঙ্ক্ষা দুর্বলতা আছে। সেটা তুই ধরতে পারিসনি, এই যা।

মঞ্জুর কপালে অশেষ দুঃখ ছিল। এপ্রিলের মাঝামাঝি গৌহাটি থেকে এক মর্মান্তিক খবর এল। শিলং যাবার পথে এক জিপ-দুর্ঘটনায় গৌতম মিত্র মারা গেছেন।

সে সংবাদ শুনে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল মঞ্জু। চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিল মাধুরীকে, আমার জন্যেই মানুষটা চলে গেল মাধুরীদি। আমি যদি সে সময় ওর কথায় রাজী হয়ে যেতাম,—এই আত্মগ্লানি দূর করতে গিয়েই মঞ্জু ঘুমের বড়ি খেয়েছিল।

ইদানীং সংসারের কারুর সঙ্গেই মাধুরীর আর আগের মত সখ্যতা নেই। মাধুরী সাংসারিক ব্যাপারে যতটা নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে

সংসারের সকলে তার সঙ্গে ঠিক ততটাই দূরত্ব রেখে চলেছে। আগে প্রিয় ঠাকুরপো কাজে অকাজে সময় পেলেই উত্তরের ঘরে এসে বৌদির সঙ্গে দু'চারটে কথা বলত। সাংসারিক ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে সুহাসিনী পুত্রবধূর কাছে পরামর্শ চাইতেন। এখন সবাই মাধুরীকে এড়িয়ে চলছে। মাধুরীর ধারণা—সে যে সংসাবের দায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে অফিস করছে, গায়ে ফুঁ দিয়ে বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে—এটা কারুরই ভাল লাগছে না। মুখ ফুটে না বললেও হয়ত মহীতোষেরও এই রকম মনোভাব তার সম্বন্ধে।

একমাত্র ব্যতিক্রম ললিতমোহন। তিনি বরাবর সাংসারিক মালিন্যের ঊর্ধ্বে। প্রায়ই ডেকে মাধুরীকে কাছে বসায়। অফিসেব খবরাখবর জানতে চায়। মাধুরীর প্রতি তার স্নেহ আগের মতই অটুট।

মাধুরীর এতে কিছু আসে যায় না। বাড়িতে কতক্ষণ সময়ই বা সে থাকে। তবু, মাঝে মাঝে চারপাশের অনুচ্চারিত উপেক্ষা তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সংসার-ব্যাপারে তার মন বিষিয়ে ওঠে। সে যে তার প্রাপ্য মূল্যটুকু পাচ্ছে না—এই চিন্তা তাকে উত্যক্ত কবে।

ফলে ছোটখাটো ব্যাপারে পরিবারের এর ওর সঙ্গে প্রায়ই তাব খটাখটি লেগে যায়। কোন কোনদিন সেটা চরমে ওঠে।

এই তো সেদিন অফিস করে ফিরে ঘরে ঢুকতে সুহাসিনী এসে বলেছিলেন মাধুরীকে, একটা ক'া বলব বউমা -

মাধুরী খাটে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলেছিল, বলুন—

সুহাসিনী কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব নরম করে নিয়ে বলেছিলেন, বুড়োব শরীর ভাল নেই, তুমি যদি দিনকতকের জন্যে ছুটি নিতে—। আমি একলা আর পারছি না।

মাধুরী আজকাল সুহাসিনীকে ভাল চোখে দেখে না। তার ধারণায়—এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা মায়ের প্রশ্রয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মাধুরী তেতে উঠে জবাব দিয়েছিল, কেন, রান্নার লোক তো রেখেই দিয়েছি। আপনার এখন এত কি কাজ যে -

সুহাসিনী শান্ত স্বভাবের নির্বিরোধী মানুষ। তিনি আরো নরম হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, আমি তো সে-কথা বলছি না। বলছিলাম কি—তুমি পাশে থাকলে ভরসা পাই বউমা।

মাধুরী বলেছিল, এখন ছুটি! অসম্ভব। অফিসের অবস্থা ভাল নয়। এখন ছুটি চাইলে কর্তৃপক্ষ রেগে যাবে—।—আর তখন মাধুরী মনে মনে ভাবছিল ঃএকেই বাড়ি ফিরতে ভাল লাগে না, এ বাড়িতে শুধু নিরানন্দ আর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়া আর কি আছে। যতটুকু সময় সে বাইরে থাকে ততটুকু সময়ই মাধুরীর মনে হয় সে বেঁচে আছে।

সুহাসিনী মুখ কালো করে বলেছিলেন, অসুবিধা থাকলে বলছি না—

সুহাসিনী চলে যাচ্ছিলেন। মাধুরী এত সহজে হেরে যেতে রাজী নয়। সে বলেছিল, কেন আপনার মেয়েকে বলুন না। ও-তো আর ঠিক চাকরী করে না। দুদিন চারদিন হোমে না গেলে কি এমন ক্ষতি হবে—

সুহাসিনী নিম্নমুখে বলেছিলেন, কাকে বলব বলো বউমা, এখন কেউ কি আর আমার কথা শোনে।

সুহাসিনীর উক্তির মধ্যে একটা কটাক্ষের আভাস পেয়ে মাধুরী উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, এ-কথা কেন বলছেন মা। আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি?

সুহাসিনীকে মাধুরীর কথার উত্তর দিতে হয়নি। মাঝের ঘর থেকে স্বয়ং রেখাই চলে এসেছিল। দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লে কেন বৌদি? আমি কারুর সাতেপাঁচে থাকি না—

সারাদিন অফিস করার ক্লান্তি। তারপর রেখার এভাবে কথার মাঝখানে লাফিয়ে পড়া,—মাধুরী ক্ষেপে উঠেছিল। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলেছিল, এতে তোমাকে নিয়ে পড়ার কি দেখলে? আমি বলছিলাম —অফিস এখন ছুটি দেবে না আমাকে। বাবা বিছানায় পড়ে

আছেন! মা'র পক্ষে সত্যি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সবদিক সামলানো সম্ভব নয়। তাই তুমি যদি কয়েকটা দিন ছুটি নিতে—

রেখারও মন মেজাজ ভাল ছিল না। সজল আর আগের মত নেই—এই দুশ্চিন্তায় জর্জরিত সে। তাই মাধুরীর কথাটাকে আপসের মনোভাব নিয়ে সে দেখতে চায় নি। বলেছিল, বাড়িতে থাকি কি না থাকি সেকথা তুমি কি করে জানবে। তুমি তো সারাদিনই বাইরে বাইরে। মাকে জিজ্ঞেস করো না—বাবার শুশ্রূষা আমি করি কি না—

মাধুরীর মগজে যেন কেউ তরল আগুন ঢেলে দিয়েছিল। সে বলেছিল, তাই নাকি! করলেই ভাল। তবে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না—এটা বলে দিচ্ছি—

রেখা চোখ বড় করেছিল, বাঃ, এ যে দেখছি উল্টো চাপ দিচ্ছ বৌদি। তুমিই তো আগে আমার কথা তুললে। নইলে আমার বয়েই গেছে তোমার সঙ্গে কথা বলতে—

মাধুরী খাট থেকে নেমে রেখার মুখোমুখি হয়েছিল, আমি কতক্ষণ বাড়ি থাকি না থাকি এ কৈফিয়ৎ এখন থেকে তোমাকে দিতে হবে নাকি?

সুহাসিনী ঝড়ের আভাস পেয়ে দুজনের মাঝখানে পড়ে বলে উঠেছিলেন, আঃ থামবি রেখা! কি শুরু করেছিস তোরা।

রেখা সমানে পাল্লা দিয়েছিল, আমাকে কৈফিয়ৎ দেবে কোন দুঃখে? তবে জেনে রাখো আমরাও চোখ বুজে পথ চলি না। তোমার কতটুকু কাজ আর কতটুকু অকাজ—

মাধুরী আর নিজের মধ্যে ছিল না। বলেছিল, কি, এতবড় কথা! এত সাহস তোমার! আজ আসুক তোমার দাদা—

রেখা গোড়া থেকেই তার রাগকে সংযমের মধ্যে রেখেছিল। হেসে বলেছিল, দাদার ভয় দেখাচ্ছ বৌদি! দাদা কি করবে আমার।

মাধুরীর আর মাত্রাজ্ঞান ছিল না। চেঁচিয়ে উঠে বলেছিল,

আমার ব্যাপারে কেউ কখ্খনো নাক গলাতে আসবে না। আমার যা ইচ্ছে তাই করব-

রঞ্জন ঘরের মধ্যেই ছিল। চিৎকার তর্জন গর্জনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সুহাসিনীর কাছে ছুটে এসে কেঁদে উঠেছিল 'ঠাকুমা, ঠাকুমা' বলে।

ললিতমোহনেরও তন্দ্রা কেটে গিয়েছিল ওদের চিৎকার চেঁচামেচিতে। তিনি রোগকাতর কণ্ঠে অসহায়ের মত বলছিলেন পাশের ঘর থেকে, ও রেখা, কি হলরে—

প্রিয়তোষ তখন বারান্দায়। কুয়োতলা থেকে হাতমুখ ধুয়ে সবে উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। মাধুরীর শেষ কথাটা কানে যাওয়ায় সেও আর স্থির থাকতে পারে নি। কাছে এসে বলেছিল, এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না বৌদি। এক ছাউনির তলায় যখন আমরা আছি— তখন কেউ নিজেদের ইচ্ছে মত যা খুশি তাই কি করতে পারি ?

প্রিয়তোষ বরাবর বৌদিকে মান্য করে। ও যখন এগিয়ে এসেছিল তখন খানিকটা ভড়কে বগে ক্ষান্ত দিয়েছিল মাধুরা। থমথমে গলায় বলেছিল, তোমরা যখন সবাই আমার বিপক্ষে তখন আর আমার কিছুই বলার নেই ঠাকুরপো।

রাতে ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলে সুহাসিনী একবার এসেছিলেন এ ঘরে। বলেছিলেন, খেতে চলো বউমা—

মাধুরী রুক্ষ গলায় উত্তর করেছিল, আমার ক্ষিদে নেই। আপনি খেয়ে নিন—

সুহাসিনী বলেছিলেন, সেকি কথা ! সেই কোন সকালে চাবাট খেয়ে বেরিয়েছ —

মাধুরী বলোছল, বলছি তো ক্ষিদে নেই। মিছিমিছি—

সুহাসিনী চলে যাবার আগে বলেছিলেন, সব কথা বড় করে ধরলে কি আর সংসার চলে বউমা।

মাধুরীর কাছে সবটুকু স্পষ্ট হয়ে গি ছিল সেইদিনই রাতে।

আলো নিভিয়ে মহীতোষ বিছানায় উঠে আসতে। এ বাড়ির কেউ যে আর তার পক্ষে নেই এই সত্যটা।

মহীতোষ ডেকেছিল, মাধু, ও মাধু। ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

মাধুরী নড়ে চড়ে জানান:দিয়েছিল যে সে জেগেই আছে।

মহীতোষ ফের প্রশ্ন করেছিল, মা বলল—তুমি নাকি খাওনি। কেন। শরীর খারাপ?

মাধুরী তখন নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

মহীতোষ বলেছিল, কি হয়েছে মাধু। উত্তর দিচ্ছ না যে—

মাধুরী ফুঁসে উঠেছিল, আমার কথা জেনে তোমার কি লাভ—

মহীতোষ আঁচ করতে পেরে বলেছিল, বাড়ির কারুর সঙ্গে ঝগড়াটগড়া করেছ নাকি?

মাধুরী সশব্দে পাশ ফিরেছিল, হ্যাঁ, যত দোষ সব তো আমার—

মহীতোষ ওকে শান্ত করতে চেয়েছিল, আচ্ছা, কি হয়েছে—বলোই না।

মাধুরী বলেছিল, কি আবার হবে। তোমাদের সোহাগের বোন আমাকে আজ যা নয় তাই বলল—

মহীতোষ বলেছিল, কে, বেথা! হঠাৎ—

মাধুরী ওর কথাটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

মহীতোষ ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। বলেছিল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। কি হয়েছে খুলে বলবে তো। নইলে বুঝবো কি করে—

মাধুরী বলেছিল, খুলে বলার কি আছে। তুমি কি এর কিছু প্রতিকার করতে পারবে?

মহীতোষ এক গোঁ ধরেছিল, আচ্ছা বলোই না—

মাধুরী বলেছিল, অতশত বলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তবে

একটা কথা সোজাসুজি তোমায় বলছি -এ বাড়ীতে আর আমার একদণ্ডও তিষ্ঠোতে ইচ্ছে করছে না—

মহীতোষ আহত হয়েছিল মাধুরীর কথায়, ইচ্ছে না করলেও এখানেই থাকতে হবে যে ! তুচ্ছ কারণে এতটা রেগে গেলে কি চলে !

মাধুরীর এক গোঁ, আমার যা বলার তো বলেছিই—

মহীতোষ বলেছিল, তুমি কেমন পাল্টে গেছ মাধু।

মাধুরী ফের দেয়ালের দিকে পাশ ফিরেছিল। বলেছিল চাপা ক্ষোভের সঙ্গে, সকলেই আমার দোষ দেখছে।- তুমিই বা কেন বাদ যাবে। তুমি তো আর এবাড়ির আর সবাইয়ের চেয়ে আলাদা নও।

মহীতোষ আর কথা বাড়ায় নি। রঞ্জনের ওপাশে শুয়ে পড়েছিল। মাধুরী অনেক রাত অব্দি আশায় আশায় ছিল। মহীতোষ কাছে আসবে। তাকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। আদর করে তার রাগ জল করে দেবে এক সময়।

মহীতোষ কাছে আসেনি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মাধুরী জানেই না। স্বামীর ওপর ঘৃণায় রাগে অভিমানে মাধুরী জ্বলেপুড়ে মরছিল। ডলি সরখেলের একটা কথা তার মনে পড়ছিল—পুরুষ জাতটাই স্বার্থপর। আমি ওদের ঘেন্নার চোখে দেখি। ব্যবহার করতে চাই ওদের।

শুধু কি তাই। মহীতোষ অক্ষম। মহীতোষ ক্লীব। মহীতোষের কাছ থেকে তার পাবার মত কিছুই নেই। এসব ভাব তে ভাবতে মাধুরী ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

পরের দিন ছিল শনিবার। অফিসে এসেই সন্দীপকে বলে রেখেছিল মাধুরী, আজ তোমাকে কিছু জরুরী কথা বলব সন্দীপ। ছুটির পরে—

অফিস ছুটি হতে ওরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। ডলি সরখেল পিছু নিতে চেয়েছিল। শনিবার ও এবং মাধুরী সন্দীপের সঙ্গে

ছুটির পর কিছুটা সময় কাটায়। ওর নতুন ক্লায়েন্ট, নিউ আলিপুরের ধনীর দুলাল, ইঞ্জিনীয়ার ছোকরা কাজ করে হাওড়ার দিকে এক ফ্যাক্টরীতে। কলকাতায় পৌঁছুতে তিনটা সাড়েতিনটা হয়ে যায়। এই সময়টুকু ডলি ওদের সঙ্গে থাকে। প্রতি শনিবার।

আজ ছুটির আগেই মাধুরী ডলিকে কাটান দিয়েছিল। বলে রেখেছিল, দ্যাখো ডলি, আজ কিন্তু আমি আব সন্দীপ এক জায়গায় বেরুব। আজ আব সঙ্গ দিতে পারছি না তোমাকে –

ডলি মাধুরীর পেটেব খবর টেনে বের কবতে চেয়েছিল, কোথায় যাবে?

মাধুরী বলেহিল, ঠিক কবিনি, তবে যাব ফাঁকায় কোথাও। ওকে কিছু কথা বলার আছে আমাব।

ডলি বলেছিল, তুমি নেহাৎ-ই আনাড়ি মাধুরী। সাবাদিন ধরেই তো দেখি দুজনে ফিসফাস কবো। এত করেও তোমাব কথাব পর্ব ফুরোয় না—

মাধুরী বলেছিল, কি কববো বলো। সত্যিই আনাড়ী আমি।

ডলির কথায় বাখ্ ঢাক্ নেই। বলেছিল, দেখো ভালমত খেলো কিন্তু। সন্দীপ বড়ই খামখেয়ালী ধবনেব ছেলে—

মাধুরী হেসেছিল, দেখি কতদূব পাবি।

মাধুরীর কথায় কোন ভণিতা ছিল না। আব তাছাড়া ডলির সঙ্গে লুকোছাপা কবেও লাভ নেই কোন। ওব চোখ পাকা জহুরীর।

রাস্তায় নেমে সন্দীপ বলেছিল, কোথায় যাবে?

একটা মেরুণ রঙের শার্ট পড়েছিল সন্দীপ। পবনে কালো রঙের ট্রাউজার। মুখে সিগাবেট।

মাধুরী বলেছিল, চলো তো আগে চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিই—

আজকে ওরা সারকুলার বোডের দিকে না এগিয়ে ল্যান্সডাউনের দিকে গেল।

চা খাওয়া হয়ে গেলে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, এবার কোথায় যাবে? সিনেমায়?

মাধুরী বলল, আগে একটা ট্যাক্সি ডাকো তো—

সন্দীপ ছুটে একটা ট্যাক্সিকে দাঁড় করাল।

দুজনে ভেতরে উঠতে সন্দীপ বলল, কোথায় যাবে?

মাধুরী ট্যাক্সিচালককে বলল, সর্দারজী, বউবাজারের দিকে চলুন।

সন্দীপ বলল, বউবাজারে, কোথায়?

মাধুরী মিটমিটি হাসতে লাগল, কোথায় আবার। তোমার মেসে। কথা দিয়েছিলাম না একদিন যাব। মাধুরীর চোখের সামনে দিয়ে দোকান-পাট গাড়ি-ঘোড়া লোকজন- কলকাতা শহরটা ক্রমশ পেছন দিকে মিলিয়ে যেতে লাগল।

দোতলার এককোণে সন্দীপের ঘর। সন্দীপের ঘরের পাশে আরো দুটো ঘর। তালাবন্ধ। একপাশে ন্যাড়া ছাদ। সন্দীপ এ মেসের পুরোন বোর্ডার। একখানা ঘর নিয়ে আছে বহুদিন।

ভেতরে ঢুকে চারিদিকে চোখ ফেলে মাধুরী বলল, ঘরের একি ছিরি করে রেখেছ সন্দীপ। তুমি বড্ড নোংরা।—সত্যি, সন্দীপের ঘরখানা অপরিচ্ছন্ন। একেই পুরোন আমলের বাড়ি। নোনাধরা চুণবালি খসা দেয়াল। কড়িবরগায় মরচে ধরেছে। তারওপর মেঝেতে পুরু ধুলো। একটা মাথা ভাঙা কুঁজো উল্টে পড়ে আছে। বিছানার বালিশ তোষক অপরিস্কার। লণ্ডভণ্ড। এখানে সেখানে মাকড়সার জাল। ঘরের এককোণে একটা জনতা-কুকার। হাড়ি কড়াই। আমূল হোল মিল্কের কৌটো—আরো টুকিটাকি জিনিস।

মাধুরী হেসে বলল, বিছানার এ অবস্থা কেন। রাতে যুদ্ধটুদ্ধ করো নাকি?

ছুটির পর থেকেই মাধুরীর অদ্ভুত আচরণে সন্দীপ হকচকিয়ে গিয়েছিল। সন্দীপ আমতা আমতা করে বলল, না মানে—

মাধুরী গিন্নীবান্নীর মত কড়া গলায় বলল, একটা ঝাঁটা আনো তো—

সন্দীপের বাক্যস্ফুর্তি হচ্ছিল না। বলল কোনরকমে, ঝাঁটা! ঝাঁটা দিয়ে কি হবে?

মাধুরী বলল, বলছি, নিয়ে এসো—

সন্দীপ বাইরে বেরিয়ে নীচতলায় গেল। ঝাঁটার খোঁজে। ফিরে এসে দেখল—রণরঙ্গিনী মূর্তি মাধুরীর। খোঁপাটা আটোসাটো করে বেঁধে শাড়ির আঁচল গাছকোমর করে পরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাধুরী ঝাঁটা নিয়ে ঘর পরিস্কার কবতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সন্দীপ বলল, আমি এখখুনি আসছি—

মাধুরী বলল, আবার কোথায় চললে?

সন্দীপ বলল, কিছু খাবার নিয়ে আসি—

মাধুরী বলল, হাত মুখ ধোব, তার জল কোথায়?

সন্দীপ বলল, এসো, বাইরে ছাদেই কল আছে। দেখিয়ে দিয়ে যাই।—কলটা দেখিয়ে নিচে নেমে যাবার সময় সন্দীপ বলল, আমি এখখুনি আসছি। কাছাকাছি একটা ভাল দোকান আছে। চমৎকার ফিসচপ আর কাটলেট করে—

মাধুরী বলল, বেশী কিছু এনো না কিন্তু—

খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে অবাক সন্দীপ। কোন যাদুমন্ত্রবলে যেন ঘরের চেহারাটাই পাল্টে গেছে। ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টাওয়েল দিয়ে মাধুরী দেওয়ালের খোপে রাখা আয়নাটা পরিস্কার করছিল।

সন্দীপ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল, চায়ের জলও চাপিয়ে দিয়েছ—

মাধুরী বলল, দেব না, যা চা-খোর তুমি—

সন্দীপ ঠোঙাটা নামিয়ে রেখে একটা সিগ্রেট ধরাল। বলল, সত্যি, তুমি যাদু জানো দেখছি—

মাধুরী জানালার দিক থেকে মুখ ফেরাল না। বলল ওখান থেকেই, যা নোংরা করে রেখেছিলে। কি করে এভাবে থাকো—

মাধুরী টের পাচ্ছিল সন্দীপ কাছে এগিয়ে আসছে। সে ভ্রূক্ষেপ-হীন জানালার দিকে চোখ রেখে বলল, মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। জোর মেঘ করেছে—

সন্দীপের নিশ্বাসের স্পর্শ টের পাচ্ছিল মাধুরী। পেছন থেকে সন্দীপ বলল, চমৎকার হাওয়াও দিচ্ছে –

মাধুরী বলল, তুমি আজকাল আর ছবিটবি আঁকো না। সন্দীপ। ঘরে একখানাও ছবি দেখতে পেলাম না।

সন্দীপ পেছন থেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মাধুরীকে। আবেগ-জর্জরিত গলায় দায়সারা বলল, আঁকি না বহুদিন। তবে ভাবছি আঁকব এবার—

সন্দীপের হাত মাধুরীর বুকের ওপর ওঠানামা করছিল। মাধুরী ধমকের সুরে বলল, এই, কি হচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো আগে—

মাধুরীর কথাকটা সন্দীপের রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিল। সন্দীপের তর সইছিল না। সে নিচু হয়ে মাধুরীর ঘাড়ে পরপর কয়েকটা চুমু এঁকে দিয়ে বলল, দরজা তো ভেজানোই আছে। কেউ আসবে না এখন।

মাধুরী বলেছিল, তবু যাও, বন্ধ করে এসো। বলা তো যায় না—

দরজায় খিল তুলে ঘুরে দাঁড়াতে সন্দীপ দেখল জানালার দিক থেকে খাটের দিকে এগিয়ে এসেছে মাধুরী। ওর মুখে অদ্ভুতধরনের হাসি।

সন্দীপ কাছে আসতে ওর বুকে মাথা লুকোল মাধুরী। যেন সব-কিছু লুপ্ত করে দিতে চাইল ও। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। সন্দীপ ব্লাউজের বোতামগুলো চটপট খুলে ফেলল। কিন্তু ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপটা কিছুতেই খুলতে পারছিল না। মাধুরী ধমক লাগাল, তুমি

দেখছি কিছুই জানো না। - ডলির কথাটা মনে পড়ে যেতে হেসে বলল, একেবারেই আনাড়ি। দাঁড়াও খুলছি আমি—

সিলিং ফ্যানে ঘটাং ঘটাং করে একটা বিশ্রি শব্দ হচ্ছিল। মাধুরী খাটের ওপর বসে পড়ে বলল, ফ্যানটা বন্ধ করে দিয়ে এসো সন্দীপ। কি বিশ্রি শব্দ—

সন্দীপ সুইচ অফ করে ফিরে এলো খাটের কাছে। মাধুরী ওকে প্রলুব্ধ করল, দেখছ কি হাঁ করে? হ্যাংলা কোথাকার—

সন্দীপ পাশে বসে হ্যাংলার মত বলল, মাধুরী, তুমি এত সুন্দর!

মাধুরী আবার হেসে উঠে বলল, আহা, আর ন্যাকামো করতে হবে না। তুমি না বলেছিলে—আমার ফিগারটা খুব সুন্দর। মডেল হবার মত।

সন্দীপ ঝাপসা গলায় বলল, অন্যায় বলেছি কিছু?

মাধুরী উঠে দাঁড়াল। বলল, কি করে বুঝলে? আগে আমাকে দেখো পুরোপুরি -

সন্দীপ তাড়াহুড়ো করায় শাড়ির জট খুলতে সময় লাগল।

মাধুরী ওর গালে আলতো করে একটা চড় কসিয়ে বলল, হাঁদা গঙ্গারাম, কিছুই পারো না, এইটুকু বলে সে সায়ার দাড় খুলে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে ফেলল।

মাধুরীর শরীর থেকে একটা অদ্ভুতধরনের বুনো গন্ধ ফুটে বেরুচ্ছিল। ওর সোনার থামের মত উরু। এক জায়গায় চেরা চেরা দাগ থাকলেও তলপেটটা মসৃণ। সরু কোমর। স্তন ঈষৎ আনত হলেও নিটোল।

সন্দীপের রক্তে অন্ধকার অরণ্যের বাজনা বেজে উঠল! সে উঠে দাঁড়িয়ে একটানে মাধুরীর খোঁপাটা খুলে দিতে কালো মিশমিশে কোঁকড়া চুলের গোছা লকলকিয়ে নিচের দিকে নেমে এল।

সন্দীপ পাঁজাকোলা করে মাধুরীকে তুলে নিয়ে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে লাগল।

মাধুরী খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। ওকে ভয়ানক সুন্দর দেখাচ্ছিল।

মাধুরী বলল, আজ থেকে আমি তোমার সন্দীপ। আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করো—

ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল একসময়।

স্টোভে গরম জল ফুটে ফুটে শেষে এনামেলের বাটির তলায় সাদা সর পড়ছিল। ওদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না কিছুতেই।

সারা শরীর মন্থন করে মাধুরীর অভ্যন্তর থেকে কিছু শব্দ ছেঁকে তুলছিল সন্দীপ। আর মাধুরী, অসহ্য সুখে, আনন্দে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল সন্দীপের কাছে।

নয়.

সজলের কোন পাত্তা নেই। প্রতিদিন রেখা অপেক্ষা করে, আজ হোমে সজল আসবে। হোমে ঢুকে বেয়ারা রঘুকে জিজ্ঞেস করে রেখা, সজলবাবু এসেছিল ?—রঘু একই জবাব দেয়, না দিদিমণি।—প্রভা-পদকেও বলে রেখেছে রেখা—সজলকে যেন বলে দিনের বেলা আসতে। সন্ধ্যার পর এলে যদি সে হোমে না থাকে—, এই ভেবে।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। সজলের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বাড়ির অবস্থাও দিনে দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। অনুর কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না।

অনু আসছে না। সুহাসিনী ভেতরে ভেতরে কেমন ভেঙে পড়েছেন। মুখে কিছু বলেন না। শুধু চোখের জল মোছেন। মেজদা প্রায়ই থানায় যায়। অনুর কোন খবর নেই।

ললিতমোহনের অবস্থাও খারাপ। ডান পায়ের ঘা ক্রমশ বাড়ছে। রাতভোর চিৎকার করে পাড়া মাথায় তুলছেন।

বড়দার চাকরীর কোন সুরাহা হলনা। সকালের দিকে ঘরের পেছনের ফাঁকা জমিতে বাগান তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকে। এই এক ব্যাত্তিকে পেয়ে বসেছে বড়দাকে। দুপুরের দিকটায় অফিসপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে মাধুরী ধমকায়, রোদ্দুরে প্রত্যেকদিন দুপুরে কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াও! মিছিমিছি শরীর নষ্ট করছ। চাকরী যখন হবার ঠিকই হবে।—বড়দা সেকথা শোনে না। প্রতিদিন বেরোয়। দু'একদিন রেখা দেখেছে বড়দাকে। ভরদুপুরে হাজরা পার্কে। বেঞ্চে বসে ঝিমুচ্ছে।

মাধুরীর মেজাজ ক্রমশ তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। ইদানিং সুহাসিনীকে উপলক্ষ্য করে বাড়ির সবাইকে এ-কথাটা জানাতে মাধুরী আর কসুর করে না,—'অদ্ভুত এই বাড়ি! কি এক সংসারে এসেছি। ঘরের বউ হয়ে উদয়াস্ত খেটে সংসারের সকলের ভাতকাপড় জোগাব। আর বাড়ির লোকেরা গায়ে ফুঁ দিয়ে—। মরণ হলে বাঁচি।'

বৌদির কথাগুলো যে প্রধানত তাকে উদ্দেশ করে বলা একথা বুঝতে রেখার কষ্ট হয় না। অথচ মুখ ফুটে মাধুরীর কথার ওপরে দুটো কথা বলার মত ভাষা খুঁজে পায় না সে। সত্যিই তো, এক-সময় বড়দা বৌদির তাড়াতেই তার বিয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করে-ছিল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, পয়সা খরচ করে ঘটক লাগানো—বড়দা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। পাত্রও অনেকবার দেখতে এসেছে। সপ্তাহ ভর নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে রেখা। মুসুরির ডাল শশাকুচি দুধের সর বেঁটে মুখে মাখা, সুগন্ধি সাবানে শরীর নিকিয়ে তোলা, সারা দুপুর ঘুমিয়ে শরীরে মেদ আনার চেষ্টা—করেছে সবই। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে অষ্টরম্ভা। বরং দিনকে দিন সে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। মুখের ভাঙচুর ক্রমাগত বেড়েছে। চোখের গর্ত গভীর হয়েছে। স্তনদুটো শুকিয়ে গেছে ক্রমশ।

পাত্রপক্ষ রাশিকৃত খাবার ধ্বংস করে নিম্মুখে চলে গেছে। কত-বার যে রেখা সেজেগুজে এক হাট লোকের সামনে বসে অজস্র অস্বস্তি-কর প্রশ্নের জবাব দিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। দু'একজনের হয়ত বা পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তাদের দাবীদাওয়া এতই পাহাড় প্রমাণ যার জোগান মহীতোষ-প্রিয়তোষের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয়।

শেষে বাড়ির আর সবার মত রেখাও নিজের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে। বুঝে গেছে, এই পোড়া বাংলাদেশে রূপ না থাকলে মেয়ে-দের অশেষ দুর্গতি পোয়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেই কারণে সজলের সামান্যতম উদাসীনতায় রেখা চঞ্চল হয়ে ওঠে। যদিও সজলের ওপর তার আস্থা অগাধ, তবু ঘর পোড়া গরু তো। তাছাড়া

সজলের ব্যাপারে প্রথম থেকেই একটা আশঙ্কা রেখার বুকের ভেতর পাষাণের মত চেপে বসে আছে। সজল তার চেয়ে বয়সে ছোট। উপরন্তু তার রূপ নেই। তবু সজল তাকে ভালবাসে। সে ভালবাসায় কতটুকু সোনা আর কতটুকুই বা খাদ তার হিসেব রেখা জানে না।

শেষমেষ এক রবিবার রেখা মরীয়া হয়ে দমদমে গেল। সজলের বাড়িতে। ভরদুপুরে। দুপুরের দিকে বাড়িতে গেলে সজলের দেখা মিলবে, এই আশায়। এর আগেও রেখা কয়েকবার সজলের বাড়িতে গেছে। সজল যখন টিউটোরিয়াল হোমে কাজ করত তখন। সজলের মা বাবা ভাইবোনদের সঙ্গে অল্পবিস্তর আলাপ পরিচয় আছে রেখার।

সজলের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে রেখা আর কখনো ওদের বাড়ি যায়নি।

সজলের বাড়ি পৌঁছবার আগে রেখার রাগ অনেকটা জল হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল : কে জানে সজল কোন অসুখে পড়ল কিনা। এতদিন অভিমান করে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকা হয়ত তার পক্ষে ঠিক হয়নি।

কড়া নাড়তে মিনু দরজা খুলল। চোখ বড় করে বলল, ওমা, রেখাদি। এ্যাদ্দিন বাদে! পথ ল করে এলে নাকি? ভেতরে এসো।

ঘরের ভেতরে ঢুকে রেখা হেসে বলল, না রে। একদম সময় পাই না। তার ওপর যা শুনি,—তোমাদের পাড়ার অবস্থা নাকি খুব খারাপ?

রেখার সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে চিনু ছুটে এল।

মিনু বলল, কই না তো। আমাদের পাড়া অনেক দিন হল শান্ত—

রেখা কেঁপে উঠল। মনের ভেতর একটা হাল্কা ছায়া নামল। এবাড়িতে না আসার পেছনে তার দিক থেকে যেমন একটা সংকোচ ছিল, তেমনি সজলও তাকে পাড়ার অবস্থা খারাপ—এই দোহাই দিয়ে বাড়িতে আসতে বার বার নিষেধ করেছে। রেখা ভাবল : তবে কি সজলও চায় না যে সে এবাড়িতে আসুক!

সুখবরটা দিল চিনু, জানো রেখাদি, দাদার চাকরী হয়েছে।

খবরটা শুনে রেখা চমকে উঠলেও ভাবলেশহীন গলায় শুধোল, তাই নাকি। কবে?

মিনু বলল, এই তো, এই মাস থেকে—

রেখা দম চাপা গলায় বলল, কোথায়?

চিনু বলে উঠল, বাবার বন্ধু সুদামকাকা দিয়েছেন। খিদিরপুরে।

মিনু বলল, কাজটা বেশ মজার। কেবল জাহাজ দেখে বেড়ানো।

রেখা নির্ভাজ গলায় প্রশ্ন করল, দাদা বাড়িতে আছে?

চিনু বলল, না। অফিসের লোকজনদের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে গেছে।

সজলের চাকরী হয়েছে, -এর চেয়ে সুখবর রেখার কাছে আর কিছুই হতে পারে না। তবু, সে ততটা উৎফুল্ল হতে পারল না। বরং অভিমানে ফুলে উঠল। এত বড় একটা খবর। একমাস হতে চলল, খবরটা ফোন করে তাকে জানাতে পারল না সজল!

চিনু খুশি খুশি গলায় বলল, জানো রেখাদি, মাইনে আড়াই শ' টাকা। মিনু খেই ধরল, এখন টেম্পোরারী ঢুকেছে। তবে সুদামকাকা বলেছেন, বছরখানেকের মধ্যেই পার্মানেণ্ট হয়ে যাবে।

চিনু বলল, দাদা বলেছে, চাকরীর প্রথম মাসের টাকা পেয়ে আমাকে একটা ফ্রক কিনে দেবে।

মিনু বলল, আমাকে শাড়ি –

চিনু কথা টানল, বাবাকে চশমা—

রেখা চোখেমুখে উজ্জ্বলতা আনতে চাইল, তাই নাকি! খুব সুখবর তো। কি খাওয়াবে বলো?

রেখার সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে সজলের মা এলেন। ওর দুচোখ ফোলা ফোলা। বোঝা গেল ঘুমুচ্ছিলেন। ভেতরে ঢুকে আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে দিতে দিতে বললেন, কে! ও রেখা? এতকাল বাদে, কি মনে করে?

রেখা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তার হঠাৎ দুপুরবেলায় এবাড়িতে আসায় সজলের মা কি খুশি হন নি! ওর প্রশ্নে কিছুটা ঝাঁঝ ছিল।

মিনু ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে, আবহাওয়াটা স্বাভাবিক করার জন্যে বলে উঠল, বসো রেখাদি, চা করে আনছি।

রেখার বুকের ভেতরটা ব্লটিং কাগজের মত শুকিয়ে আসছিল। সে হাসতে চাইল, দুর্ পাগল! এই ভরদুপুরে চা!

সজলের মা বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বোসো—

রেখা খাটে বসল। আমতা আমতা করে বলল, অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয় না। পাইকপাড়ায় একটা কাজে এসেছিলাম। ফেরবার পথে ভাবলাম, আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাই,—কথাগুলো বানিয়ে বলতে গিয়ে রেখার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

সজলের মা মাথায় ঘোমটা টানলেন। বললেন, তা ভালই করেছ। তোমাদের বাড়ির সবাই ভাল আছেন তো?

রেখা নড়েচড়ে উঠল। দায়সারা বলল, একরকম

সজলের মা বললেন, সজলের চাকরী হয়েছে, খবর পেয়েছ তো?

রেখা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

সজলের মা চুপ করে গেলেন।

রেখা সহজ হতে চাইল, মেসোমশায় কোথায়?

সজলের মা মুখ বিকৃত করলেন, কে জানে কোথায় গেছে। ছুটির দিনে দুপুরে ঘরেই থাকতে চান না—

রেখা বুঝল সজলের মা এইখানেই কথার ছেদ টানতে চান। রেখা উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি মাসিমা। দুপুরবেলা এসে আপনাদের বিরক্ত করে গেলাম।

সজলের মা বললেন, না—না, তাতে কি হয়েছে। এদিকে এলে আবার এসো।

মিনু-চিনু রেখার সঙ্গে বড় রাস্তা অব্দি এসেছিল। বাসে

উঠবার আগে চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে রেখা মিনুকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার দাদার অফিসের ফোন নম্বরটা তোমার জানা আছে মিনু ?

মিনু ফোন নম্বরটা বলেছিল। রেখা নম্বরটা ডায়েরীতে টুকে নেবার সময় মিনু ফের বলেছিল, ফোন করে দাদাকে অফিসে পাওয়া মুস্কিল। বেশির ভাগ সময় ডকে থাকে—

বাসে উঠে খুঁজে পেতে সীটে বসে পাথর বনে গিয়েছিল রেখা। রেখার কেবলই মনে হয়েছে তার পায়ের তলা থেকে মাটি বুঝি সরে যাচ্ছে।

দিনকতক হাত গুটিয়ে বসে রইল রেখা। সজলের সাক্ষাৎ মনেপ্রাণে কামনা করলেও সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সে নিস্পৃহ রইল। বাড়িতে থাকলে ঘরের মধ্যে একচোরা বসে থাকে। ললিতমোহনের সেবা করে। যেচে কেউ কথা না বললে রেখা রা কাড়েনা। হোমে যায়। চুপচাপ নিজের কাজ সারে। বাড়ি ফিরে আসে। এক ধরনের বিপন্নতাবোধ রেখাকে ভেতরে ভেতরে দুর্বল করে ফেলে। সজলের সঙ্গে দেখা হচ্ছেনা দুঃখটা এই জন্য,—তা নয়। আঘাত পেয়েছে সে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সজল চাকরী পেল। এতদিনে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য হল ওর। এর পেছনে কি তার কোন ভূমিকা নেই ? যতই কাজ থাক, হোমের ফোন নম্বরটা তো সজলের অজানা নয়। একটা ফোন করে খবরটা তাকে জানাতে পারলনা! সজলের ওপর যে বিশ্বাস ছিল রেখার সেখানেই চিড়্ ধরে গেল। তবে কি সজল চায় না, তার চাকরীর খবরটা রেখা জানুক! যদি তাই হয়, তাহলে এতদিনের মেলামেশা ভাব-ভালবাসা সবই কি মিথ্যা। একটা খেলা মাত্র।

এদিকে বাড়ির অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠছে। প্রতিদিন বড়দা কালো মুখ করে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন। চাকরীর কোন সুরাহা হচ্ছেনা। ললিতমোহনকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সার্জন

বলেছে, অ্যাকিউট ডায়াবেটিস। প্ল্যাষ্টারে ভাঙা হাড় জুড়বেনা। —ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশন চলছে। হাড়মাংসে পচন ধরতে শুরু করেছে। ডাক্তারী ভাষায় যার নাম—গ্যাঙরিং। রেখার ধারণা বাবা আর বেশি দিন টিকে থাকবে না।

রেখার মনের অবস্থাটা আর কেউ না বুঝুক মাধুরী ধরে ফেলল। একদিন সকালে অফিসে বেরুবার মুখে রেখাদের ঘরে ঢুকে মাধুরী সরাসরি জিজ্ঞেস করল, সজলের কি খবর ঠাকুরঝি?

মাধুরীর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ ছিল না। রেখার প্রতি তার বিরাগ থাকুক, সজলের সঙ্গে ওর পাকাপাকি একটা কিছু ঘটে গেলে মেয়েটা বেঁচে যায়—হয়ত এই শুভেচ্ছাটুকু মাধুরীর এখনো আছে। রেখা নিস্পৃহ জবাব দিল, কোন খবর নেই।

মাধুরী দাঁড়িয়ে পড়ল, তার মানে? বিরহ-পর্ব চলছে নাকি?

রেখা হাসল, নাহ্। তেমন কিছু নয়। সজল চাকরী পেয়েছে। এখন আর আমার খবর নেবে কোন্ দুঃখে।

মাধুরী বলল, তুমি কোন খবর নিয়েছ? হয়ত কোন কাজে ও আটকা পড়ে গেছে—

রেখা ঝাঁঝালো গলায় বলল, না। সেদিন গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। শুনলাম পিকনিক করতে গেছে। চাকরী পেল। খবরটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করল না!

মাধুরী বলল, আহা। একবার ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেই দ্যাখো না। কি বলে—

বৌদির প্রস্তাবমত পরপর দুদিন ফোন করার পর তিন দিনের দিন সজলকে রেখা ধরতে পারল।

প্রথমটা সজল চিনতে পারেনি। রেখা বলেছিল, এই শুনছ?

সজল উত্তরে বলেছে, কে? কে বলছ?—তারপর কি একটা নাম বলেছিল। রেখা স্পষ্ট শুনতে পায়নি।

রেখা আর ভণিতা করতে সাহস করেনি। শেষে সজল যদি বিরক্ত হয়ে টেলিফোন ছেড়ে দেয়। সে বলেছিল আমি রেখা—

ওপাশ থেকে জবাব এসেছিল, ওহ্, তুমি। বলো কি খবর।

রেখা গম্ভীর গলায় উত্তর করেছে, আমার খবর ভালই। তুমি কেমন আছো?

সজল বলেছে, ভালই—

রেখা চোখ বড় করেছে, শরীর ভাল আছে তো?

সজল ওধার থেকে আমতা আমতা করে বলেছে, খারাপ কিছু নয়।

রেখা অভিমানহত গলায় বলেছে, চাকরী পেলে, আমাকে একটা খবর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলে না।

সজল গলার স্বর ভিজিয়ে বলেছে, হঠাৎ পেয়ে গেলাম। বলতে গেলে একদিনের নোটিশে চাকরী। তোমাকে জানাবার মত সময়ই পেলাম না—

—চমৎকার! চাকরী পেয়েছ একমাস হতে চলল। এর ভেতর একদিন সময় করে—

—সত্যি, বিশ্বাস করো রেখা। একদম সময় পাচ্ছিনা। হঠাৎ আমার বাবার এক বন্ধু সুদামকাকা চাকরীটা দিলেন। সারাদিন অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকি। সন্ধ্যায় আবার সুদামকাকার মেয়েকে পড়াতে বালিগঞ্জের দিকে যেতে হয়। মেয়েটি এবার প্রি-ইউনিভারসিটি পরীক্ষা দেবে—

—এদিকে পিকনিক করতে যাবার সময় তো বেশ পাচ্ছ।

—সবে চাকরীতে ঢুকেছি। অফিস স্টাফেরা ধরেছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। তাই—

—থামো, হয়েছে!

—বিশ্বাস করো রেখা—

—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছেনা। টিউটোরিয়াল হোমে একটা ফোন করলেও তো পারতে—

—বাহ্, হোমে ফোন করব কি। তুমিই তো ফোন করতে বারণ করেছ।

রেখা থেমে গেল। কথাটা মিথ্যে বলেনি সজল। প্রথম দিকে ও হোমে ফোন করেই ডেটিং করত। হরবিলাস ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে একদিন বলেছিলেন, কাজকর্ম ফেলে কেবল ফোন এ্যাটেণ্ড করতে থাকলে কাজের খুবই অসুবিধা হয় মিস রায়—

রেখা দমেনি, বলেছে, তা না হয় হল, একদিন বাড়িতে এলেও তো পারতে—

সজল জবাব দিল, কখন আসব। সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকি যে।

রেখা বলেছে, তাহলে কি তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হচ্ছে না ?

সজল খানিক চুপচাপ থেকে উত্তর করেছে, ঠিক আছে। আসছে রবিবার কলেজ স্ট্রীটে এসো। বেলা ছটোর সময়। ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের সামনে।

রেখা বলেছে, ঠিক আছে—

শিয়ালদা সাউথ সেকসনে কয়েকদিন হল ট্রেনের গণ্ডগোল চলছিল। রবিরার নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল রেখার।

সজলের কাছে এসে ওর শরীর ছুঁয়ে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রেখা বলল, কতক্ষণ এসেছ ?

সজল বলল, এই তো কিছুক্ষণ।

রেখা সজলের হাত ধরে টানল। বলল, চলো।

সজল শুধোল, কোথায় ?

রেখা বলল, কফি হাউসে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক।—রাস্তার মাঝখানে সজলের হাত ধরে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার রীতিটা রেখা সজলের কাছ থেকেই রপ্ত করেছে।

রেখার মনে আছে, ইউনিভারসিটির কি একটা পরীক্ষায় গার্ড দিয়ে গতবছর সজল গোটা পঞ্চাশেক টাকা পেয়েছিল। সেই টাকা দিয়ে তারা দুজনে এমনি এক রবিবার খুব ফুর্তিতে কাটিয়েছিল। চীনা হোটেলে ডিনার খেয়ে সাহেবপাড়ায় ম্যাটিনী শো সিনেমা দেখে ট্যাক্সি চেপে শিয়ালদা ফিরেছিল। সন্ধ্যায় সময়। ওয়েলিংটনের মোড়ে লালবাতি জ্বলে উঠতে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ডানদিকে ছিল একটা ডবলডেকার। অফিস ফেরৎ যাত্রীর ভিড়। পা দানিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। সেদিকে চোখ পড়তে সজলের মগজে হঠাৎ দুষ্টুমি চাড়িয়ে উঠেছিল। সে দ্রুত রেখাকে বুকের মধ্যে টেনে আধশোয়া করে এন্তার চুমু খেতে শুরু করছিল। ট্যাক্সি মৌলালীর কাছাকাছি আসতে সজল বলেছিল, দেখছিলে তো রেখা, আমি যখন তোমায় চুমু খাচ্ছিলাম বাসের লোকগুলো কেমন হ্যাংলার মত ড্যাবড্যাব করে আমাদের দেখছিল—

সজল বলল, কফি হাউসে নয়। সারাদিন ঘরে ছিলাম। এখন আবার ফের বদ্ধ জায়গায়। তার চেয়ে ফাঁকায় কোথাও চলো।

রেখা বলল, কোথায় যাবে ?

সজল বলল, চলো, কলেজ স্কোয়ারে গিয়ে বসি।

রেখা বলল, কলেজ স্কোয়ারে বড্ড ভীড়। তার চেয়ে চলো ধর্মতলার দিকে যাই। অনেকদিন গঙ্গার পাড়ে বেড়াই না—

সজল মাথা নাড়ল, না, অতদূর যাবনা, চারটের সময় আবার মণিমালাকে পড়াতে যেতে হবে।

রেখা বলল, মণিমালা কে ?

সজল জবাব দিল, সুদামকাকার মেয়ে। এই যা, তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয়নি। সুদামকাকা কি এমনি আমায় চাকরীটা দিয়েছে। ওর মেয়ে মুরলীধরে পড়ে। তাকে বিনাপয়সায় সপ্তাহে তিনদিন করে পড়াতে হবে—এই কড়ার করে তবে আমাকে চাকরীটা দিয়েছেন—

রেখা ফুট কাটল, শুধু এইটুকু ? আর কিছু নয় তো—

সজল চঞ্চল হয়ে উঠল হঠাৎ। বলল, ধ্যেৎ, কি আজেবাজে বকছ। চলো তো।

দীঘির উত্তরে ছায়া দেখে দুজনে বসল বেঞ্চে। রেখার উৎসাহ নিভে যাচ্ছিল ক্রমশ। সে ভেবেছিল, আজ সহজে সজলকে ছাড়বে না। কতদিন বাদে দেখা। অনেকক্ষণ সজলের সঙ্গে কলকাতার পথে পথে ঘুরবে।

সজল বলল, সারা সপ্তাহ যা খাটুনি। শুধু রোববারটা—

কথাটা রেখাকে যেন ছোবল মারল। সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, সত্যিই তো। একদম বিশ্রাম হয় না তোমার। আজকের দিনটা আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট না করলেই পারতে—

সজল রেখার কথায় তেতে উঠল, আশ্চর্য ! আমি কি সেকথা বলেছি ! তুমি কেমন যেন পাল্টে গেছ রেখা—

রেখা অভিমানে ফুঁসে উঠল, আমি, না তুমি ! চমৎকার বলছ। চাকরী পেলে একটা খবর দিলে না ! খোঁজ নিলেনা—কেমন আছি। আর উল্টো বলছ—

সজল নরম হল না। চড়াগলায় বলল, সে অন্যায় তো আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি যা শুরু করেছ—

রেখা সরে গিয়ে সজলের চোখে চোখ রাখল, তার মানে !

সজল গোমড়ামুখে বলল, পর পর তিন দিন অফিসে ফোন করলে। নতুন চাকরী। স্টাফেরা হাসাহাসি করে। দুপুরবেলা বাড়িতে গিয়ে হানা দাও—

রেখা বটুয়াটা বুকে চেপে ধরল। বলল, তোমার বাড়িতে যাওয়া কি এমন দোষের হয়েছে যে—

সজল মাথা নেড়ে বলল, আলবৎ হয়েছে ! হঠাৎ বলাকওয়া নেই তুমি গিয়ে হাজির। মা কি ভাবলেন—

রেখা হাসবার চেষ্টা করল, কি আবার ভাববেন। তোমার সঙ্গে

আমার একটা সিরিয়াস সম্পর্ক রয়েছে—এটা যদি ভেবে থাকেন তাতে ক্ষতি কি। কথাটা তো আর মিথ্যে নয়—

সজল গম্ভীর হয়ে গেল। চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো কোথাও গিয়ে একটু চা খাই। আমার আবার পড়ানোর সময় হয়ে গেছে।

বাড়ির অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে আসছে। বড়দার চাকরী জোটেনি। বাবার পায়ের ঘা ক্রমশ কোমরের দিকে উঠে আসছে। অমুর কোন খবর নেই। সুহাসিনী সারাদিন থেকে থেকে কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মোছেন।

হরবিলাস নানাভাবে জাল ফেলে যাচ্ছে। রেখা বুঝতে পারছে, এভাবে চললে ওর খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

সেদিন বৃহস্পতিবার। খাওয়াদাওয়ার পর খবরের কাগজ খুঁজতে ললিতমোহনের শিয়রের কাছে এসেছিল রেখা। বিছানায় পড়বার পর থেকে ললিতমোহনকে এই এক বাতিকে পেয়ে বসেছে। আগেও কাগজ পড়ার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তখন অন্তকারণে কাগজ পড়তেন। দেশ ছেড়ে এপারে চলে আসার সময় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ফেলে এসেছিলেন। এখানে এসে প্রথমদিকে ভেবেছিলেন, দেশবিভাগ ব্যাপারটা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। তাই প্রথম দিকে উচ্চবাচ্য করেন নি। শেষে যখন বুঝে গেলেন,—ভাঙা দেশ আর জোড়া লাগতে পারে না—তখন ওপারের ফেলে আসা জমির সঙ্গে এপারের কোন জমির বিনিময় করা যায় কিনা সেই চেষ্টায় তৎপর হলেন। সেইমত খবরের কাগজে জমি-বিনিময়ের কলমটা প্রতিদিন দেখতেন। মাঝে মাঝে এদিক সেদিকে চিঠি লিখতেন। কিন্তু ফল হয়নি কিছুই। ইদানীং, আবার ললিতমোহন কাগজের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা খুঁটিয়ে পড়েন। স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে। যদি আবার ফিরে যাওয়া যায় দেশে—এই আশায়।

কাগজটা নিয়ে পাশের খাটে শুয়ে পড়ল রেখা। ললিতমোহন ঘুমুচ্ছিলেন। মা, বাবার শিয়রের কাছে, দুপুরের বিশ্রামটুকু পর্যন্ত আজকাল চলে গেছে মার।

কাগজে চোখ বোলাতে ক্লান্তি এল রেখার। এদিকে ঘুমও আসছে না। আজ রেখার অফ-ডে।

পাশের ঘরে মাধুরী ছিল। তাদের মনকষাকষি ইদানিং কমজোরি হয়ে এসেছে। মাধুরী আজ অফিসে যায় নি। এঘর থেকে রেখা বলে উঠল, বৌদি যাবে নাকি ম্যাটিনী শোতে। পদ্মশ্রীতে নতুন বই এসেছে। আমি দেখাবো।

ওধার থেকে মাধুরী জবাব দিল, না ভাই ঠাকুরঝি, আজ যেতে পারছি না। বিকেলের দিকে একটু বেরুব। কাজ আছে।

কিছুক্ষণ বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে রেখা উঠে পড়ল। কিছুই ভাল লাগছিল না তার। শেষে উঠে কুয়োতলা থেকে মুখ ধুয়ে এসে সাজতে বসল। ঘরে বসে থাকলে ঘুম আসবে না। অনর্থক শুয়ে-গড়িয়ে আজেবাজে চিন্তা করে মন খারাপ করার কোন মানে হয় না।

বেলা তিনটে নাগাদ যাদবপুর থেকে ট্রেনে চাপল রেখা। বালিগঞ্জে এল। তারপর একটা চায়ের দোকানে ঢুকল গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য।

চা খেয়ে পথে নামল রেখা। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে পার্কের দিকে এল। সজল দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। রেখা বুঝতে পারছে, চাকরী পাবার পর থেকে সজল তাকে কেন যেন এড়াতে চাইছে। কেন চাইছে? ভাবতে গিয়ে মগজের ভেতরের চিন্তা ভাবনাগুলো সব তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। রেখা ফের রাস্তায় নামল। দক্ষিণমুখো হাঁটতে লাগল। তারপর একসময় এক ওষুধের দোকানে উঠে এসে চেয়ারে বসা ভদ্রলোককে বলল, একটা ফোন করব?

ভদ্রলোক রেখাকে একনজরে আপাদমস্তক জরিপ করে বললেন, করুন—

রেখা দ্রুত ডায়াল ঘোরাতে লাগল। সজলের সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যে ওধার থেকে কেউ একজন বলল, কাকে চান ?

রেখা বটুয়াটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, সজল চৌধুরী আছেন ?

কিছুক্ষণ বাদে সজল এসে ফোন ধরল।

রেখা কোন ভণিতা না করেই বলল, আমি রেখা বলছি—

সজল বলল, কি খবর। একদিন তো হোমে গিয়েছিলাম। তুমি ছিলেনা—

—হ্যাঁ, জানি—

—বলো, তোমার কি খবর ?

—আমার খবর জানতে তোমার কি কোন কৌতুহল আছে ?

—তার মানে !

—মানেটা জলের মত স্পষ্ট সজল। একটা কথা সরাসরি বলবে ?

— ব্যাপার কি ! খুব রেগে আছো দেখছি।

—সত্যি করে বলো তো, ইদানীং আমাকে কি আর তোমার ভাল লাগছে না ?

—কি যা-তা বকছ—

—যা-তা বকছি না। আমি সোজা কথাটা স্পষ্টভাবে জানতে চাই সজল।

—তোমার শরীর ভাল আছে তো রেখা ?

—এই কি আমার প্রশ্নের উত্তর হল ?

—তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না রেখা।

— আমার প্রশ্নের জবাবটা দেবে।

—অফিসে বসে তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয় রেখা।

—তাহলে আজ ছুটির পর ধর্মতলায়' এসো। ঘড়িঅলা বাড়ির সামনে—

—আজকে পারব না। মণিমালাকে পড়াতে যেতে হবে। সামনে ওর ফাইনাল পরীক্ষা—

রেখা ঝপ করে রিসিভারটা নামিয়ে দিল।

দিনকয়েক পরের কথা। রেখা গড়িয়াহাটে এসেছিল রঞ্জুর জন্য খেলনা কিনতে। সেদিন রবিবার। রঞ্জুর জন্মদিন। সময়টা সন্ধ্যা। বড় দোকান সব বন্ধ। গড়িয়াহাটের মোড়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে আসতে যেন সাপে কামড়াল রেখাকে। রেখা স্পষ্ট দেখতে পেল, ট্রাম লাইনের ওধারের ফুটপাত ধরে সজল একটি মেয়ের সঙ্গে দক্ষিণ-মুখো হাঁটছে। হাত ধরাধরি করে। মেয়েটির বয়স কুড়ির ভেতর। রেখার বুঝতে কষ্ট হল না, এই মেয়েটিই মণিমালা।

রেখা পেট্রোল পাম্পের সামনে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। ওর চোখের সামনে থেকে মুহূর্তে সব আলো যেন দপ্ করে নিভে গেল। কিংবা এমনও হতে পারে, কলকাতা শহরে আজকাল যা হামেশা ঘটছে, ইলেকট্রিক্ পাওয়ার ফেল করল বোধ হয়।

রেখার শরীর একটা পলকা গাছের মত কাঁপতে লাগল। মগজের ভেতর সাঁই সাঁই করে আগুন ছুটছে। বুকের মধ্যে একটা ভীষণ যন্ত্রণা পাহাড়ের মত জেগে উঠছে। চোখের সামনে কোন আলো নেই। রাস্তায় যানবাহন নেই। লোকজন নেই। নিষ্প্রদীপ অন্ধকার কলকাতা। যেন কোন এক রহস্যময় পুরী।

রেখা এগিয়ে কাছের ল্যাম্পপোস্টটা ঘেঁষে দাঁড়াল। পায়ের তলার মাটি টলছে। রেখা এপাশ ওপাশ চোখ মেলে তাকাল। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারল না। পাশে কেউ একজন তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, ফুল চাই, ফুল।

রেখা একবার ভাবল, বাড়ি ফিরে যাবে। কিন্তু, পরমুহূর্তে মনে হল, কোথায় তার বাড়ি। বাড়িতে কে কে আছে? ঘরে তার বাবা। কালান্তক ক্ষতব্যাধি নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছেন। বড়দা

মহীতোষ, বেকার আজ কতকাল হয়ে গেল—চাকরী জুটলনা, কোন-দিন জুটবেও না—এখনো বাড়িতে ঢোকেনি। রাস্তায় রাস্তায় অনির্দেশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা সুহাসিনী, এখন বেলা কত, সন্ধ্যা ছটা সাড়ে-ছটা, উনুনে ভাত চাপিয়ে গেটের কাছে বাতাবী লেবু গাছতলায় অপেক্ষা করে আছেন। কার অপেক্ষায়! মেজদার? কি জানতে চান সুহাসিনী? অমুর খবর? অমু কি বেঁচে আছে।

রেখা অন্ধকারে নির্ভয়ে রাস্তা পেরিয়ে বাস স্টপের কাছে এল। অন্ধকারে চারপাশের বাড়ি লোকজন যানবাহন কোন কিছুকেই স্বতন্ত্র করে চেনা যায় না। না, এখন বাড়ি ফেরা চলবে না। বাড়ি ফিরে কি লাভ। তার সত্যিই কি কোন বাড়ি আছে। ঘর আশ্রয় নিরাপত্তা!

রেখা দৌড়ে স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটায় উঠে পড়ল।

'নামল ভবানীপুরে এসে। অন্ধকারেও টিউটোরিয়াল হোমের বাড়ীটা চিনতে তার কষ্ট হল না।

রেখা ঋজু পায়ে দোতলায় উঠল। দারোয়ান প্রভাপদ গেটের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিল। রেখাকে দেখে বলল, দিদিমনি আপনি ছুটির দিনে—

রেখা বলল, হরবিলাসবাবু আছেন?

প্রভাপদ বলল, হ্যাঁ, তিনতলায়। বাবুর শরীরটা ভাল নেই।

রেখা প্রভাপদকে পাশ কাটিয়ে তেতলার সিঁড়িমুখে চলে গেল।

হরবিলাস খাটে শুয়েছিলেন। ঘরে হালকা সবুজ রঙের একটা ডুম আলো জ্বলছে। দরজা ঠেলে রেখা ভেতরে ঢুকতে হরবিলাস বলে উঠলেন, কে—কে?

রেখা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আমি, রেখা—

অন্ধকারে হরবিলাসের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, আলোটা জ্বালুন মিস রায়।

রেখা অন্ধের মত এগিয়ে এল, না থাক। আপনার কষ্ট হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

হরবিলাস একটা আদিম জন্তুর মত নড়েচড়ে উঠলেন। জানালার ওপাশে একফালি চৌকো আকাশ। কাছাকাছি কোথাও মাইকে হিন্দী ফিল্মের গান বাজছে।

রেখা ধীর পায়ে হরবিলাসের শিয়রের কাছে এসে খাটে বসে পড়ল। অন্ধকারে হরবিলাসের দু'চোখ ফসফরাসের মত জ্বলছে। রেখা হরবিলাসের কপালে হাত রাখল। বলল, ইস্, জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে।—হরবিলাস উঠে বসতে চাইল। একটা হাত এগিয়ে দিয়ে রেখার হাতটা ধরল।—রেখা বলল, কখন জ্বর এল?—হরবিলাস ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, আজ সকালে—।—রেখা বলল, প্রভাপদকে পাঠিয়ে আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন—।—হরবিলাস ততক্ষণে এগিয়ে দুহাতে রেখাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে চাইলেন আর ভূতে পাওয়া মানুষের মত ঝাপসা গলায় বলে উঠলেন, রেখা, রেখা—।—রেখার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। বেখা হাসতে হাসতে হরবিলাসের দিকে ঝুঁকে বলল, কি—কি—।—তারপর, জ্বরতপ্ত হরবিলাসের শরীর ক্রমশ আবৃত করে ফেলল রেখাকে। অন্ধকারে বেড়ালের মত হরবিলাসেব দুই চোখ জ্বলতে লাগল। রেখার কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কিংবা হাসতে। খুব জোরে।

ক্রমশ রেখার শরীরের ভেতব একটা সাপ পাক খেয়ে খেয়ে খেলা করতে শুরু করে দিল। হরবিলাস রেখাকে টেনে হিঁচড়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর তাব শরীরটাকে ভাগাড়ের শকুনের মত ছিবড়ে খুবলে ইচ্ছামত খেতে লাগলেন। রেখা খিলখিল করে হাসতে লাগল। রেখার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ধারা গড়াতে লাগল। চোখের সামনের অন্ধকার আরো গাঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল। নিকষ অন্ধকারে চতুর্দিকে নীল লাল সবুজ আলোর ফুলকি ছুটতে লাগল। বাইরে তখন একটানা মাইকে হিন্দী ফিল্মের গান বেজে চলেছে। রেখা শেষবারের মত আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল—'সজল, সজল' বলে। পারলনা।

দশ.

ক্রমশ যেন নিভে যাচ্ছে মহীতোষ। মন নেই তার কোন কাজে। নেই উৎসাহ, উত্তম। কিছুই ভাল লাগে না তার।

ইদানীং, বলতে গেলে, মহীতোষ ঘরবন্দী। এ অনেকটা স্বেচ্ছা-নির্বাসন। সকালে, টিউশনি বাজার ডাক্তারখানা,—ঘণ্টা আড়াইয়ের মত বাইরে কাটায় সে। বাদবাকি সময় বাড়িতে। কিছুদিন আগেও দুপুরের দিকে বেরুত। কাজের সন্ধানে। এখন বেরোয় না। ভাবে: কি লাভ। ঘোরাঘুরিই সার। আশার কথা বলে না কেউ।

বিকেলের দিকে, মাঝে মাঝে, রঞ্জন বায়না ধরে। বলে: চলো বাবা। আজ গ্রামের দিকে যাই। প্রকৃতি এখন আর আকর্ষণ করে না মহীতোষকে। মাঠ-প্রান্তর আকাশ জল-জংলা সূর্যাস্ত সব একঘেয়ে মনে হয়। অজুহাত দেখিয়ে ছেলেকে সে নিরস্ত করে। বলে: বর্ষাকাল। পথঘাট ভাল নয়। পুজোর পর আবার যাব।

বাগানের তদারকির ব্যাপারেও মহীতোষের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। কুমড়োর মাচা একদিকে হেলে পড়েছে। ডাটার জঙ্গলে ভরে গেছে ছাচতলা। ঠেকের অভাবে শশাগাছ মাথা তুলতে পারছে না। পোকায় ধরে বেগুনের চারা হেজে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মহীতোষের যে উদ্বেগ নেই—তা নয়। ভাবে: কাল থেকে ফের হাত দেওয়া যাবে বাগানের কাজে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। শেষমেষ দম পায় না।

মাধুরী অনুযোগ করে। বলে: পুরুষমানুষ। সারাদিন ঘরে। কি বিচ্ছিরি!—মহীতোষও বোঝে। তার এই স্থবিরত্বের পরিণাম ভাল নয়। তবে, বোঝাই সার। পথ খুঁজে পায় না। কিভাবে নতুন করে শুরু করবে। এম্নি ভাবতে ভাবতেই সময় বয়ে যায়।

তবে গুটিকয় ব্যাপারে তার মনঃসংযোগ বেড়ে গেছে। যেমন, সুহাসিনীকে সাধ্যমত সাহায্য করে সে। সুহাসিনীর চোখের দৃষ্টি খুবই কমে গেছে। ছানি পেকে টসটসে হয়ে উঠেছে। ভাল দেখতে পান না। কাজের গতি ধীর হয়ে এসেছে। রাতের দিকে কিছুই দেখতে পান না। অন্ধের মত হাতড়ান। তাছাড়া, দুর্বলও হয়ে পড়েছেন যথেষ্ট। প্রায়ই হাঁপে ধরে। তখন খানিকক্ষণ বসে পড়ে জিরিয়ে নেন। ডাক্তার বাবু বলেন: শরীরে আয়রনের বড়ই অভাব। তার ওপর কনস্ট্যাণ্ট নার্ভাস টেনসন। সুসার খাদ্য আর বিশ্রাম দরকার।—এসব কিছুই হবে না সুহাসিনীর। কোনদিন হয়ওনি। তাই, মহীতোষ যতটা পারে সুহাসিনীকে সাহায্য করে।

ললিতমোহন আর বেশিদিন নেই। পচন উর্ধাঙ্গে উঠেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কখন চোখ বোজেন। ওকে নিয়মিত ওষুধ পথ্য জোগানোর দায়িত্বের বেশির ভাগটা মহীতোষ সুহাসিনীর হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে।

সুহাসিনীর বড় ভরসা রেখা। রেখা আজকাল অন্যরকম। কেমন আগল বাগল, বেপরোয়া। সুহাসিনী চেঁচান: তোর কি হল রেখা! সন্ধ্যাবেলায় বিছানায় গড়াচ্ছিস। সারাদিন এলোচুলে ঘুরে বেড়াস। দিনদিন চেহারার কি ছিরি হচ্ছে। অমুর বিছানাটা একটু পেতে রাখলেও তো পারিস। কখন ফেরে ছেলেটা। কখনো বলেন: আজ ফিরতে এত রাত হল যে। এদিকে ঘরে একটা লোক মরতে চলেছে। বলিহারি তোদের আক্কেল!

রেখার উত্তর কখনো ধারালো। কখনো উদাসীন। কখনো বা তিক্ত।

রেখার মতিগতি ভাল বোধ হয় না মহীতোষের। আগের প্রাণোচ্ছল ভাবটা আর নেই। নেই সুহাসিনীর ব্যাপারে ওর সহিষ্ণুতা কিংবা সমবেদনা। কেমন রুক্ষ, বদমেজাজী হয়ে যাচ্ছে ও। এক একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বাথরুমে যাবার জন্য দরজা খুলে

বাইরে আসতে মহীতোষ দেখে—রেখা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। পায়চারী করছে। কিংবা কুয়োতলায়। মহীতোষের বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ে। সে শুধায়ঃ কে, কে ওখানে?—অন্ধকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর ছুড়ে দেয় রেখাঃ আমি।—মহীতোষ বলেঃ এত রাতে তুই!—রেখার উত্তর তৈরী থাকেঃ ঘুম আসছে না। তাই—

মহীতোষের ভয় হয়—মেয়েটা পাগল হয়ে যাবে না তো!

প্রিয়তোষকে আজকাল দেখাই যায় না বড় একটা। সারাদিন বাইরে বাইরে কাটায়। কিছুকাল আগেও ছিল হাসি খুশি, রোদ-মাখা, প্রাণবন্ত। যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ হাঁকডাকে বাড়ি মাতিয়ে রাখত। থেকে থেকে দক্ষিণের ঘর থেকে চেঁচাতঃ মা, চটপট এককাপ চা পাঠিয়ে দাও। বাজারে যাব। আজ মাংস আনব। লণ্ড্রী থেকে আমার টেরিকটের প্যাণ্টটা আনিস নি। এখন আমি কি পরে বেরোই।

এখন প্রিয়তোষ বাড়িতে থাকেই খুব কম সময়। যতক্ষণ আছে দক্ষিণের ঘরে। খাটে শুয়ে গড়াচ্ছে। স্নান খাওয়ার সময় ছাড়া ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া ভার। দায়ে না পড়লে কারুর সঙ্গে কথা বলে না।

মাঝে মাঝে সুহাসিনী গিয়ে উত্যক্ত করেন বলেনঃ কি রে, চা খাসনি! কখন দিয়ে গেছি।—কখনো চেঁচানঃ ও প্রিয়, প্রিয়, উঠবি না। বেলা যে এগারটা বাজতে চলল।—প্রিয়তোষ পাশ ফেরে। হাই তুলে আলস্য তাড়ায়। বলে ঘুম-জড়ানো গলায়ঃ শরীরটা ভাল নেই মা। মাথাটা বড্ড ধরেছে।—সুহাসিনী কথা শেষ করতে দেন না। ধমকে ওঠেনঃ যতসব বাজে কথা। এত বেলা অব্দি পড়ে পড়ে ঘুমুলে বয়সের ছেলে, শরীর ভাল থাকবে কি করে। হাত পা লেগে যাবে যে শেষকালে—

প্রিয়তোষ প্রতিবাদ করে না। ফের পাশ ফিরে শোয়।

মাধুরী এ সংসারে সবচেয়ে দলছুট। বনিবনা ওর কারুর সঙ্গেই নেই আজ বহুকাল। তবে, আগে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে রেখা

সুহাসিনীর সঙ্গে প্রায়ই ওর খটনটি শুরু হয়ে যেত। আজকাল সেটা আর হয় না। ওর সেই দাপাদাপা ভাবটা হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে গেছে। এখন মাধুরী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সংসারের ঝুটঝামেলা থেকে দূরে থাকে। ভাবটা: জীবনধারণের জন্য একটা মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই চাই, একটা পারিবারিক পরিচিতি চাই,—তাই আছি এ সংসারে। নইলে, তোমরা কেউ নও আমার!

মাধুরীর এহেন শান্ত, নিরুত্তেজ ভাবটা ভাল লাগে না মহীতোষের। শঙ্কা জাগে মনে। এর চেয়ে আগে যখন মারমুখী, খরতর ছিল—তখন মাধুরীকে অনেক স্বাভাবিক মনে হত তার। সংসারে নিজের দাবী এবং গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ও যতই নিষ্ঠুর কিংবা অকরুণ হয়ে উঠত না কেন—তার ভেতর দিয়ে ওর পারিবারিক অস্তিত্বের সজীবতা প্রকাশ পেত।

এখন, ভয়ঙ্কররকমের আত্মপর মাধুরী। নিজের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওর মাত্রাতিরিক্ত আত্মপরতা কখনো কখনো নির্লজ্জতার স্তরে পৌঁছে যায়। একটা ইলেট্রিক হিটার কিনেছে মাধুরী। সকালে বাড়ির খাবার বলতে রুটি-তরকারী। ওসব মুখে রোচে না মাধুরীর। ঘরে হিটার জ্বালায়। ডিমসেদ্ধ করে। সঙ্গে ওভালটিন খায় এক গ্লাস। অফিস ফেরতা আপেল মুসাম্বি লেবু—নানারকম ফল নিয়ে বাড়ি ফেরে। সকালে সেগুলো কেটেকুটে খোসা ছাড়িয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে পোরে। ওসব দিয়ে টিফিন সারে মাধুরী। রাতে শোবার আগে একগ্লাস হরলিকস না খেলে ঘুম আসে না ওর।

অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে সেই যে ঘরে ঢোকে আর বেরোয় না। বিছানায় গড়াগড়ি যায়। সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টায়। রেডিও খুলে বিবিধ ভারতী শোনে। এদিকে সুহাসিনী, ললিতমোহন আর রান্নাঘর—দুদিক যে কিভাবে সামলায় সে ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপও করে না।

রূপচর্চা আর রুচি বোধও আজকাল অস্বাভাবিক রকমের প্রখর

হয়ে উঠেছে মাধুরীর। নিত্য নতুন শাড়ি কিনছে। ব্লাউজের মাপ খাটো হয়ে আসছে ক্রমশ। মাসে মাসে নতুন নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে উঠছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বাহারি স্লিপারের সংখ্যা।

কোন জাতুমন্ত্রবলে মাধুরার বয়স যেন কমে গেছে। শরীর ঝলমলে হয়ে উঠছে দিনদিন, গায়ের রঙ উজ্জ্বলতর। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর। এক কথায় অপরূপ হয়ে উঠছে মাধুরী।

ইদানীং, যতই মনের দিক থেকে ভেঙে পড়ছে মহীতোষ, ততই মাধুরীর সঙ্গ কামনা করে তীব্রভাবে। অথচ, এগুতে ভয় পায়। সব সময় মাধুরী একটা কৃত্রিম দূরত্বের গণ্ডী কেটে মহীতোষকে হটিয়ে রাখে। সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ পায় না ওর ব্যবহারে। এর মধ্যে দু'একবার যে মহীতোষ মাধুরীর ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করে নি এমন নয়। খুচরো পারিবারিক প্রসঙ্গের জের টেনে মাধুরীকে কাছে টানতে চেয়েছে। কিন্তু, প্রতিবার মাধুরী শীতল উত্তরে নিজেকে প্রসঙ্গমুক্ত করে চলেছে। বলেছে: বাড়িতে এত লোক। তুমি, মা, প্রিয় ঠাকুরপো আছো। সংসারের ব্যাপারে আমি কি বলব। আমি এসবের কতটুকু বুঝি—

মহীতোষের উপস্থিতি যে তৃপ্তিকর নয় এটাও প্রকারান্তরে মাধুরী জানান দেয় মাঝে মাঝে। খুব মৃদুভাবে নিজের অস্বস্তির কথা প্রকাশ করে। যেমন, হয়ত মাধুরী অফিস থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছে। তখন মহীতোষও ঘরে। অপরিচিতার মত সলজ্জ হেসে বলে মাধুরী, তুমি যদি একবার বাইরে যাও, আমি তাহলে কাপড়টা ছেড়ে নিই। —যতই নরম করে বলুক না কেন মাধুরী—ইঙ্গিতটা ছোট্ট কাঁটার মত মহীতোষের বুকে গিয়ে বেঁধে।

রাত নটা বাজতে না বাজতেই মাধুরী খেয়ে নেয়। তখনো রঞ্জন ছাড়া বাড়ির আর কারুর খাওয়া হয়নি। ঘরে এসে অল্প কিছু প্রসাধন সেরে আলস্যে ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে বলে: ইস্। রাত দশটা

বাজতে চলল। বড্ড ঘুম পেয়েছে। আলোটা নিভিয়ে দিও কিন্তু—।

—মহীতোষ আলো নিভিয়ে বারান্দায় চলে যায়। ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগে না মাধুরীর।

কোন কোনদিন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় মহীতোষের। মশারী থেকে নেমে সে আলো জ্বালায়। দরজা খুলে বাথরুমে যায়। ফিরে এসে দরজায় খিল আঁটে। ইচ্ছে করেই আলো নেভায় না। মশারীর ভেতর ঢোকে। ঘুমন্ত মাধুরীর দিকে চোখ পড়ে। পলকহীন তাকিয়ে থাকে। শান্ত, নিদ্রিত মাধুরী। অনাবৃত মসৃন বুক। সারা শরীরে যেন জ্যোৎস্না ফুটছে। মুখে প্রসন্ন চাপা হাসি। রূপ কথার রাজকন্যাদের মত সুন্দর মাধুরী।

মাধুরীর দিকে তাকিয়ে অব্যক্ত বেদনায় জর্জরিত হতে থাকে মহীতোষ। এক সময় অনুচ্চ গলায় মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বলে ওঠে: মাধুরী তুমি এত সুন্দর। মাধুরী, মাধু—

পচন যতই মারাত্মক আকার ধারণ করছে ললিতমোহন ততই অন্য মানুষ হয়ে উঠছেন। মৃত্যু সুনিশ্চিত একথা যতই ললিতমোহন বুঝতে পারছেন ততই তিনি মনের দিক থেকে শক্ত হয়ে উঠছেন। সারা পায়ে দগদগে ঘা। ওয়াশ করার সময় চামড়ার ছাল উঠে আসে। রাতভর ঘুমতে পারেন না। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে জ্ঞান লোপ পায়। তবু, ললিতমোহনের মুখে এতটুকু কাতরোক্তি নেই। মহীতোষ অবাক হয়ে যায়। মানুষ হয়ে তিনি এতটা নীরবে সহ্য করেন কি করে!

ললিতমোহনের কথাবার্তার রীতি পাল্টে গেছে। মৃত্যুযন্ত্রণা কি মানুষকে তাহলে স্নেহকাতর করে তোলে? ললিতমোহনের হৃদয়ে সংসারের প্রতি এত ভালবাসা, এত মমতা যে লুকিয়ে ছিল তা আগে কখনো উপলব্ধি করেনি মহীতোষ। ওষুধ খাওয়াবার সময় হলে মহীতোষ ঘরে ঢুকে নরম করে ডাকে, বাবা—

ললিতমোহন চোখ মেলেন। দৃষ্টিতে ছায়া কাঁপে। বলেন, কে, মহী? আয়—

মহীতোষ শুধোয়, এখন কেমন বোধ করছেন বাবা?

ললিতমোহন হাসতে চান, বোধ! বেঁচে যখন আছি তখন বোধ তো আছেই। ভালই আছি রে।—

কাপে ওষুধ ঢেলে মহীতোষ এগোয় বাবার দিকে। বলে, খেয়ে নিন এটা—

ললিতমোহন বলেন, ওষুধ। দে—

মহীতোষ পায়ের তলায় মাটি পায়। ওষুধ ললিতমোহনের মুখে ঢেলে দিতে দিতে বলে, ওষুধ ইঞ্জেকসন পড়ছে। দেখবেন, ঠিক হয়ে যাবেন—

এমন সময় সুহাসিনী ঘরে ঢোকেন।

ললিতমোহন বলেন, মিথ্যে স্তোক বাক্যে ভোলাতে চাইছিস মহী! ওরে, ডাক্তারবদ্যি কি করবে আমার। অসুখটা কি আর মনে! আত্মার ভেতরে বাসা বেঁধেছে। এর কোন নিদান নেই—

পেছন থেকে সুহাসিনী বলে ওঠেন, এই আবার যত অলুক্ষুণে কথা সুরু হয়ে গেল—

ললিতমোহন ফের স্মিত হাসেন, ঠিক বলেছ সুহাস। অলক্ষণ। জানো না এখন ঘোর কলি। তুই কল্কি পুরাণ পড়েছিস মহী?

মহীতোষ মাথা নেড়ে বলে, না।

ললিতমোহন থেমে থেমে বলে চলেন, কল্কি পুরাণে সব লেখা আছে। কলিযুগে সৎ অসতের ভেদাভেদ থাকবে না। অনাচারী ম্লেচ্ছরা জগৎ শাসন করবে। রাজা আর রক্ষক থাকবে না। প্রজার সঙ্গে দস্যুর মত ব্যবহার করবে। অতিরিক্ত নারী সংসর্গ কামনায় পুরুষ ক্লীব হয়ে পড়বে। মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাবে। পাপে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মহীতোষ উত্তর করে না। ললিতমোহন বলেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, পাপ! হ্যাঁ, আমারও। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি—

মহীতোষ বলে, পাপ, আপনার! কি বলছেন বাবা—

ললিতমোহন থামেন না। বলেন একটানা, হ্যাঁ পাপ। একসময় দেশের জন্য প্রাণপাত করেছিলাম। স্ত্রীপুত্র পরিবারের কথা ভাবিনি। ভেবেছিলাম—সাদা চামড়ার মানুষগুলোকে এদেশ থেকে হটাতে পারলে মোক্ষলাভ হবে। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। হয়েছে কিছু? মাঝখান থেকে সংসারটাকে তচনচ করে দিলাম। পরপারে গিয়ে আমি কি জবাব দেব বলতে পারিস মহী?

মহীতোষ সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। বলে, ঘুমুবার চেষ্টা করুন বাবা। চিন্তায় চিন্তায় শরীর যে আরো খারাপ হয়ে যাবে—

ললিতমোহন কড়িকাঠের দিকে চোখ তোলেন। প্রলাপের ভঙ্গিতে বলেন, এড়াতে চাইলেই কি এড়ানো যায় রে। যা সত্য তা অনিবার্য। সত্যকে গোপন করতে গেলে সংকট আরো বেড়ে যায়। পারবি কি তোরা আমাকে বাঁচাতে। এই আমার নিয়তি, আমার ভবিতব্য মহী। একে হাসিমুখে মেনে নেওয়াই বরং ভাল—

সুহাসিনী চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

মহীতোষ তখন পালাতে পারলে বাঁচে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ললিতমোহন ডাকেন, শোন্ মহী।—মহীতোষকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। ললিতমোহন বলেন অনুনয়ের সুরে, তোর মাকে একটু চোখে চোখে রাখিস মহী। ওর শরীরের যা হাল দেখছি। ও যদি একবার পড়ে যায়—

ললিতমোহনের কথাটা চোখের সামনে ছবির মত প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে মহীতোষের বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে ওঠে।

ভাবতে গিয়ে সে-ও তল খুঁজে পায় না। সংসারটা ভেসে যাচ্ছে, তচ্‌নচ্‌ হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। বোঝাপড়া, সংহতি—কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সব বুঝেও হাত গুটিয়ে থাকে মহীতোষ। ভেতরটা শুধু পুড়তে থাকে। সময় গড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হয়—

সে কি বেঁচে আছে! শ্যাওলার মত স্রোতের নিচে পড়ে থাকা—এর নাম কি জীবন!

শেষ পর্যন্ত জেগে ওঠার মত একটা সূত্র খুঁজে পায় মহীতোষ।

সেদিন সকালের দিকে গণেশ এসে হাজির। গণেশকে দেখে পুলকিত হল মহীতোষ। বারান্দায় জলচৌকিতে বসিয়ে তোয়াজের সুরে শুধোল, তুমি হঠাৎ গণেশ, কি মনে করে।

গণেশ বলল, আগরওয়াল সাহেব আপনাকে ডেকেছেন। আজই একবার টিফিনের আগে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

কৌতূহলী মহীতোষ বলল, আজই কেন! কোন সুখবর আছে নাকি হে!

গণেশ উত্তর করল ভাবলেশহীন গলায়, সে রকম কিছু তো শুনিনি বাবু—

মহীতোষ গণেশকে কলোনীর বড় রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিল। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, কোম্পানীর অবস্থা এখন কেমন। ভাল কিছু বুঝছ গণেশ?

গণেশ বলল, তেমন কিছু তো বুঝছি না। আগামী মাসে নাকি কোম্পানী গুজরাটে নতুন অফিস খুলছে।

বড়রাস্তা থেকে বাড়ি—এই সংক্ষিপ্ত পথটুকুর মধ্যে অনেক কিছুই ভাবল মহীতোষ। গুজরাটের কান্দলা বন্দর থেকে চা রপ্তানী শুরু হয়ে গেছে। কলকাতার চা ব্যবসাকে অচল করে দেবার ষড়যন্ত্র এটা। জৈন এ্যাণ্ড মুরারকা কোম্পানীর বেশ কয়েকটা বড় পার্টি আছে—যারা চা এক্সপোর্ট করে। মহীতোষের ভাবনা পথ করে নিতে চাইল। তবে কি কান্দলার নতুন অফিসের ব্যাপারে আগরওয়াল সাহেব তাকে তলব করল! অসম্ভব নয়। কেননা, তারই রিপোর্ট অনুযায়ী মহীতোষ—'মোষ্ট ডিপেণ্ডেবল্ অ্যাণ্ড এক্সপিরিয়েন্সড্ হ্যাণ্ড।"

গুজরাট! কান্দলা! অনেক দূরের পথ। ভাবল মহীতোষ।

কোম্পানী অফার দিলে সে যাবে। এখানে পচে মরার কোন মানে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের কি কোন ভবিষ্যৎ আছে।

ঘরে ঢুকতে দেখল মহীতোষ—মাধুরী অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মহীতোষ না বলে পারল না, এই কিছুক্ষণ আগে আমাদের কোম্পানীর বেয়ারা এসেছিল—

মাধুরী আয়নার সামনে ঝুঁকে ঠোটে ঠোট ঘসে লিপস্টিকের জেল্লা তুলছিল। বলল, হ্যাঁ, দেখেছি—

মহীতোষ খবরটা চাপতে পারল না, কান্দলায় কোম্পানী নতুন অফিস খুলছে। আগরওয়াল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হয়ত আসছে মাসেই আমাকে কান্দলায় যেতে হবে—

মাধুরী আলগা কথা ছুড়ল, কান্দলা! সে আবার কোথায়?

মহীতোষ বলল, গুজরাটে।

মাধুরী ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে তুলে নিয়ে বলল দায়সারা, গুজরাট! সে তো অনেক দূরের পথ।

তারপর মাধুরী মহীতোষকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অফিসে পৌঁছুনোর পর মহীতোষ প্রচণ্ড আঘাত পেল। আগরওয়াল সাহেবের চেম্বারে পৌঁছুতে তিনি মহীতোষকে ক্যাশ-কাউন্টারে যেতে বললেন।

তারপরের পর্বটুকু সংক্ষিপ্ত। ক্যাশবাবু সইসাবুদ করে মহীতোষের হাতে একটা চেক ধরিয়ে দিলেন। সাকুল্যে একুশ শ' টাকার মত। চেকটা পেয়ে মহীতোষের বিশ্বাস আর প্রত্যাশার ভিৎ নড়ে গেল। নতুন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট তো দূরের কথা—চেকের অঙ্কের দিকে চোখ পড়তে মহীতোষের পিঠে যেন চাবুক পড়ল। টাকা পাবার ব্যাপারে মহীতোষের প্রত্যাশা ছিল খানিক বেশী। ইনকম্পলিট সার্ভিস। গ্র্যাচুইটি বেনিফিটের কথা সে কখনো ভাবেনি। তবে আশা করেছিল—এতকালের লয়াল এম্‌প্লয়ি সে। অবস্থাবৈগুণ্যে রিট্রেঞ্চড্ হয়েছে। কোম্পানী হয়ত দয়াপরবশ হয়ে কিছু বাড়তি টাকা দেবে।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পাওনা থেকে একটা আধলাও বেশি দেওয়া হয়নি। ক্যাশ-বাবুকে সে কথা বলতে তিনি মুখিয়ে উঠেছেন, বলেন কি! আরো টাকা। কোম্পানী প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাবদ তাদের কনট্রিউবিশনটা পুরো দিয়ে দিল,—এটাই বা ক'জনে দেয়। চলে আসার সময় আগরওয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা করাটাও প্রয়োজন বোধ করেনি মহীতোষ। অপমানে ক্ষোভে তার সারা শরীর তখন জ্বলছিল।

ফেরবার পথে কমলেশের একটা উক্তি ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যাচ্ছিল।

ছাটাই হবার কয়েকদিন পরের কথা। কমলেশ বলেছিল: রিট্রেঞ্চড্ হয়ে গিয়েও তোমার চৈতন্য হল না রায়দা। এখনো তুমি কোম্পানীর কাছে সিমপ্যাথি আশা করছ! বোর্ড অফ ডিরেক-টরদের হার্ট বলে কি কোন পদার্থ আছে। ওরা বোঝে শুধু প্রফিট। আয়ের ঘরে কমতি হল কি লাথি মেরে তাড়াবে। সে তুমি যতই লয়াল হও না কেন।

এই আঘাতটার প্রয়োজন ছিল মহীতোষের। একদিনে তার বিশ্বাস আর ধারণার ভিৎ নড়ে গেল। পৃথিবীটা যে কঠিন ঠাঁই, কারুর কাছে প্রত্যাশা করা যে বৃথা—এটা স্পষ্ট হয়ে গেল মহীতোষের কাছে।

সেই রাতে ঘুম হয়নি মহীতোষের। বিছানায় শুয়ে শুধু এপাশ ওপাশ করেছে। সে পরিষ্কার বুঝে গেছে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড বাবদ হাতে আসা একুশশ' টাকাই এখন তার বেঁচে থাকার একমাত্র মূলধন। সুতরাং, টাকা ক'টার সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায়—সেই চিন্তায় রাত কাবার করে দিয়েছে মহীতোষ।

পরের দিন সাত তাড়াতাড়ি স্নান খাওয়া সেরে মহীতোষ ছুটেছে কসবায়। পুরোন গেঞ্জীর কারখানায় গিয়ে হাজির হয়েছে। কারখানার ম্যানেজার অখিল দত্ত, এক কালের সহকর্মী, মহীতোষকে পেয়ে আপ্যায়নের ক্রুটি করে নি। বেয়ারা ডেকে চা বিস্কুট আনিয়েছে। কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করেছে।

খুচরো আলাপের পর আসল কথায় এসেছে মহীতোষ। সে অখিল দত্তকে জিজ্ঞেস করেছে—দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে তাদের গেঞ্জী-প্রতিষ্ঠানের সোল এজেন্সী পাওয়া যাবে কিনা।

অখিল দত্ত সদুপদেশ দিয়েছে তাকে। বলেছে, গোটা সাউথ ক্যালকাটার এজেন্সী নিতে হলে প্রচুর ডিপোজিট মানির দরকার। অত টাকা তুমি পাবে কোথায়। তার চেয়ে বরং একটা কাজ কর না মহাতোষ। তুমি তো যাদবপুরের দিকে থাকো। ওদিকে আমাদের মালের যথেষ্ট চাহিদা আছে। একটা দোকান খোলো না। আমি নাহয় ক্রেডিটে তোমাকে মাল সাপ্লাই করে যাব।

প্রস্তাবটা মনে ধরেছে মহীতোষের। তার পুঁজি সামান্য। তাছাড়া অখিল দত্ত যে পথ বাৎলে দিচ্ছে তাতে ব্যবসায়ে ঝুঁকি নেই বললেই চলে। বাকিতে মাল আনো, বিক্রি করো, তারপর পাওনা টাকা ফিরিয়ে দাও ফ্যাক্টরীকে।

তবু, প্রথমটায় দোনামোনা করেছে মহীতোষ। এ লাইনে তার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। শেষটায় ভরাডুবি না হয়ে যায়।

অখিল দত্ত সাহস জুগিয়েছে। বলেছে, অত পুতুপুতু করলে কি চলে! ব্যবসা করতে গেলে খানিকটা রিস্ক নিতেই হবে। আমি তো পেছনে আছি। ঘাবড়াবার কিছু নেই ব্রাদার।

মহীতোষ আমতা আমতা করে বলেছে, না, মানে, কি জানেন। আমি একেবারেই যে আনাড়ি।—অখিল দত্ত বলেছে, প্রথমে সকলেই আনাড়ি থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সব সড়গড় হয়ে যায়। অত ভয় পাচ্ছো কেন। তুমি অনেষ্ট, সিনসিয়ার। একবার লেগে পড়ো। দেখবে—রেজাল্ট খারাপ হবে না।

সেদিন রাতে খাওয়া দাওয়ার পর খাতা কলম নিয়ে বসেছে মহীতোষ। ট্রেডলাইসেন্স, দোকান ঘরের সেলামি, মাল রাখবার জন্য র‍্যাক, কাউণ্টার, ইলেকট্রিক অ্যারেঞ্জমেণ্ট, সাইনবোর্ড—ইত্যাদি বাবদ সম্ভাব্য কত খরচখরচা হতে পারে তার একটা খসড়া তৈরি করেছে।

মাঝখানে একবার ঘুম ভেঙে গেছে মাধুরীর। সে বিরক্ত গলায় শুধিয়েছে, কি ব্যাপার, ঘরে এত রাতেও আলো জ্বলছে কেন?

মহীতোষ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছে, একটু কাজে বসেছি।

মাধুরীর কণ্ঠস্বর ধারালো হয়ে উঠেছে, আজ সারারাত আলো জ্বলবে নাকি!—মহীতোষও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, তা এখন কি করে বলব। কাজ শেষ হলেই আলো নিভিয়ে দেব।

মাধুরী খানিকক্ষণ গজ গজ করেছে। মহীতোষের মাথায় তখন হাজার ভাবনা। সে অনায়াসে উপেক্ষা করেছে মাধুরীকে।

পরদিন সকালের দিকটা নিদারুণ ব্যস্ততায় কেটেছে মহীতোষের। বাজার সেরে ছুটেছে কলোনীর সেক্রেটারির কাছে। তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গিয়ে চড়াও হয়েছে যাদবপুর ব্যবসায়ী সমিতির এক মাতব্বরের বাড়ি। শেষপর্যন্ত এদিক সেদিক তল্লাসির পর একটা খালি দোকান ঘরের সন্ধান মিলেছে। ভাল পজিসানে দোকান। যাদবপুরের বাস রাস্তা আর ষ্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায়। দোকানী ভদ্রলোক রেলে চাকরী পাওয়ায় দোকান ছেড়ে দিচ্ছেন। সেলামী পাঁচশ টাকা। কথা পাকা করে বাড়ি ফিরতে দুপুর পেরিয়ে গেছে।

শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘরে ঢুকতে ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করেছে মাধুরী, এত বেলা অব্দি কোথায় ছিলে? সেই কখন বেরিয়েছ—

মহীতোষ জামা ছাড়তে ছাড়তে বলেছে নিরাসক্ত গলায়, জরুরী কাজে গিয়েছিলাম এক জায়গায়।—মাধুরী স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গের সুরে বলেছে, জরুরি কাজ! হঠাৎ তোমার কি এমন কাজ পড়ে গেল যে—। মহীতোষ দুই পা দাঁড়িয়ে গেছে। না বলে পারে নি, আমার কাজের কথা জেনে—তোমার কি লাভ!—মাধুরী থতিয়ে গেছে। মহীতোষ তাকে এ জাতীয় কথা বলবে—এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

মহীতোষ কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরেছে। কাঁধে গামছা চাপিয়েছে। তারপর মাধুরীকে অগ্রাহ্য করার জন্যেই যেন দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, মা ভাত বাড়ো। আমি কিন্তু এখুনি স্নান করে আসছি—

এগার.

হঠাৎ যেন মাধুরীর জীবনের গতি-ছন্দ কেটে গেল। অনেকটা চলতে চলতে আচমকা পথ হারিয়ে ফেলার মত। কয়েক মাস, সন্দীপের সঙ্গলাভের পর থেকে, সে ছিল শিকল-ছেঁড়া পাখি। ছিল না কোন পিছুটান। ছিল না বাধাবন্ধনের শঙ্কা। একটানা দেদার ভেসে বেরিয়েছে মাধুরী।

কিছুদিন হল ঘোর কাটতে শুরু করেছে মাধুরীর। অল্প অল্প করে বুঝতে পারছে—লক্ষ্যহীন ভেসে বেড়ানোটাও ক্লান্তিকর। থেমে থাকা যেমন একঘেয়ে—অবিরাম চলাটাও তেমনি অর্থহীন।

ছেলেবেলায় সে পাঠ্য বইতে পড়েছিল—মেঘ নিজের ঘনত্বের ভারে বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে না। তাকে বৃষ্টিবিন্দুর আকার পেতে হলে ধূলিকণার সাহায্য নিতে হয়। মাধুরী ভাবে—মানুষও তেমনি। একই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন সবাই। ভারহীন, কেন্দ্র-হীন বেঁচে থাকতে পারে না কেউ। ভেসে বেড়ানোটা ঠিক বেঁচে থাকা নয়।

সন্দীপকে ষোলআনা পেয়েও মাধুরী নিশ্চিন্ত নয়। গভীরভাবে না মিশে বাইরে থেকে মানুষকে কতটুকু চেনা যায়। সন্দীপকে এক নজরে দেখলে প্রাণবন্ত উজ্জ্বল দীপ্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু যতই ওর ঘনিষ্ঠ হচ্ছে মাধুরী ততই ওর স্বভাবের ভেতরের কাঠামোটা দেখে শঙ্কিত হচ্ছে। বড় খামখেয়ালী একরোখা আবেগপ্রবণ সন্দীপ। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের পাকে পাকে মাধুরীকে বেঁধে ফেলতে চায়। সে একটু বে-মতলব হলেই ক্ষেপে ওঠে সন্দীপ। ওকে হৃদয়হীন বলে মনে হয়। তখন ভাবে মাধুরী—আদতে ভালবাসাটাসা নয়—তাকে একজন রক্তমাংসের মেয়েমানুষের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিতে

রাজী নয় সন্দীপ। ডলি সরখেলের একটা কথা তার মনে পড়ে তখন। ডলি বলে: পুরুষ জাতটাকে চট করে বিশ্বাস করতে নেই। যদি করেছ তো মরেছ। তোমার শাঁসটুকু বের করে নিয়ে ছিঁবড়ে ফেলে দেবে। ওরা মেয়েদের যে কি চীপ্ ভাবে।

সন্দীপের কাছে মাধুরীর প্রত্যাশা অনেক। মানুষ তো আর দেহসার একটা জড় পদার্থ নয়। শরীরের একটা চাহিদা আছে ঠিকই। সেটা খুব বড় ব্যাপার নয়। অন্তত মাধুরীর কাছে। কেননা, বিয়ে হয়ে গেছে তার এক যুগ আগে। সেদিক থেকে পুরুষমানুষের কাছে মেয়েরা যতটা আকাঙ্ক্ষা করে মহীতোষের কাছ থেকে তার বেশির ভাগই পেয়েছে সে। সন্দীপের কাছে সে নিজেকে ধরা দিয়েছিল শারীরিক কারণে নয়। এক্ষেত্রে শরীর একটা অছিলা মাত্র। আসলে সে চেয়েছিল ওই সূত্রে সন্দীপের মত এক প্রাণবান যুবকের উষ্ণ সাহচর্য পেতে। কিন্তু শেষমেষ দেখা গেল—গলদ বিসমিল্লায়। সে যতটুকু চায় ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নয় সন্দীপ। বরং, তাকে উল্টো নিজের কামনাবাসনার চৌহদ্দির মধ্যে কয়েদ রাখতে চায়! এই ব্যাপারটা আজকাল মাধুরীর কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছে। অথচ, ফেরবার পথও খোলা নেই। মানুষ যখন—তখন সবাই চলছে। সকলে চিরকাল তার জন্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে—এরকম আশা করা অন্যায়। মহীতোষের ব্যাপারে এরকম অন্যায় প্রত্যাশা এতকাল ছিল মাধুরীর। সে ভাবত, ঘরে বাইরে দুনিয়াটা যতই পাল্টে যাক না কেন, একটা মানুষ—যার সঙ্গে তার এতকালের শোওয়া—বসা, সেই মানুষটা নিশ্চয়ই একই রকম রয়ে গেছে। তার ভালবাসা আর বিশ্বাসে কোন খাদ নেই। মহীতোষ সম্পর্কে এই জাতীয় ধারণা এতকাল সংস্কারের মত জড়িয়ে ছিল তার ভাবনায়। কিন্তু, কার্যত দেখা যাচ্ছে—দিনকতক হল সেই মহীতোষও কেমন বিগড়ে গেছে। তার ব্যাপারে আগের মত সহিষ্ণু আর নেই। তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আগের মত মূল্য দিচ্ছে না। সহজেই মহীতোষ এখন তাকে উপেক্ষা করছে।

এ এক অদ্ভুত সংকটে পড়েছে মাধুরী। এখন সে না ঘরকা না ঘাটকা। অনেকটা নীতিগল্পের একচক্ষু হরিণের মত। জলের দিকে বিপদের ভয় নেই ভেবে সে সজীব চোখটাকে ডাঙার দিকে রেখেছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত তার মৃত্যু ছুটে এল জলের দিক থেকেই।

সেদিন অফিস ছুটির ঘণ্টাখানেক আগে ডলি সরখেল এসে বলল, আজ আমার সঙ্গে একটু বেরুবে কি মাধুরী? অফ কোর্স যদি তোমার কোন কাজ না থাকে—

মাধুরী সন্দীপের অপেক্ষায় বসেছিল। সন্দীপ নিউ সেক্রেটারিয়েটে গেছে। অফিসের কাজে। বলে গেছে অপেক্ষা করতে। আজ ছুটির পর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে যাবার কথা। খাদি গ্রামোত্তোগ ভবনে। বাফতার শার্ট করাবে সন্দীপ। মাধুরীর রঙ পছন্দ করে দেবার কথা।

মাধুরী এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বলল, ওভাবে বলছ কেন ডলি। না যাবার কি হয়েছে। যদি তোমার খুব দরকার থাকে—

আসলে, প্রতিদিন ছুটির পর সন্দীপের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, ব্যাপারটা ক্রমশ পানসে মনে হচ্ছিল মাধুরীর। তাই স্বাদ বদলের জন্যই সে আগ্রহ দেখাল ডলির প্রস্তাবে।

ডলির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, কোন দিকে যাবে?

ডলি বলল, ধর্মতলায়।

মাধুরী বলল, ঠিক আছে। ছুটির পর আমাকে ডেকো—

ডলি বলল, ছুটির পর নয়, এক্ষুনি বেরুতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেণ্ট পাঁচটার সময়।

মাধুরী বলল, সেকি, এখন কি করে বেরুব—

ডলি বলল, সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি মুখার্জি সাহেবকে বলে রেখেছি।

ডলিকে এতটা বিমর্ষ গম্ভীর এর আগে কখনো দেখেনি মাধুরী। রিকসায় উঠে সে বলল, তারপর বলো, তোমার সেই ইঞ্জিনীয়ার মক্কেলটির কি খবর ?

মাধুরীর প্রশ্নে যেন ঘাবড়ে গেল ডলি। বলল, কার কথা বলছ ? অতনু দত্ত ?

মাধুরী বলল, নাম টাম তো জানি না। তোমার নতুন শিকারটির কথা বলছি।

ডলি হঠাৎ রেগে গেল। বলল ধারালো গলায়, হ্বাট স্কাউণ্ড্রেল। ওর কথা জানতে চেয়ো না মাধুরী। হি ইজ এ চীট, এ ক্রুয়েল বিষ্ট—

মাধুরী চুপ করে গেল। আর ঘাঁটাতে চাইল না ওকে।

ধর্মতলায় ওয়াছেল মোললার দোকানের সামনে এসে রিক্সা থামল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা বাড়িটার দোতলায় উঠল। ডান-দিকে লম্বা করিডোর। দুধারে সারি সারি কামরা। চার পাঁচখানা ঘর ছেড়ে ডানদিকের একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার মুখে একজন দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল। সে ওদের দেখে লম্বা সেলাম ঠুকে সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকবার পথ করে দিল।

ঝকঝকে তকতকে সুদৃশ্য ঘর। বাঁদিকে একসার চেয়ার। ডাইনে প্লাইউডের ছোট্ট ঘেরাটোপ একটা—চেম্বার মত। ওদের দেখে চেম্বারের ভেতর থেকে এক গৌরবর্ণ সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। পরনে পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ?

ডলি এগিয়ে গিয়ে একটু জোরের সঙ্গে বলল, কাল ফোনে কনট্রাক্ট করেছিলাম। আজ বিকেল পাঁচটায় আসতে বলেছিলেন—

মাধুরী বুঝল ভদ্রলোক কানে খাটো। বললেন, দাঁড়ান একটু।—তারপর চেম্বারের ভেতর ঢুকে একটা নোটবই নিয়ে বেরিয়ে এলেন। নোটবইয়ের পাতা খুলে বললেন, হ্যাঁ, এই তো। মিসেস ডলি সরখেল, তাই না ?

ডলি মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক বললেন, উনি পেসেন্ট?

ডলি হাসল, না, আমিই ডলি সরখেল। ইনি আমার কলিগ।

ভদ্রলোক উচ্চ গলায় ডাকলেন, ডক্টর বোস—

ভেতর থেকে এক মাঝ বয়সী দীর্ঘদেহী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

বৃদ্ধ বললেন, এর সঙ্গে যান মিসেস সরখেল। ইনিই আমাদের সার্জেন।

ডলির কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল, অনেকক্ষণ সময় লাগবে নাকি?

পানের রসে মরচে ধরা দুপাটি দাঁত বের করে বৃদ্ধ অভয় দিলেন, না, মামলা মিনিট কুড়ি পঁচিশের। তারপর কয়েকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে ছেড়ে দেব।

মাধুরী ডলির একটা হাত ধরে বলল, এই ডলি কোথায় যাচ্ছো?

সার্জেন মুচকি হাসল।

ডলি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, অতনু দত্ত আমার সর্বনাশ করেছে মাধুরী—

মাধুরীর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা চলকে উঠল, তাই বলে—

ডলি বৃদ্ধের দিকে তাকাল, আমার কলিগ বড়ই নার্ভাস।

বৃদ্ধ উত্তর করল না।

ডলি বলল, ব্যাগটা ধরো। এখানে বোসো মাধুরী। আমি এক্ষুণি আসছি। —কথা কটা শেষ করে সার্জেনের সঙ্গে ভেতরের দিকে চলে গেল ডলি।

অসহায় মাধুরী শুধোল বৃদ্ধকে, ওর কিছু হবে না তো?

বৃদ্ধ বিকারহীন গলায় বললেন, ঘাবড়াবার কিছুই নেই। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। সকালে জিভছোলা দিয়ে জিভ পরিস্কার করেন না, অনেকটা সেইরকম।

তারপরের আধ ঘন্টার মত সময় মাধুরীর যে কি দুরন্ত অস্বস্তিতে কেটেছে! চেম্বারের ওধারে পার্টিশন। পার্টিশনের ওধারে ডলিকে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃদ্ধ চেম্বারে ঢুকে পর্দা টেনে দিলেন। মাধুরী একলা বসে।

পার্টিশনের ওধারে ডলির কাতরোক্তির শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন একটা লোহার টেবিল সরাল। তারপর একটা ঘড়ঘড়ে যান্ত্রিক আওয়াজ। কলাইয়ের প্যানে ছুরিকাঁচি রাখার শব্দ। সবশেষে একটা বালতিতে তরল কিছু ঢেলে দিল যেন কেউ।

কিছুক্ষণবাদে ডলি ভেতর থেকে বেরিয়ে চেয়ারে এসে বসল। মাধুরীর পাশে। ক্লান্ত নিষ্প্রাণ চাহনি। যন্ত্রণাকাতর গলায় বলল মাধুরীকে, আমার ব্যাগটা খোলো। দুটো একশ টাকার নোট আছে— অপারেশন ফি আশী টাকা মিটিয়ে দিয়ে বৃদ্ধের নির্দেশমত পাশের ঘরে গেল মাধুরী। ও ঘরে ডিস্পেনসারা কম্পাউণ্ডার কিছু ট্যাবলেট আর একটা টনিক দিল।

সিঁড়ির কাছে এসে মাধুরী সব বুঝিয়ে দিল ডলিকে। কোন ওষুধটা কখন খেতে হবে। তারপর ডলির হাত ধরে সতর্কতার সঙ্গে নিচে নামতে নামতে বলল মাধুরী, খুব কি কষ্ট হচ্ছে ডলি?

ডলি হাসতে চাইল। বলল, না, তেমন নয়।

রাস্তায় এসে মাধুরী বলল, ছি-ছি, শেষপর্যন্ত একটা প্রাণকে নষ্ট করে ফেললে—

ডলি বলল আস্তে আস্তে, বাঁচিয়ে রেখেই বা কি লাভ হত মাধুরী—

অফিস ছুটির ভিড় শুরু হয়ে গেছে। মাধুরী ট্রাফিক পুলিশকে ধরে একটা ট্যাক্সি পাকড়াল। ডলি ট্যাক্সিতে উঠলে মাধুরী বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে?

ডলি বলল, তার আর দরকার হবে না। আমি একলাই যেতে পারব। তুমি আমার জন্যে আজ যা করলে মাধুরী—

মাধুরী ধমকে উঠল, আহ্, চুপ করো তো।

ডলির দুচোখ সজল হয়ে উঠল।

পরের দিন অফিসে যেতেই সন্দীপ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বলল, চমৎকার—কাল কি সুন্দর কেটে পড়লে ডলির সঙ্গে। আর আমি এদিকে নিউ সেক্রেটারিয়েট থেকে ট্যাক্সি করে ছুটে এলাম—

মাধুরী সন্দীপের অনুযোগ গায়ে মাখল না। উল্টো প্রশ্ন করল, ডলির সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিলাম এ সুসংবাদটা কে দিল তোমায়। মুখার্জিসাহেব ?

সন্দীপ বলল, না, দারোয়ান বলল।

মাধুরীর উত্তর সংক্ষিপ্ত, ও—

সন্দীপ রীতিমত রেগে উঠল। বলল, একটা জরুরি কাজ ফেলে ফালতু কাল তোমার জন্য ছুটে এলাম। এভাবে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ফেল করার কোন মানে হয় !

মাধুরী হাসল, তোমার আবার জরুরী কাজটা কি। সবসময় তো আমারই চারপাশে ঘুরঘুর করছ—

সন্দীপ চোখ পাকাল, আজেবাজে বলবে না। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

মাধুরী আর ঘাঁটাতে চাইল না। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না সন্দীপের। বলল, কি করব বলো। ডলি এমন করে ধরল—

সন্দীপ বলল, বুঝেছি। আর বাজে কাঁদুনি গাইতে হবে না। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে।

ছুটির আগে বেয়ারাকে দিয়ে সন্দীপকে ডেকে পাঠাল মাধুরী।

সন্দীপ এসে টেবিলের ওধারে দাঁড়াতে আদেশের ভঙ্গীতে বলল মাধুরী, বোসো—

সন্দীপের এখনো রাগ যায় নি। বলল, না। কি বলবার আছে বলো, আমাকে এখখুনি বেরুতে হবে।

মাধুরী শুধোল, কোথায় ?

সন্দীপ বলল, শিয়ালদয় যাব। ঘড়ির ব্যালান্সটা কেটে গেছে। সারাতে দিতে হবে।

মাধুরী বুঝল অজুহাতটা ছেদো। সে বলল, ভালই হল। আমিও যাব শিয়ালদ দিয়ে। শ্বশুরমশায়ের জন্য ফল কিনে নিয়ে যেতে হবে—

সন্দীপ বলল, ফল কিনতে শিয়ালদ যাবার কি আছে। যাদবপুরে নেমে কিনে নেবে।

মাধুরী মুচকি হাসল, না, যাদবপুরে ভাল ফলের দোকান নেই। তাছাড়া, শিয়ালদ দিয়ে ট্রেনে করে চলে যাব। রোজ রোজ বাসের ভিড় ঠেলে বাড়ি যেতে ভাল লাগে না।

সন্দীপ বলল, এখান থেকে শিয়ালদ যেতেও তো বাসে উঠতে হবে।

মাধুরী বলল, তুমি সঙ্গে আছো। বাসে যাব নাকি। ট্যাক্সি করবে—

সন্দীপ বেকায়দায় পড়ল। তবু বলল, কিন্তু আমার যে আবার মাঝখানে ওয়েলিংটনে একবার নামতে হবে।

মাধুরী এবার ফানুস ফাটাল, এখনও রাগ গেল না বাবুর। আর বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করতে হবে না। আমি যা বলছি তাই হবে। বুঝলে।

ট্যাক্সিতে উঠেই মাধুরী বুঝল—সন্দীপের রাগ জল হয়ে গেছে। সন্দীপ বলল, যাই বলো, এটা কিন্তু তুমি ভাল করো নি। হঠাৎ ডলির সঙ্গে কাল বেরিয়ে গেলে—

শিয়ালদ'য় এসে চৌরাস্তার মোড়ে নেমে ওরা মদের দোকানে ঢুকল। একটা হুইস্কির বোতল কিনল সন্দীপ।

রাস্তায় নামতে মাধুরী জিজ্ঞেস করল, মদের বোতলটা কার জন্যে কিনলে?

সন্দীপ সহজ সুরে বলল, কার জন্যে আবার! আমি খাব।

মাধুরী বলল, তুমি মদ খাও নাকি?

সন্দীপ বলল, খাই বইকি। আগে দোকানে গিয়ে খেতাম। সিঙ্গল রুম পাবার পর থেকে মেসেই খাই—

মাধুরী গম্ভীর হয়ে গেল, এসব নেশা কি ভাল ?

সন্দীপ বলল, ভাল মন্দ জানি না। আজকাল তো সবাই খায়। এমনকি স্কুলের ছেলেরাও—

মাধুরী বলল, কে খায় আর না খায় তা জেনে আমার কি দরকার। তুমি খাও—আজ এইটা জানলাম—

সন্দীপ মাধুরীর একটা হাত চেপে ধরল, যাবে না কি মেসে। তাহলে আজ তোমাকেও একটু টেষ্ট করিয়ে দিতাম—

সন্দীপের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মাধুরী, বেশ বললে ! ঘরের বউ, শেষে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরব ?

সন্দীপ ঝট করে তেতে উঠল, তুমি সব ব্যাপারেই এমন না না করো যে—

সন্দীপ আরো চটে যাবে জেনেও বলল মাধুরী, কি করব। তুমি যা বলবে তা-ই করতে হবে—এতো আর হয় না।

সন্দীপ বলল, তুমি দারুণ ব্যাকডেটেড মাধুরী—

মাধুরী হাসতে চাইল, হয়ত তাই।

সন্দীপ বলল, শুধু তাই নও, অসম্ভবরকমের অবস্টিনেট—

মাধুরী বলল, সে তুমি যা খুশি ইচ্ছে বলতে পারো,—মদ আমি মরে গেলেও খাব না।

মাধুরীর কথায় বোমা ফাটল যেন। সন্দীপ গলার স্বর বিকৃত করে সজোরে বলে উঠল, খাবে না তো খাবে না। এখন বাড়ি যাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে ফালতু বকবক করার মত সময় নেই আমার—

মাধুরী ওকে শান্ত করতে চাইল, মিছিমিছি এভাবে রেগে যাওয়ার কোন মানে হয়। আমার দিকটা তো একবার ভেবে দেখবে—

সন্দীপ হাত নেড়ে বলে উঠল, অতশত ভাববার মত সময় নেই আমার—। তারপর মাধুরীকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সন্দীপ।

বহুদিন বাদে গৃহকাতর মন নিয়ে বাড়ি ফিরল মাধুরী। ফিরে, যা ভেবেছিল তা-ই দেখল। নিষ্প্রাণ ভুতুড়ে বাড়ি। মহীতোষ রেখা প্রিয়তোষ কেউই ফেরে নি। ললিতমোহন মাঝের ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন পড়ে আছেন। সুহাসিনী রান্নাঘরে। রঞ্জনকে খাওয়াচ্ছে।

ফলের ঠোঙা হাতে নিয়ে মাঝের ঘরে ঢুকল মাধুরী। নিচু স্বরে ডাকল, বাবা—

ললিতমোহন চোখ মেললেন। বললেন, কে?

মাধুরী বলল, আমি বাবা—

ললিতমোহন বললেন, কে বউমা, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। এদিকে এসো—

মাধুরী ললিতমোহনের শিয়রের কাছের মিটসেফের মাথায় ফলের ঠোঙাটা রেখে বসল টুলে। খাট ঘেঁসে।

ললিতমোহন শ্লেষ্মাটানা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এই অফিস থেকে ফিরলে বউমা?

মাধুরী বলল, হ্যাঁ বাবা। —তাকিয়ে দেখল, ললিতমোহন কত শীর্ণ হয়ে গেছেন। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। কপালের দুধার বসে গেছে। মুখে কালচে ছাপ পড়েছে মৃত্যুর।

ললিতমোহন বললেন, সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছ। গাড়ি ঘোড়ার ভিড় ঠেলে ফিরে আসা—

ললিতমোহনের জন্য মাধুরীর বুকের ভেতরটা টলটল করে উঠল। রোগেতাপে বিধ্বস্ত ললিতমোহন এখনো অমলিন। অফুরন্ত ওর স্নেহ ভালবাসা।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, আজ ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?

ললিতমোহন বললেন, হ্যাঁ, এই তো কিছুক্ষণ আগে—

মাধুরী বলল, এখন কেমন বোধ করছেন বাবা?

ললিতমোহন আলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। বললেন স্বর কেটে, ভালো, ভালো বোধ করছি বউমা।

মাধুরী বলল, যন্ত্রণাটা কি আরো বেড়েছে ?

ললিতমোহন বললেন, না, একই রকম আছে।

মাধুরী বলল, মাথা টিপে দেব বাবা ?

ললিতমোহন বললেন, না-না। তুমি খাটাখাটুনি করে বাড়ি এলে। যাও ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করো।

মাধুরী তবু উঠল না। কিছুক্ষণ বসে রইল। নতশিরে।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতে দেখল মাধুরী—রঞ্জন বইখাতা বদলদাবা করে বেরুচ্ছে।

মাধুরী ডাকল, রঞ্জু, কোথায় যাচ্ছিস ?

রঞ্জন বলল, রাঙা জেঠুর কাছে। পড়তে—।—প্রতিবেশী রতনের বাবাকে ও রাঙা জেঠু বলে।

মাধুরী বলল, আজ আর তোকে যেতে হবে না।

রঞ্জন অধৈর্য হয়ে উঠল, বারে, সোমবার থেকে যে আমাদের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা—

মাধুরী বলল, আজ আমি যদি পড়াই তোকে, হবে না ?

রঞ্জনের বিশ্বাস হল না কথাটা।

মাধুরী হাত ধরে টানল। খাটে নিয়ে বসাল। বলল হেসে, দেখি বই খাতা বের কর—

পৌনে ন'টা নাগাদ রঞ্জন হাই তুলতে শুরু করলে মাধুরী বলল, আজ থাক। কালকে ভোর ভোর উঠে ফের পড়বি।

বিছানা করে রঞ্জনকে ডাকল মাধুরী, আয় তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিই—

রঞ্জন মাধুরীর পাশে শুয়ে পড়ল। মাধুরী গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল।

রঞ্জন এইটা হাই মেরে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, গান গাইতে হবে না। আমার বড্ড ঘুম পেয়ে গেছে—

নীরব হাসতে গিয়ে বুকের ভেতর একটা বড্ডা বুড়বুড়ি কেটে উঠল। ভাবল মাধুরী—রঞ্জনও তার থেকে কতটা দূরে সরে গেছে। একবছর আগেও গান না গাইলে ঘুম আসত না ছেলের।

খানিকবাদে সুহাসিনীর ডাকে চটকা ভাঙল মাধুরীর। দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে সুহাসিনী ডাকছিলেন, ও বউমা, ওঠো, তোমার ভাত বেড়েছি—

মাধুরীর ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বলল ঘুমজড়ানো গলায়, আজ আপনার সঙ্গে খাব মা—

খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে ঢুকে দেখল মাধুরী—মহীতোষ খাতা কলম নিয়ে চেয়ারে বসে। যথারীতি প্রতিদিনের মত কিসব লিখছে।

ভেতরে ঢুকে কোন ভনিতা না করেই মাধুরী সরাসরি জিজ্ঞেস করল, তাহলে গুজরাট তুমি যাচ্ছোই?

মহীতোষ মুখ তুলল। মাধুরীকে ভাল করে লক্ষ্য করল। তারপর বলল, সেই রকম কথাই তো হয়ে আছে।

মাধুরী বলল, অফিসকে ফাইনাল কথা জানিয়ে দিয়েছ?

মহীতোষ হালকাচালে উত্তর করল, মোটামুটি বলে রেখেছি। তবে ফাইনাল কথা জানাতে হবে মাসের থার্ড উইকে—

মাধুরী বলল, মা বাবার মত নিয়েছ?

মহীতোষ বলল, ওরা আমাকে কোন কাজেই বাধা দেন না। এ ব্যাপারেও দেবেন না আশা করছি—

ভাবতে গিয়ে মাধুরীর বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। সত্যি কি মানুষটা গুজরাট চলে যাবে। গৌতম মিত্রের কথা মনে পড়ে গেল মাধুরীর। একসময় সে-ই উপদেশ দিয়েছিল মঞ্জুকে। বলেছিলঃ পুরুষমানুষ বড় অভিমানী। একবার বেচাল হলে ধরাছোঁওয়ার বাইরে চলে যায়। তখন মাথা কুটে মরলেও ওদের ফেরানো যায় না।

বাধো বাধো গলায় বলল মাধুরী, গুজরাট। অনেক দূরের পথ। যাওয়াটা কি ঠিক হবে। সবদিক ভেবে দেখেছ তো?

মহীতোষ হাসতে হাসতে বলল, এখানে থেকেই বা কি লাভ। অনেক চেষ্টা তো করলাম। কিছুই হল না। তাছাড়া অফারটা যখন ভাল—

মাধুরী চুপ করে গেল। মুখ মুছে ড্রেসিংটেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। খোঁপা খুলল। চুল আঁচড়াতে লাগল।

পাশের বাড়ির রেডিওতে জাতীয় সংগীত বেজে উঠতে মনসংযোগ ক্ষুণ্ণ হল মহীতোষের। সে বলল, কি ব্যাপার। এগারটা বেজে গেল। শোবে কখন—

মাধুরী রাগত গলায় বলল, আমি জেগে থাকায় তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে?

মহীতোষের চোস্ত উত্তর, না, আমার অসুবিধের কি আছে। সকালের দিকে তোমার অফিস। সারাদিন খেটেখুটে এলে—

মাধুরীর মন কাচের মত টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। ইচ্ছা করলে মহীতোষের কথার একটা জোরদার উত্তর দিতে পারত সে। কিন্তু দিল না। চুপচাপ খাটে গিয়ে উঠল।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটা কথা ঘুরে ফিরে মনে হচ্ছিল মাধুরীর। সন্দীপের মত মহীতোষও বড়ই হৃদয়হীন, অকরুণ।

পরদিন অফিস ফাঁকা। ডলি দিন কয়েকের জন্য ছুটি নিয়েছে। সন্দীপও আসেনি। সারাদিন একা। সঙ্গীহীন বিশ্রি কাটল মাধুরীর। এর মধ্যে একবার জেনারেল সেকসনে গিয়েছিল। মঞ্জুর খোঁজে। মঞ্জু বেশ কিছুদিন হল আসছে না। মাধুরী বিন্দুবিসর্গ জানে না। জানার কথাও নয়। মাসখানেকের বেশি হয়ে গেল সে সন্দীপকে নিয়েই মত্ত।

জেনারেল সেকসনে গিয়ে শুনল সব। মঞ্জু খুবই অসুস্থ। ভুগছে মানসিক ব্যাধিতে। বাড়িতে নেই। লুম্বিনীতে ভর্তি হয়েছে। তা-ও প্রায় এক সপ্তাহের ওপর।

মাধুরীকে বিকেলের দিকে মুখার্জি সাহেব ডেকে পাঠালেন। মাধুরী চেম্বারে ঢুকতে বললেন, আপনি তো যাদবপুরের দিকে থাকেন, তাই না মিসেস রায়?

মাধুরী মাথা নাড়ল।

হাতের ফাইল ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বললেন মুখার্জি সাহেব, চলুন, আজ আপনাকে আমি লিফ্‌ট দেব। আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি—

মাধুরী ইচ্ছে করলে এড়াতে পারত। যে কোন একটা ছুতো দেখিয়ে। কিন্তু, সে সে-পথে গেল না। সারাদিন একা বাজে কাটছে। রাজী হয়ে গেল।

সামনের সীটেই বসল মাধুরী। মুখার্জি সাহেবের পাশে। গাড়ি ষ্টার্ট নিতে ছোট একটা প্রশ্ন করল মাধুরী, আপনি কোথায় যাবেন স্যার?

মুখার্জি সাহেব বললেন, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে—

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ নরেন্দ্রপুরে?

মুখার্জি সাহেব বললেন, ছেলেদের দেখতে। গত সপ্তাহে যেতে পারি নি। আমার দুই ছেলেই তো ওখানে থেকে পড়াশুনো করে—

খেয়াল হল মাধুরীর। ডলির কাছে শুনেছিল। মুখার্জি সাহেব বিপত্নীক। বছর তিনেক আগে স্ত্রী মারা যান। ব্লাড ক্যানসারে।

ওদের বাড়িতে রেখে পড়ান না কেন?—প্রশ্নটা করে মাধুরীর মনে হল—হয়ত অনধিকার চর্চা করে ফেলল সে।

মুখার্জি সাহেব রুষ্ট হলেন না। খানিক বিরতির পর, সারকুলার রোডে গাড়ি বাঁক নিলে, বললেন উদাস গলায়, বাড়িতে? বাড়িতে কে দেখাশুনো করবে ওদের। আমি থাকি বাইরে বাইরে—

মাধুরী প্রশ্নের সুরে বলল, কেন বাড়িতে আর কেউ নেই?

মুখার্জি সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন, না। থাকার মধ্যে আমি আর ঝি-চাকরেরা—

কথাগুলো শীতের উত্তুরে বাতাসের মত যেন গায়ে এসে বিঁধল মাধুরীর।

গড়িয়াহাটে এসে গাড়ি থেমেছিল কিছুক্ষণের জন্য। মুখার্জি সাহেব ছেলেদের জন্য কিছু কেনাকাটা করে নিলেন।

তারপর গাড়িতে উঠে ঢাকুরিয়া ব্রীজের কাছাকাছি আসতে বললেন, ছেলেদুটোর জন্যই তো আটকে গেছি। নইলে অ্যাদ্দিনে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়তাম কোথাও। কলকাতা শহর আর ভাল লাগে না আমার।

তারপর পাথরের মূর্তির মত বসে রইল মুখার্জি সাহেব। শুধু তার হাত দুটো ষ্টিয়ারিং-এ ওঠানামা করছিল। যাদবপুর আসতে মাধুরী বলল, আমাকে এখানে নামিয়ে দিলেই চলবে স্যার—

উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন দৃষ্টি মানুষটার। মাধুরীর কথায় চমকে উঠলেন তিনি, ও হ্যাঁ—

গাড়ি বাসষ্টপের কিছু আগে এসে থামল।

তিনদিনবাদে সন্দীপ অফিসে এল। এ'কটা দিন অস্বস্তিতে ছট-ফট করেছে মাধুরী। বাড়ি ফিরে গেছে সন্ধ্যার আগে। কোন কাজ নেই। দশটা প্রশ্ন করলে একটার উত্তর দিতে চায় না মহীতোষ। রঞ্জন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। পরীক্ষা চলছে। ললিতমোহনও রাত আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। সারাদিন তার ঘুম হয় না। রান্নাবান্না রাঁধুনীই করেযায়। মহীতোষ ফেরে সবার পরে। ফলে সময়ই কাটতে চায় না মাধুরীর। অফিসেও একই অবস্থা। ডলি এক সপ্তাহের ছুটিতে। তারওপর সন্দীপ আসছে না।

তাই সন্দীপ আসতেই মাধুরী হাতের কাজ ফেলে রেখে ওর টেবিলের কাছে গেল। বলল, কি ব্যাপার, এ'কদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে? আর আমি এদিকে—

সন্দীপ গোমড়া মুখে বলেছে, কেন আমার বুঝি কাজ থাকতে নেই।

মাধুরী বলেছে, সে কথা কে বলছে। আমি জানতে চাইছি—কোথায় গিয়েছিলে।

সন্দীপ বলেছে, বর্ধমানে গিয়েছিলাম। অনেককাল হয়ে গেল মাকে দেখি না—

মাধুরী কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। তাকে বাদ দিয়েও ওর যে একটা সামাজিক বন্ধন আছে—এদিকটার কথা ভুলেই গিয়েছিল মাধুরী।

মাধুরী বলেছে, আজ ছুটির পর কিন্তু বেরুব—

সন্দীপ বলেছে, তা কি করে হয়। আজ যে সাহেবের সঙ্গে বেরুবার কথা—

মাধুরী জিজ্ঞেস করেছে, সাহেবের সঙ্গে। কোথায়?

সন্দীপ বলেছে, সেণ্ট্রালের কে এক মিনিস্টার এসেছেন। গ্রেটইষ্টার্নে উঠেছেন। তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে—

এর ওপর আর কিছু বলা চলে না। মাধুরী বলেছে, তাহলে কাল বেরুব কিন্তু। আগেই বলে রাখছি।

সন্দীপ বলেছে, কাল কি করে হবে। কাল তো ছুটি। অফিসের অ্যানিভারসারি ডে—

তবু মাধুরী দমে নি। বলেছে জোরের সঙ্গে, হোক ছুটি। কালই বেরুব—

সন্দীপ হেসেছে, তোমার দিক থেকে অসুবিধে না থাকলে আমার কোন আপত্তি নেই—

মাধুরী ভেবে নিয়ে বলেছে, ঠিক আছে। তাহলে আজই মেসে ফেরার পথে মেট্রো থেকে কালকের ম্যাটিনী শোর দুখানা টিকিট অ্যাডভান্স কেটে রেখো।

সন্দীপ মাথা নেড়েছে।

মাধুরী তাতেও নিশ্চিন্ত হয়নি। বলেছে ফের, দেখো, মনে থাকে যেন। আমি কিন্তু আড়াইটার ভেতর গিয়ে হাজির হব।

সন্দীপ বলেছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে থাকবে। তোমার মত অত ভুল হয় না আমার।

পরদিন বেরুবার মুখেই বিপত্তি। পায়ে চটি গলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ খুঁজছিল মাধুরী। এমন সময় মহীতোষ ঘরে ঢুকল। হাতে একটা পলিথিনের প্যাকেট। রোদে পোড়া মুখ।

মাধুরীর দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল মহীতোষ, ধরো এটা—

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, কি আছে এতে—

মহীতোষ বলল, খুলেই ত্থাখো না।

মাধুরী প্যাকেট খুলল। ভেতরে একটা ফুল ভয়েলের শাড়ি। চমৎকার প্রিণ্ট।

মহীতোষ জামা ছাড়ছিল। মাধুরী বলল, হঠাৎ শাড়ি। আমার জন্যে ?

মহীতোষ বলল, আর কার জন্যে আনতে পারি—

মাধুরী বলল, সে-কথা হচ্ছে না। এত দামী শাড়ি নিয়ে এলে, তাই বলছি। আজকাল বুঝি তোমার খুব পয়সা হয়েছে—

মহীতোষ বলল, পয়সার কথা তুলছ কেন। আজ শ্রাবণের আঠাশ তারিখ। তাই নিয়ে এলাম—

মাধুরীর মনে পড়ল। আঠাশে শ্রাবণ। আজ তাদের বিয়ের তারিখ। বলল নরম গলায়, তাই নাকি! একদম খেয়াল নেই। কি যে ভুলোমন হয়েছে আমার—

মহীতোষ বলতে ছাড়ল না, সেটা কি আজ প্রথম টের পেলে ?

খোঁচাটা নিঃশব্দে হজম করল মাধুরী। কথার ওপর কথা চড়াতে গেলেই সময় নষ্ট হবে। দেড়টা বাজে। শো আড়াইটায়। প্যাকেটটা

আলমারীর ভেতর রেখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মাধুরী।

মহীতোষ বলল, আজ না তোমার ছুটি।

মাধুরী বলল, হ্যাঁ। কিন্তু একটা জরুরী কাজে এক জায়গায় যেতে হবে—

মহীতোষের গলার স্বর হাল্কা হয়ে এল, আজ কি তোমার না বেরুলেই নয়?

মাধুরী বলল, আগের থেকে ঠিক করা আছে। যেতেই হবে।

মহীতোষের কণ্ঠস্বর গাঢ়তা পেল, ভেবেছিলাম—আজকের দিন-টাতে তোমাকে আর রঞ্জুকে নিয়ে বিকেলের দিকে একটু কালীঘাটে যাব—

উত্তরটাকে মনে মনে সাজিয়ে নিতে সময় লাগল মাধুরীর, আগে যদি বলতে! তাহলে অ্যাপয়েন্টমেনটা ক্যান্সেল করতাম। এখন না গেলে এক বিশ্রি কাণ্ড হবে—

ক্ষুব্ধ মহীতোষ বলল, সব কথাই কি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে—

মাধুরী থতিয়ে গেল। বলল, তা নয়। তবে আগে জানলে—

মহীতোষ মলিন হাসল, কবেই বা তুমি আমার অনুরোধ রেখেছ—

মাধুরী বলল, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাও নাকি?

মহীতোষ বলল, এতে ঝগড়ার কি দেখলে। আমি কি তোমাকে আটকাচ্ছি—।—বলেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাধুরী খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে রইল খাটে। নিজের সঙ্গে বোঝাপোড়া করার জন্য অনেকটা সময় নিল।

ট্যাক্সি ধরেও মেট্রোয় পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার ওপর লেট করে ফেলল মাধুরী।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সন্দীপ। মাধুরী এগিয়ে গিয়ে বলল, ইস্, তিনটা বেজে গেল। বড্ড দেরী করে ফেললাম। চলো—

সন্দীপের মুখ থমথমে।· সে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল, কোথায়?

মাধুরী চোখ বড় করল, তার মানে! টিকিট কাটোনি?

সন্দীপ ভাববাচ্যে বলল, কাটা হয়েছিল। বেচে দেওয়া হয়েছে—

মাধুরীর মেজাজ ভাল ছিল না। বলল ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে, বেচে দিয়েছ মানে?

সন্দীপ বলল, মানে আবার কি। এক ভদ্রলোক চাইলেন। তাকে দিয়ে দিলাম—

ঝপ করে শরীরের সব রক্ত যেন পায়ের দিকে নেমে গেল মাধুরীর, একটু অপেক্ষা করতে পারলে না।

সন্দীপ এক গলা ধোঁয়া ছাড়ল, অপেক্ষা! তারও তো একটা শেষ আছে।

মাধুরী আপস করতে চাইল, ঠিক আছে। চলো, এখন গিয়ে ফের টিকিট কাটি—

সন্দীপ বলল, এখন! এখন তো জনগণমন হচ্ছে—

মাধুরী উষ্ণ হয়ে উঠল, এ তোমার বাড়াবাড়ি সন্দীপ। হঠাৎ বাড়িতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম—

সন্দীপ বলল, থামলে কেন। যে অজুহাতটা ট্যাক্সিতে করে আসার সময় মনে মনে এতক্ষণ ধরে বানিয়ে রেখেছ—বলে ফেলো সেটা।

মাধুরী বলল, তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী ভাবো সন্দীপ?

সন্দীপ বলল, সত্যবাদিনীও ভারি না কিন্তু—

সন্দীপের একটা হাতধরে ফেলল মাধুরী, ঠিক আছে। ঘাট মানছি। অন্যায় আমারই হয়েছে—

সন্দীপ বলল, তোমার কি হয়েছে না হয়েছে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে, আমার একটা ছুটির দিন মাটি হয়ে গেল, এটাই বড় কথা—

মাধুরী হাসতে চাইল, হয়েছে। আর বকবক করতে হবে না। এবার চলো তো—

সন্দীপ বলল, কোথায় ?

মাধুরী বলল, সিনেমা দেখা হল না। তাই বলে আর কি কোথাও যাবার জায়গা নেই ! চলো গঙ্গার দিকে যাই—

সন্দীপ বলল, গঙ্গার দিকে, এখন ! অসম্ভব।

মাধুরী বলল, অসম্ভব কেন ?

সন্দীপ বলল, মুড নেই আমার।

মাধুরী বলল, নেই তো নেই। আজ না হয় আমার অনুরোধ-টুকুই রাখলে—

এক-ঝটকায় মাধুরীর হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল সন্দীপ, হাত ছাড়ো। আর সীন ক্রিয়েট করতে হবে না।

মাধুরী শেষবারের মত ওকে শান্ত করতে চাইল। বলল, সন্দীপ, কি হচ্ছে—

সন্দীপ কর্কশ গলায় বলল, ন্যাকামো ছাড়ো। এসব আমার ভালো লাগে না—

মাধুরীর পিঠে কেউ যেন সপাং করে চাবুক মারল। সে-ও গলা চড়াল, তার মানে, তুমি আমায় কি ভাবো বলো তো ?

সন্দীপ মুখ বিকৃত করল, নিশ্চয়ই ম.হয়সী নারী ভাবি না !

সন্দীপকে নোংরা ইতর মনে হচ্ছিল মাধুরীর। সে-ও এ' 'া হেস্ত-নেস্ত করতে চাইল, কি ভাবো খুলেই বলো না। বলবার মত সাহস নেই তোমার ?

সন্দীপ কুৎসিত হাসল, সাহস ! সাহস আমার যথেষ্ট আছে। তবে চারপাশে লোকজন,—এর মধ্যে তোমার চরিত্রের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করা কি খুব শোভন হবে ?

ভূমিকম্প হলেও এতটা চমকাত না মাধুরী। সে বিহ্বল গলায় শুধু বলল, বেশ—। —তারপর আর দাঁড়াল না। ঘুরে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল উলটো মুখো।

মাধুরী অনেকটা পথ হাঁটল। তার চলার গতি ছিল মন্থর। চিন্তাক্লিষ্ট বয়স্ক মানুষের মত। মেঘজটিল শ্রাবণশেষের আকাশটা যেন তার মাথার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। আর বৃষ্টিধারার মত অজস্র টুকরো টুকরো ভাবনায় তার চেতনা জর্জরিত হচ্ছিল। তার দৃষ্টি শূন্য, লক্ষ্যহীন। দুপাশে জনস্রোত। অফিসফেরত মানুষ ভবঘুরে বিদেশিনী উদ্ধত তরুণতরুণীর দল বৈকালিক লম্পটেরা। এদের মাঝখান দিয়ে ভ্রূক্ষেপহীন হাঁটছিল মাধুরী।

সন্দীপের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে নিজেকে অশুচি মনে হল মাধুরীর। ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল। অনেকের কথাই মনে পড়ছিল তার। মুখার্জি সাহেব। বেচারা! অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি—সবকিছু পেয়েও মানুষটা কি নিঃস্ব, কি রিক্ত। ডলি সরখেল। হাসতে হাসতে পেটেব ভ্রূণ নষ্ট কবে ফেলে! সব বুঝেও ও অসহায়। নিজেকে রক্ষা করার উপায়টা জানা নেই ওর। আর মঞ্জু। বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই মেয়েটা।

এরা সবাই করুণার পাত্র। বড় দুঃখী। অসহায়। কিন্তু কেন। মাধুরী যেন আত্মগত বলছিল : মেঘ ঘনীভূত হলেই তা বৃষ্টির আকাব পায় না। বৃষ্টির আকার পেতে হলে একটা অবলম্বন চাই। সেই অবলম্বন তুচ্ছ হোক না কেন।

ওরা সব নিরাশ্রয়। অবলম্বনহীন। তাই ওরা দুঃখী। তাই উদ্‌ভ্রান্ত। ওরা সবাই ভেসে বেড়াচ্ছে।

মুখার্জি সাহেব, ডলি সরখেল, মঞ্জু, সবাই। এবং । এবং সে নিজেও—

যাদবপুর বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নামতে খেয়াল হল মাধুরীর—কখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। সে ভাবতে চেষ্টা করল : এতক্ষণ সে কোথায় ছিল। এতটা সময়। কতটা পথ হেঁটেছিল সে। কখন উঠেছিল বাসে। কিছুই মনে করতে পারল না। শুধু এইটুকু মনে পড়ল মাধুরীর—পথে একবার কোথাও সে এক অন্ধ ভিক্ষুককে কিছু খুচরো পয়সা দিয়েছিল।

বাড়ি ফেরার সময় ন'নম্বর বাস টার্মিনাসের দিকে আসতে মাঝপথে একবার দাঁড়িয়ে পড়েছিল মাধুরী। মানে, দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। রাস্তার ওধারে সার সার দোকান। একটা দোকানে চোখ পড়তে তার দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল। দেখেছিল সে, দোকানের ভেতর, কাউন্টারের ওধারে মহীতোষ দাঁড়িয়ে। টিউব লাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ওকে। কাউন্টারের এধারে দুজন লোক। মহীতোষ ওদের কিছু একটা দেখাচ্ছিল।

ব্যাপারটা চট করে মগজে ঢুকত না মাধুরীর। যদি না তার চোখ পড়ত দোকানের ওপরে লটকানো সাইন বোর্ডে। লেখা—"মাধুরী ষ্টোর্স। তোয়ালে গেঞ্জী এবং রকমারী পর্দা-বেডকভারের অভিজাত দোকান।"

পানের বাজারে এসে এক ডজন রজনীগন্ধার ষ্টিক আর ভাল জাতের এক প্যাকেট ধূপকাঠি কিনেছিল মাধুরী।

বাড়িতে ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে কুয়ো তলায় গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গা ধুল মাধুরী। ঘরে এসে ধূপকাঠি ধরাল। রজনীগন্ধার ষ্টিক পরিপাটি করে রাখল ফ্লাওয়ার ভাসে।

মহীতোষ ফিরল নটার পরে। মাধুরী তখন খাটে। রঞ্জনের পাশে শুয়ে। লক্ষ্য করল মাধুরী—ফ্লাওয়ার ভাসে চোখ পড়েছে মহীতোষের। কিন্তু, দেখেও কোন মন্তব্য করল না মহীতোষ।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে মশারীর কাছে আসতে দেখল মাধুরী—মহীতোষ চেয়ারে বসে।

মাধুরী শুধোল, গুজরাটে যাচ্ছো আসছে মাসে, তাই না?

মহীতোষ মুখ না তুলেই জবাব দিল, হ্যাঁ।

মুখ তুললে মহীতোষ দেখত—মিটি মিটি হাসছে মাধুরী।

আলমারী খুলল মাধুরী। ফুল ভয়েলের শাড়িটা বের করে পরল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। নতুন ছাঁদের খোপা বাঁধল। মুখে পাউডার বুলিয়ে নিল হাল্কা করে।

মহীতোষ এসব কিছু লক্ষ্য করে নি। একমনে হিসেব করে যাচ্ছিল।

মাধুরী মশারীর ভেতর ঢুকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের বিয়ের আজ কত বছর হল যেন— ?

মহীতোষ উত্তর করল, তেরো বছর—

মাধুরী বলল, বলো কি !

মহীতোষ বলল, হ্যাঁ, তেরো বছর। আনলাকি থারটিন—

বড় একটা হাই তুলে মহীতোষ আলো নেভাতে গেলে মশারীর ভেতর থেকে মাধুরী বলে উঠল, আলোটা আজ জ্বলুক না।

মহীতোষ অবাক হল। রাত একটার কাছাকাছি। মাধুরী জেগে। বিশ্বাস হচ্ছিল না তার।

মহীতোষ ফিরে এল। মশারীর ভেতর ঢুকতেই অবলীলায় রঞ্জনকে ডিঙিয়ে মাধুরী চলে এল মহীতোষের কাছে। বলে উঠল অভিমানহত গলায়, আজকাল তুমি আমাকেও মিথ্যে বলতে শুরু করেছ ?

ফুল ভয়েলের শাড়িতে অপরূপ দেখাচ্ছিল মাধুরীকে। মহীতোষ বলল, তার মানে ?

মাধুরীর মুখে হাসির আভা ফুটে উঠল। সে বলল, তুমি তো গুজরাট চলে যাচ্ছ, তাই না ?

মহীতোষ আমতা আমতা করে বলল, হ্যাঁ, সেইরকম কথাই তো হয়ে আছে—

মাধুরী বলল, ভাবছ—আমি কিছুই জানি না। ফেরবার পথে তোমাকে দোকানে দেখলাম। প্রিয় ঠাকুরপোর কাছে সব শুনেছি আমি—

মহীতোষ বলতে চাইল, না মানে, আমি—

—থাক্, হয়েছে। একটা মিথ্যাকে চাপা দিতে গিয়ে হাজারটা মিথ্যা কথা বলতে হবে না—, কথা অসমাপ্ত রেখে মাধুরী দুহাত বাড়িয়ে মহীতোষের গলা জড়িয়ে ধরল। কাছে টানল।

মহীতোষ প্রতিবাদ করল না।

বারো·

রিনাকে সেদিন ট্যাকসিতে বসে পাকা কথা দিয়েছিল প্রিয়তোষ। আগেভাগেই সে সন্দেহ করেছিল। রিনা হয়ত বিয়ের জন্য চাপ দেবে। এরকম অনুমান করেই প্রিয়তোষ বলে রেখেছিল এক বন্ধুকে। ম্যারেজ রেজিষ্টার অফিস থেকে সোজা গিয়ে উঠবে তার ফ্ল্যাটে। বন্ধুটি ব্যাচেলার। থাকে গলফ ক্লাব রোডে। তারপর ধীরে সুস্থে বাড়ি দেখবে। বেহালার দিকে। কারখানার কাছাকাছি।

তখনও জানত না প্রিয়তোষ অদূরে তার জন্য এক মর্মান্তিক সংবাদ অপেক্ষা করে আছে। জানল খানিক পরেই। থানায় গিয়ে। অম্লু মারা গেছে।

সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। কোথায় ভেসে গেল রিনাকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি। দশবারো দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কাটাল সে।

শেষে একদিন প্রিয়তোষ কারখানা থেকেই ফোন করল। কপাল গুণে রিনাকেই পাওয়া গেল। রিসিভার তুলে রিনা জিজ্ঞেস করল, কে?

প্রিয়তোষ বলল, আমি, রিনা—

রিনা বলল, তুমি! হঠাৎ এতদিনবাদে, কি মনে করে!—রিনার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। প্রিয়তোষ বুঝল—রিনা বেজায় খেপে আছে।

প্রিয়তোষ কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি—

রিনা হেসে উঠল, মানে তুমি ভাবছিলে আজই দেখা করবে আমার সঙ্গে। নানা কাজে এ'কদিন ব্যস্ত ছিলে, সময় করে উঠতে পারো নি— এই সব বলবে তো।

প্রিয়তোষ বলল, না, সে-কথা নয়। মানে, এর মাঝে---যেদিন তোমার সঙ্গে শেষ দেখা সেদিনই এমন একটা খবর পেলাম যে—

রিনা বিদ্রূপ মেশানো গলায় বলল, আবার খবর। তুমি দেখছি দিনে দিনে শার্লক হোমস হয়ে উঠলে—

প্রিয়তোষ অনুনয়ে ভেঙে পড়ল, সত্যি, অন গড কেথ, এমন একটা খবর—যেটা শুনলে তুমি—

রিনা হেসে উঠল, আমি শিউরে উঠব, তাই না! না ভয় নেই, বলেই ফেলো, আমার হার্ট এখনো যথেষ্ট ষ্ট্রং আছে।

প্রিয়তোষ বলল, ফোনে সে-খবর দেওয়া যাবে না রিনা।

রিনা বলল, তাই বলো। চট করে বানিয়ে বলতে পারছ না। ভেবেচিন্তে তারপর বলবে, এই তো!

প্রিয়তোষের গলার স্বর কেঁপে উঠল, তুমি আমাকে এতটা অবিশ্বাস করো রিনা?

রিনার কণ্ঠস্বর নিরুত্তাপ, বিশ্বাস তো অনেকদিন ধরেই করেছি। তাতে কি লাভ হল।

আহত গলায় বলল প্রিয়তোষ, ঠিক আছে। আজই বলব তোমাকে। যে খবরটা আর কেউ জানে না।

রিনার কণ্ঠস্বর কৌতুকপূর্ণ হয়ে উঠল, বলো কি। তুমি আমাকে এতটা গুরুত্ব দাও। আগে জানতাম না।

প্রিয়তোষ শুধোল, আজ বিকেলের দিকে বাড়িতে থাকবে?

রিনা উত্তর করল, থাকব না যাব কোথায়। আমি তো তোমার মত ভেরি ইম্পর্টেন্ট পারসন নই। তবে বাড়িতে এসো না দোহাই—

প্রিয়তোষ বলল, বাড়িতে নয় কেন?

রিনা বলল, একথার উত্তরও কি আমায় দিতে হবে? তাহলে কি ধরে নেব—তুমি কিছুই বোঝো না।

প্রিয়তোষের কণ্ঠস্বর খাদে নামল, সত্যি, বিশ্বাস করো আমি—

রিনা ওকে থামিয়ে দিল, আমি চাই না তুমি এ-বাড়ির লোকজনদের কাছে অপমানিত হও।

প্রিয়তোষের প্রশ্ন তখনো সরল, তার মানে!

রিনা বলল, মানেটা ভেবে দেখার চেষ্টা করলেই ধরতে পারবে আশা করি।

প্রিয়তোষ আর ঘাটাল না। মূল প্রসঙ্গে চলে গেল, তাহলে কোথায় দেখা হতে পারে?

রিনা ভেবে বলল, ঢাকুরিয়া ব্রীজের নিচে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের কাছে—

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, কখন?

রিনা বলল, সেটা তুমিই বলো।

প্রিয়তোষ বলল, আমার ডিউটি দুটোয় শেষ। ধরো তিনটে নাগাদ পৌঁছব—

রিনা বলল, উঁহু, তিনটে নয় সাড়ে তিনটে। যা সময় জ্ঞান তোমার। আধঘণ্টা ছাড় দিলাম—

প্রিয়তোষ হাসতে চাইল, বেশ তাই হবে।

সওয়া তিনটের মধ্যে প্রিয়তোষ পৌঁছে গেল ষ্টেট ব্যাঙ্কের সামনে। রিনা এল ঠিক সাড়ে তিনটের সময়।

কাছে এসে বলল, কি তাজ্জব ব্যাপার! আজ তুমি এত পাংচুয়াল—

রিনাকে ঈষৎ রোগা লাগছিল। চোখে রঙ চশমা। তাই দৃষ্টির গতিক বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রিয়তোষ বলল, তোমার কি হয়েছে বলো তো। শুরু থেকেই যা মেজাজ দেখাচ্ছ—

রিনা অল্প হাসল। নিষ্প্রাণ হাসি। বলল, আমার আবার কি হবে। দিব্বি খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি—

প্রিয়তোষ বুঝল—কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ধীরে ধীরে ওকে নরম করতে হবে। সে বলল, ঠিক আছে। এখন চলো কোথাও যাই।

রিনা বলল, কোথায় যাবে?

প্রিয়তোষ উত্তর করল, গড়িয়াহাটের দিকে গেলে কেমন হয়।

রিনা মাথা নাড়ল, উঁহু অদ্দুর যেতে পারব না—

প্রিয়তোষ অবাক হল, গড়িয়াহাট কি এমনবেশি দূরের পথ যে—

রিনা বলল, বেশিদূর কিনা জানি না। কিন্তু আমার হাতে অত সময় নেই। বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। বড় মামিমা ঘুমুচ্ছেন। দেরী হলে—

প্রিয়তোষ হাসতে চাইল, বড় মামিমাকে বুঝি তুমি খুব ভয় পাও?

রিনা নড়েচড়ে উঠল, আগে পেতাম না। এখন পাই—

প্রিয়তোষ হাল্কা সুরে শুধোল, তা হঠাৎ ভয় পাবার কারণটা কি।

রিনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কারণটা তুমি। তুমি কথা দিয়ে গেলে সেদিন। আমি সবাইকে বলেছিলাম সরাসরি। তুমি যথারীতি এলে না। এখন ওরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই আমি এখন এমন কিছু করতে চাই না যাতে ওরা কোন কথা বলার সুযোগ পায়—

রিনার অভিযোগ অপ্রিয় হলেও ভিত্তিহীন নয়। প্রিয়তোষ প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটাতে চাইল, তাহলে চলো ব্রীজের ওপরে যাই। ওদিকটা বেশ ফাঁকা—

রিনা আপত্তি করল না।

ওরা বাস রাস্তার দিকে গেল না। ব্রীজের গা ঘেঁসে উত্তরে একটা পথ গেছে। ওরা সেই পথ ধরে এগুল।

রিনা শুধোল, তারপর বলো। কি একটা খবর দেবে বলছিলে— ?

রিনার প্রশ্নে বিচলিত বোধ করল প্রিয়তোষ। সে ভাবতে শুরু করল: কি খবর সে দেবে রিনাকে। অনু মারা গেছে। পুলিশের গুলিতে। অনুর মৃত্যু কি অস্বাভাবিক। নিজেই তো সে একাধিকবার কথা প্রসঙ্গে বলেছে রিনাকে, মার তাড়ায় একবার করে থানায় ছুটতে হয়। ফালতু যাই। অনু বেঁচে থাকলে অ্যাদ্দিনে নিশ্চয় একটা খবর পেতাম।—অনুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রিনা দুঃখিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু, ওইখানেই কি ও থেমে যাবে? না। প্রিয়তোষ জানে—

তার পরেই নিজের কথাটা পাড়বে রিনা। বলবে, আমার দিকটা কি একবার ভেবে দেখেছ। তুমি কথা দিয়ে গেলে, সেদিন জাঁক করে বাড়ির সবাইকে বললাম--

প্রিয়তোষ বলল, এত তাড়াহুড়োর কি আছে। আগে চলো, ব্রীজে উঠি। তারপর বলব—

রাস্তাটা কিছুদূর এগিয়ে ব্রীজের নিচে বাঁক নিয়েছে। বাঁক ছাড়িয়ে সোজা কয়েক পা এগুলেই ব্রীজে ওঠার সিঁড়ি। ডানদিকে ফুটপাত। ফুটপাতের প্রান্তে একটা ঝাঁপতোলা চায়ের দোকান দোকানের বাইরে বেঞ্চ। বেঞ্চে ছেলের দল হল্লাগুল্লা করছিল।

সেদিকে চোখ পড়তে হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল রিনা। বলল খাটো গলায়, ঠিক আছে, বলতে হবে না। এখন জোরে পা চালাও তো—

প্রিয়তোষ ঈষৎ বিরক্ত হল। বলল, জোরে পা চালাবো কেন।— তারপর ওর চোখ পড়ল দোকানটার দিকে।

বেঞ্চ থেকে তখন একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রিয়তোষ বলল ফেব, ছেলেটা কে হে। তোমাদের সেই বিখ্যাত ভুট্টা না ?

রিনা ধমকে উঠল, আহ্, চুপ করবে—

ভুট্টা কাছে এগিয়ে এসে বলল, এই রিনা, চললে কোথায়—

রিনার মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। সে সহজ হতে চাইল। বলল, প্রিয়দার সঙ্গে গোল পার্কের দিকে যাচ্ছি। কাজে—

ভুট্টা প্রিয়তোষের দিকে হাত তুলে বলল, নমস্কার। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি—

রিনা কথাটাকে ছোঁ মেরে টেনে নিল, উনি অমলদার বন্ধু। প্রিয়দা। একসময় ফুটবল খেলতেন ডিভিশনে—

ভুট্টা প্রশ্ন করল, ফিরতে কি তোমাদের দেরী হবে ?

রিনা বলল, না, যাব আর আসব। কেন কিছু বলবে ?

ভুট্টা বলল, না, এম্নি—

রিনা বলল, তুমি এখানে কি করছ ?

ভুট্টা বলল, এই একটু আড্ডা দিচ্ছি—

রিনা বলল, তোমাদের খালি আছে কেবল আড্ডা। আড্ডা মেরে কি সুখ যে পাও—

ভুট্টা উত্তর করল না। হাসল।

ব্রীজের ওপরে উঠে রিনা বলল, চলো, বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে বসি।

প্রিয়তোষ বলল, তুমি ভুট্টাকে মিথ্যে কথা বললে কেন ?

রিনা বলল, কি বলেছি—

প্রিয়তোষ উষ্ণ হয়ে উঠল, বল্লে না গোলপার্কের দিকে যাচ্ছি—

রিনা বিরক্ত বোধ করল, বলেছি তো কি হয়েছে—

প্রিয়তোষ বলল, না, হবার কি আছে। তবে অহেতুক মিথ্যে বলা—

রিনা বলল, তোমার মত সত্যবাদী আমি নই—

প্রিয়তোষ ধৈর্য হারাল, আমি কি সে-কথা বলেছি। তবে—

জেরার ভঙ্গিতে বলল রিনা, তবে কি ?

প্রিয়তোষের মাথায় ধাঁ করে রক্ত চড়ল, একটা গুণ্ডা লোফারকে অহেতুক মিথ্যে বলা—

রিনা দাঁড়িয়ে পড়ল, ভুট্টার সম্বন্ধে না জেনে কিছু বলা ঠিক না—

প্রিয়তোষ বলল, এসব ছেলের সম্বন্ধে বেশি কিছু জানার মত কৌতূহল আমার নেই। যেটুকু জেনেছি—তা তোমার কাছ থেকেই—

রিনার মুখের হাসিটুকু নিভে গেল। সে বলল, তুমি নিজেকে কি ভাবো বলো তো !

প্রিয়তোষ জোরের সঙ্গে বলল, আর যাই ভাবি না কেন, নিজেকে স্ট্রীট-বয় বলে মনে করিনা অন্তত—

রিনা বলল, আমি কি সে-কথা বলেছি !

প্রিয়তোষের ভেতরের রাগটা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল রুক্ষ গলায়, আমি চাই না রিনা তুমি ও রকম ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখো।

রিনা চোখ বড় করল, তাই নাকি!

প্রিয়তোষ বলল, হ্যাঁ তাই—

রিনা গলা চড়াল, তবে তুমিও জেনে রাখো—আমার সব ব্যাপারে নাক গলানোর অধিকারও তোমার নেই।

প্রিয়তোষ হেসে উঠল, তোমার দেখছি ভুট্টার ওপর খুব দরদ!

রিনা কেঁপে উঠল যেন। নিজেকে সামলে নিয়ে ধরা গলায় বলল ভেঙে ভেঙে, তোমার যদি সে-রকম মনে হয় তো তা-ই—

রিনা আর দাঁড়ায়নি। কথা বলার সুযোগ দেয় নি প্রিয়তোষকে। ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলে গেছে হনহনিয়ে।

প্রিয়তোষ এখন অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত। অনুতপ্ত সে।

এখন বোঝে—অন্যায়টা তারই হয়েছিল। ভুট্টাকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে সে আহত করেছিল রিনাকেই।

বাড়ির নিষেধ-শাসন উপেক্ষা করে ছুটে এসেছিল রিনা সেদিন। একটা সুন্দর মন নিয়ে। প্রিয়তোষ নিজের বোকামির জন্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে নির্মমভাবে।

এখন প্রিয়তোষ, রিনাকে কাছে পেলে, অনায়াসে বলতে পারে: আমাকে ক্ষমা করো রিনা। সেদিন আমার যে কি হয়েছিল—

কিন্তু, এখন কি ভাবে সে কাছে পাবে রিনাকে। আবার ফোন করবে? রিনার রাগ যদি না পড়ে গিয়ে থাকে! যা অভিমানী মেয়ে। সে ফোন করছে বুঝতে পেরে যদি রিনা লাইন ছেড়ে দেয়!

এখন ওকে পাবার একটা রাস্তাই খোলা আছে প্রিয়তোষের সামনে। চূড়ান্ত পথ। সেটা হল—সরাসরি ওদের বাড়িতে চলে যাওয়া। গিয়ে বলা ওর বড় মামাকে। রিনা আমার। আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি।

তেমন মনোবল নেই প্রিয়তোষের। নেই সাহস। সামর্থ্য কিংবা সুযোগও নেই। এখন, শুধু প্রতীক্ষায় থাকা। প্রতিদিন সে কারখানায় গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এই বুঝি রিনার ফোন এল।

এখন প্রিয়তোষ বলতে গেলে বাড়িতে থাকেই না। কারখানার ডিউটি শেষ করে এদিকে সেদিকে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায় একা একা।

বাড়িতে থাকতে একদম ভাল লাগে না তার। বাইরেও অর্থহীন ঘুরে ঘুরে সে শুধুই ক্লান্ত হয়।. আসলে তার অসহযোগ সময়ের সঙ্গে। তাই সকলকে এড়াতে চায় প্রিয়তোষ।

এই নিয়ে ঘরে বাইরে আজকাল তাকে কম কথা শুনতে হয় না। কারখানার সেক্সন ইনচার্জ তাকে প্রায়ই ধমকান। বলেন: কি ব্যাপার বলুন তো মিষ্টার রায়। যে কাজে দিচ্ছি সেই কাজেই গণ্ডগোল বাধাচ্ছেন। এভাবে চললে কিন্তু আমি ম্যানেজমেণ্টকে জানাতে বাধ্য হব।

বাড়িতে সুহাসিনীও বকবক করেন: তোর কি হয়েছে বল্‌তো প্রিয়। স্থির হয়ে বসে ভাতটা পর্যন্ত খাস না। টাকা পয়সা বিছানায় গড়াগড়ি খায়। দাড়ি কামাস না। নোংরা জামাপ্যাণ্ট পরে কারখানায় যাস। কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়াস সারাদিন—

প্রিয়তোষ তল খুজে পায় না। সংসারের মলিন-ক্লিষ্ট ছবি তাকে বিমর্ষ করে তোলে। ছোঁয়াচে রোগের মত সেই ক্লিন্নতা সংক্রামিত হয় তার মধ্যে। তাই প্রিয়তোষ পারতপক্ষে বাড়িতে থাকে না।

ললিমোহনের অবস্থা খুবই খারাপ। রাতদিন গোঙান। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। সুহাসিনী বলেন: বুড়োর শরীর ভাল নেই। রাতের দিকে ডাকলে সাড়া দিস কিন্তু প্রিয়। কখন কি ঘটে যায়!

সুহাসিনীর কথা শুনে প্রিয়তোষের বুক শঙ্কায় কেঁপে ওঠে। সে-ও এমনি এক ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আছে। কখন কি ঘটে যায়।

এক একদিন সুহাসিনী বড়ই উতলা হয়ে ওঠেন। বির বির করেন আপন মনে। কোন কোনদিন গভীর রাতে প্রিয়তোষকে ডাকেন। বলেন : প্রিয়, ও প্রিয়। ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি।—প্রিয়তোষ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। অন্ধকারে দরজা খোলে। বলে আর্ত গলায় : কি হয়েছে মা!—সুহাসিনী দরজার পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে কাঁপেন থরথরিয়ে। কাঁদেন। বলেন সুর করে : মাঝরাত্তিরে বাতাবী-লেবু গাছটায় বসে নিম পাখি 'কু' ডাকে। কুকুরটা থেকে থেকে ঘরে ঢুকতে চায়। রাতভর কারা যেন বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমি কিন্তু ভাল বুঝছি না প্রিয়, সত্যি করে বল্ বাপ। লুকোস না। অনু কোথায় আছে রে? ও কি আর ফিরবে না!

সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না প্রিয়তোষ। সত্য কথাটা বলার মত সাহস নেই তার। মাঝে মাঝে মৃত্যুপথযাত্রী ললিতমোহন প্রবোধ দেন সুহাসিনীকে। বলেন যন্ত্রণা কাতর গলায় : কাঁদছ কেন সুহাস। দুনিয়াটাই একটা আজব কয়েদখানা। তুমি আমি সকলেই তো কয়েদ খেটে যাচ্ছি। তাছাড়া, শাস্ত্র পড়োনি। স্বয়ং ভগবান যে যুগে যুগে কারাগারে ছিলেন। সতযুগে তিনি ছিলেন অনন্ত জলধিরূপী কারাগারে। ত্রেতায় ছিলেন রাক্ষসগণের মধ্যে। দ্বাপরে কংসের কারাগারে। কারাগারে না গেলে কেউ শুদ্ধ হয় না সুহাস। আমি যাই নি? দেখো, অনু একদিন ঠিক ফিরে আসবে।

সুহাসিনী এসব কথায় নিরস্ত হন না। কেবলই চোখের জল মোছেন। প্রিয়তোষ ভেবে অবাক হয়। মার চোখে এত জল আছে!

বাইরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে ঘুরেও কি শান্তি পাচ্ছে প্রিয়তোষ। বরং, আরো দিশেহারা হয়ে পড়ছে। আরো এলোমেলো। প্রতিপদে ভুল হচ্ছে তার। সিগ্রেট কিনে দোকানীর কাছ থেকে পাওনা পয়সা ফেরৎ নিতে সে ভুলে যায়। দুপুরের সিফ্‌টে ডিউটি। সকালে গিয়ে হাজির হচ্ছে কারখানায়। বাসে উঠে, নামার কথা যাদবপুরে

চলে যাচ্ছে বাঘাযতীনে। কোনদিন আরো দূরে। গড়িয়ার কাছাকাছি। রাতে ঘুম ভাঙলে, বাথরুমে যাবে ভেবে, অন্ধকারে অনেক হাতড়েও দরজা খুঁজে পায় না।

একটা উদ্বেগ কিংবা ভয় সব সময় তাড়া করে ফেরে প্রিয়তোষকে। পথ চলতে মুহুর্মুহু ফুটপাত বদলায় সে। ভাবে—কেউ বুঝি অনেকক্ষণ ধরে তার পিছু নিয়েছে। কারুর সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে চায় না। আশঙ্কা—যদি কেউ তার গোপন কথাগুলো জেনে যায়! পথ-চলতি কাছাকাছি কোন গাড়ি হঠাৎ বিকট শব্দ করে ব্রেক কসে থেমে গেলে সে আঁৎকে ওঠে। মাথা ঘোরে তার। পা টলতে থাকে। প্রতিদিন সকালে কুয়োতলায় গিয়ে মুখ ধোওয়ার সময় আতংকে কাঁপতে থাকে। ভাবে—এই বুঝি তার গলা থেকে একদলা রক্ত বেরিয়ে এল।

প্রিয়তোষ খবরটা পেয়েছিল আচমকা। সকালের সিফ্‌টে ডিউটি। ছুটি হয় বেলা দুটোয়। একটা নাগাদ সুভাষ এসেছিল তাদের সেক্সনে। সুভাষ অফিস-স্টাফ। থাকে ঢাকুরিয়ায়। সুভাষও একসময় ফুটবল খেলত। সেই সুবাদে ওর সঙ্গে পরিচয় অনেককালের। কথাচ্ছলে ও সংবাদটা দিয়েছিল প্রিয়তোষকে। বলেছিল, একটা খবর জানিস প্রিয়—

প্রিয়তোষ বলেছিল, কি খবর?

সুভাষ উত্তর করেছিল, আরে আমাদের অমল, এখন দুর্গাপুরে আছে—

প্রিয়তোষ বলেছিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। অমলের আবার কি হল?

সুভাষ বলেছিল, অমলের কিছু নয়। ওদের বাড়িতে ওর এক পিসতুতো বোন থাকত না—

যেন সাপে কামড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলে উঠেছিল প্রিয়তোষ, রিনার কথা বলছিস?

সুভাষ মাথা নেড়েছিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ। মেয়েটা পরশু এক মস্তানকে বিয়ে করেছে। সেই নিয়ে পাড়ায় কি সোরগোল—

প্রিয়তোষের গলায় যেন মাছের কাঁটা আটকে গিয়েছিল। সে অস্ফুট বলে উঠেছিল, কে, ভুট্টা?

সুভাষ বলেছিল; ঠিক ধরেছিস। তুই চিনিস নাকি ছোকরাকে?

প্রিয়তোষ শুধু মাথা নেড়েছিল।

কারখানার ভেতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল প্রিয়তোষ। মাথা ঘুরছিল তার। বার দুয়েক বমি করেছিল। শেষে না পেরে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়েছিল এক সময়। বেলা চারটা নাগাদ সেকসন ইনচার্জ এসে বলেছিলেন: এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি মিষ্টার রায়? আমাদের কারখানার একটা গাড়ি মাল নিয়ে বণ্ডেল গেটের দিকে যাবে। আপনি ইচ্ছে করলে সেই গাড়িতে গড়িয়াহাট অব্দি যেতে পারেন। প্রিয়তোষ রাজী হয়ে গিয়েছিল এক কথায়।

গড়িয়াহাটে নেমে এক গাড়িবারান্দার থামে হেলান দিয়ে প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ি যেতে ভয় হচ্ছিল তার। শরীর খারাপ হয়েছে টের পেলে সুহাসিনী ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। প্রিয়তোষ ভাবল: তার চেয়ে খানিকটা সময় এখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা হলে কোথাও চা টা খেয়ে নিয়ে সে বাড়ি ফিরবে।

রোদ্র নিভে আসছিল। চারধারে নানান বৈকালিক ছবি দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড়। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল। ফুটপাতে যুবকের দল দাঁড়িয়ে। একঝাঁক উজ্জ্বল তরুণী প্রিয়তোষের গা ঘেঁসে চলে যাচ্ছিল। হাসতে হাসতে। ওদের দেখে অনতিদূরের এক যুবক জোরে শিস দিয়ে উঠল। তরুণীরা ফিরেও তাকাল না। প্রিয়তোষ উষ্ণ হয়ে উঠল। ভাবল: মেয়েরা এত নিষ্ঠুর হয় কেন।

প্রিয়তোষের শরীর জ্বরতপ্ত। তার পা টলছিল। মাথার ভেতর অজস্র ভাবনা জোনাক পোকার মত জ্বলছিল নিভছিল। নরম পীচের ওপর ডবল ডেকারের টায়ার ছপছপ শব্দ তুলে এগোচ্ছে। অনেকটা

নৌকার দাঁড় টানার শব্দ। দিনটাকে শুষে নিয়ে আকাশ ক্রমশ নিকট-বর্তী হচ্ছে। রাস্তার মোড়ে নিয়ন বাতি জ্বলে উঠছে। আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শহর।

কাছের বড় ডাকবাক্সে হেলান দিয়ে এক বাঁশিঅলা সেই কখন থেকে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে নজর পড়তে অধীর হয়ে উঠল প্রিয়তোষ। কি করুণ বিষণ্ণ এই বাঁশির সুর। লোকটার কাঁধে ঝোলা। ঝোলায় নানান মাপের বাঁশি। কেউ বাঁশি কিনতে এগিয়ে আসছে না। প্রিয়তোষ ভাবল: লোকটা একমনে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে সেই কখন থেকে। কেন। কি চায় ও। লোকটাকে নিষ্ঠুর এক ষড়যন্ত্রকারী বলে মনে হচ্ছিল প্রিয়তোষের। তাহলে কি ও চারপাশের আনন্দ কলরবকে বিষাদে ভরিয়ে তুলতে চায়। প্রিয়তোষের ইচ্ছা করছিল—ছুটে গিয়ে বাঁশিওয়ালার গলার টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু সে একতিল এগুতে পারল না। শুধুই এক অহেতুক উত্তেজনায় সে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বারবার।

প্রিয়তোষের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। চিন্তা ক্রমশ বিকল হয়ে আসছিল। সে মরীয়া হয়ে ভাবতে চাইছিল: সে এখানে এসে দাঁড়াল কেন। কোত্থেকে এল সে। কোথায়ই বা যাবে। কি তার নাম। কোথায় থাকে সে। এটা কোন সাল। কি মাস। মাসের আজ কত তারিখ। কি বার।—ভাবতে গিয়ে সব কেমন গোলগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

এক সময় 'প্রিয়তোষ, এই প্রিয়তোষ' বলে কেউ ডেকে উঠতে সে যেন নিজের অচঞ্চল অস্তিত্বের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। চারপাশের সব ছবি দৃশ্য আবার সচল সজীব হয়ে উঠল তার কাছে।

সামনের দিকে তাকাতে প্রিয়তোষ দেখল—ফুটপাতের গা ঘেঁসে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সির জানালায় একটা মুখ। হাত নেড়ে ডাকছে তাকেই। মুখটা প্রবীরের। প্রিয়তোষ সেদিকে এগিয়ে গেল।

প্রবীর বলল, আচ্ছা লোক তো তুই। সেই কখন থেকে ডাকছি—

প্রিয়তোষ লক্ষ্য করে দেখল ট্যাক্সির ভেতর প্রবীরের পাশে সুবোধ বসে।

প্রবীর বলল, চটপট ভেতরে চলে আয়—

প্রিয়তোষ ট্যাক্সিতে উঠলে সুবোধ জিজ্ঞেস করল, কিরে, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলি ?

প্রবীর বলল, কি আর করবে। সেই মেয়েটার জন্য দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়ই।

ট্যাক্সি ষ্টার্ট নিল। প্রবীর ড্রাইভারকে বলল, ধর্মতলার দিকে চলুন—

সুবোধ বলল, তাই নাকি রে! তাহলে তো তোকে ডাকা উচিত হয়নি।

প্রবীর বলল, গুলি মার তো মেয়েছেলের। কলকাতা শহরে মেয়েছেলের অভাব আছে—

সুবোধ একটা চারমিনার এগিয়ে দিল, নে, ধরা—

প্রিয়তোষ জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

প্রবীর বলল, জাহান্নামে—

ট্যাক্সি এসে থামল ধর্মতলায়। এক মদের দোকানের সামনে। ভেতরে ঢুকল ওরা।

মস্ত হল ঘর। সবুজ ডুম আলোয় আর সিগ্রেটের ধোঁয়ায় রহস্যময়।

ওরা গিয়ে বসল কোণের দিকে এক টেবিলে।

প্রিয়তোষ লক্ষ্য করে দেখল—বেশ কিছু তরুণীরও জমায়েত হয়েছে এ টেবিলে সে টেবিলে।

উর্দীপরা এক বেয়ারা এসে লম্বা সেলাম ঠুকে প্রবীরকে বলল, নমস্কার সাব। বহুৎ দিন বাদে এলেন—

প্রবীর সিগ্রেট ধরাল। বলল, হ্যাঁ সময় পাই না একদম। তারপর, তুমি ভাল আছো তো ইয়াসীন—?

ইয়াসীন মুখ গোমড়া করে বলল, না সাব। জমানা পালটে যাচ্ছে। এখন ছেলেছোকরারাই বেশি আসে। বড্ড হুজুতি করে—

প্রবীর বলল, কি রে প্রিয়, কি খাবি বল্। আজ তুই আমাদের গেষ্ট—

প্রিয়তোষ অন্যমনস্কভাবে বলল, তোর যা ইচ্ছে বল্—

প্রবীর রামের অর্ডার দিল।

সুবোধ বলল, একবারে রামের অর্ডার দিয়ে বসলি। প্রিয় ষ্ট্যাণ্ড করতে পারবে তো। ও কিন্তু আনকোরা—

ইয়াসীন রাম দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে প্লেটে ঝাল পাঁপড় আর ভাজা বাদাম।

প্রবীর একপেগ গিলে পাপড়ে কামড় দিতে দিতে বলল, রাখ তোর আনকোরা। রাম না হলে কি জমে?

কথাটা অ-খাঁটি নয়। পেগ দুয়েক খাবার পর মৌতাত এল প্রিয়তোষের।

সুবোধ আর প্রবীর এক নাগাড়ে কথা বলছিল। নানান খুচরো কথা। মেয়েমানুষের আলোচনা। হালফিলের সিনেমা ষ্টারদের কথা। প্রবীর নতুন কি ব্যবসার স্কিম নিতে চলেছে—সেইসব কথা।

প্রিয়তোষ ওদের কথায় যোগ না দিয়ে চারপাশে তাকাচ্ছিল। সে ক্রমশ সজীব হয়ে উঠছিল। চারপাশে হইচই, গেলাসের টুংটাং আওয়াজ, বেপথু মানুষের চলাচল, রহস্যময় সবুজ আলো - সব মিলিয়ে ভালই লাগছিল প্রিয়তোষের।

একসময় প্রবীরের ডাকে ঘোর কাটল। প্রবীর তার কাঁধে হাত রেখে বলল, নে, চল প্রিয়, এবার ওঠা যাক। চার পেগ করে খাওয়া হয়ে গেছে। আর খেলে তুই সামলাতে পারবি না—

ওরা প্রিয়তোষকে কার্জন পার্কে এসে ছেড়ে দিয়েছিল। প্রবীর বলেছিল, কিরে প্রিয়, একলা বাড়ি ফিরতে পারবি তো?

প্রিয়তোষ বলেছিল, তোরা ফিরবি না এখন?

সুবোধ উত্তর করেছিল, মোটে তো নটা বাজে। এখন আমাদের সবে সন্ধ্যা। আমাদের ফিরতে রাত হবে।

প্রিয়তোষ বলেছিল, তোরা এখন কোথায় যাবি ?

প্রবীর হেসেছিল, সে আরেক মজার জায়গায়। আজ নয়, আরেকদিন নিয়ে যাব তোকে।

ওরা তারপর প্রিয়তোষকে কিছু বলার সুযোগ দেয়নি। লাফিয়ে নিমতলাগামী এক ট্রামে উঠে পড়েছিল।

ওরা চলে যেতে একটা সিগ্রেট ধরাল প্রিয়তোষ। কার্জন পার্কের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। ফুটপাতে পসার জমিয়ে বসা দোকানীরা জিনিসপত্র গোছগাছ করে উঠে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ বাসরাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত হবে কি না ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে একদিনের একটা ঘটনার কথা তার মনে পড়ে গেল। গত শীতের সময়। সেকেণ্ড শিফ্‌টের ডিউটি সেরে ফিরছিল বাসে। দীপ্তি সিনেমা ষ্টপ থেকে এক মাতাল উঠেছিল। লোকটা একেবারে বেহেড ছিল। উঠেই আজেবাজে বকতে শুরু করেছিল। কাছাকাছি যাত্রীরা নাকে রুমাল চেপে পরম ঘৃণার চোখে তাকাচ্ছিল লোকটার দিকে। অত্যুৎসাহীদের মধ্যে কেউ কেউ রগড় করছিল। একজন বলে উঠেছিল : শালা মাতালদের জন্য বাসে ওঠাই দায় হল দেখছি। —শেষপর্যন্ত, টালীগঞ্জ ওভার ব্রীজের আগে এক ষণ্ডামার্কা যুবক মাতালটাকে টেনে হিঁচড়ে বাস থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। নেমে যাওয়ার সময় মাতালটা দু'হাত তুলে করুণ, দুর্বোধ্য গলায় বাস যাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সমবেত যাত্রীদের 'শালাকে নামিয়ে দিন'—চিৎকারে লোকটার কথার বিন্দুবিসর্গ প্রিয়তোষ বুঝতে পারে নি।

আধপোড়া সিগ্রেটটা ছুড়ে ট্রামলাইনের দিকে ফেলে দিয়ে প্রিয়তোষ শেষপর্যন্ত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুল। না, এখন বাড়ি ফিরে

যাওয়া সম্ভব নয়। এখন সে অপ্রকৃতিস্থ। শরীরের ওপর তার কর্তৃত্ব নেই। তার পা টলছে। মাথা ঘুরছে। দেহ শিথিল। পদক্ষেপ অসম। দৃষ্টি ঘোলাটে। জিভ আড়ষ্ট। মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

কোণাকুনি হেঁটে কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে ময়দানে ঢুকে পড়ল প্রিয়তোষ। ডাইনে রেড রোড বাঁ দিকে মাঠ।

ফাঁকায় এসে প্রথমেই রিনার কথা মনে পড়ে গেল প্রিয়তোষের। ভাবল সে : রিনা এখন কোথায়। শহরের পথে! ভুট্টার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! হাসছে। কথা বলছে। হাসলে রিনাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

প্রিয়তোষ একটা হিক্কা তুলে হেসে উঠল। গালাগালি দিয়ে উঠল নিজের উদ্দেশ্যে। বিড়বিড় করে বলল আত্মগত : শালা! তুই বড় লোভী। বড় স্বার্থপর। তুই একা বাঁচতে চেয়েছিলি। ঘর বাঁধতে চেয়েছিলি রিনাকে নিয়ে। পরিচ্ছন্ন, সুখী নির্ঝঞ্ঝাট এক সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখেছিলি তুই। ঝকঝকে ঘরের দেয়ালে কাঠের উড়ন্ত পাখি। অ্যাকুরিয়ামে রঙীন মাছ। জানালায় বাহারি পর্দা। রেডিও'র ক্যাবিনেটে রিনার হাতের কাজ করা সুদৃশ্য ঢাকনা। ঘরে ঢুকতে খানিকটা জায়গা জুড়ে টার্ফ ম্যাট।

প্রিয়তোষ ফের হিক্কা তুলল। বলল আপনমনে। তুই বেকুব। তুই একটা আস্ত গাধা। মূর্খ, আহাম্মক তুই! তুই একটা গাড়ল।

ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। মাঠের ভেতর অন্ধকার। দূরে মনুমেন্ট। কালো স্তম্ভের মত। ভয়ঙ্কর।

কিছুটা এগুতে প্রিয়তোষের মনে হল—এক ছায়ামূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বুকের ভেতর কেউ ড্রাম পিটছিল। সত্যি কি কেউ এগিয়ে আসছে! না তার দৃষ্টিভ্রম।

হ্যাঁ, একজন। ছায়ামূর্তি নিকটবর্তী হতে বোঝা গেল। একজন মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষটি দ্রুতপায়ে কাছে এসে খাটো গলায় বলল, কি, বসবে নাকি?

প্রিয়তোষ দুর্বোধ্য গলায় উত্তর করল, কোথায় ?

মেয়েমানুষটি নড়েচড়ে উঠল, কেন, এইখানেই। বেশ তো আঁধার রয়েছে—

প্রিয়তোষ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বলল, এখানে ! এখানে বসব কেন ?

মেয়েমানুষটি হেসে উঠল, ন্যাকা কোথাকার। কিছুই জানো না—

প্রতিবাদ করার মত সামর্থ্য ছিল না প্রিয়তোষের। সে শুধু মাথা নেড়ে বলল, ওহ্—

মেয়েমানুষটি তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলল, কই, আগে টাকা বের করো।

প্রিয়তোষ দ্বিরুক্তি করল না। আজ্ঞাবহ দাসের মত বুক পকেটে হাত ঢোকাল। কয়েকটা নোট বের করল। তুলে দিল ওর হাতে। গুনগুন করে একটা গানের কলি দাঁতে চিবুতে চিবুতে নোট কটা অন্ধকারে গুণে ফেলল মেয়েমানুষটি। তারপর প্রিয়তোষের হাত ধরে 'এসো' বলে বসে পড়ল ঘাসে। মুখোমুখি।

ব্লাউজের গিঁঠ খুলতে খুলতে মেয়েমানুষটি প্রিয়তোষের হাটুর ওপর তুলে দিল একটা পা। তারপর প্রিয়তোষের একটা হাত টেনে নিয়ে স্থাপন করল নিজের খোলা বুকের ওপর।

প্রিয়তোষের নেশা ফিকে হয়ে এল। শরীরে ফের মৃদু কম্পন শুরু হয়ে গেল। মেয়েমানুষটির স্তন কি ঠাণ্ডা। অন্ধকারে ওর চোখদুটো চকচক করছিল। প্রিয়তোষের গলা ধরে সজোরে আকর্ষণ করল মেয়েমানুষটি। সেই মুহূর্তে রিনার কথা মনে পড়ে গেল প্রিয়তোষের। সে আগের অনুমানটা নাকচ করে দিল। ভাবল নতুন করে : না, রিনা এখন শহরের পথে নেই। রিনা এখন ঘরে। চার দেয়ালের ভেতর। ভুট্টার সঙ্গে গল্প করছে কি ? না। প্রিয়তোষের চিন্তার ভেতরে রক্তস্রোত পাক খেতে লাগল। রিনাও হয়ত এই মুহূর্তে নিজের শরীর উন্মুক্ত করে দিয়ে ভুট্টার শরীরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

প্রিয়তোষ থরথরিয়ে কাঁপছিল। মেয়েমানুষটি নিবিড় করে তাকে

কাছে টানতে চাইছিল। প্রিয়তোষ বলতে চাইল: আমাকে ছেড়ে দাও। আমি—

প্রিয়তোষ কিছুই বলতে পারল না। শুধু, বোবায় ধরা ঘুমন্ত মানুষের মত একটা দুর্বোধ্য শব্দ তার গলা থেকে ঝলকে ঝলকে ঠেলে উঠছিল।

মেয়েমানুষটি তাকে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল, এই, কি হল। কাছে এসো—

প্রিয়তোষ বলল, না—না—না--

মেয়েমানুষটি হেসে উঠল, আহা, ঢ্যামনা কোথাকার—

প্রিয়তোষ সবেগে মাথা নাড়তে লাগল।

এমন সময় অন্ধকারে কোত্থেকে দুটো লোক এগিয়ে এল তাদের দিকে। একজন খরখরে গলায় বলল, এই, কি হচ্ছে এখানে!

মেয়েমানুষটি চটপট উঠে দাঁড়াল।

প্রিয়তোষ বলল, আম – আমি—

একজন ঝুঁকে প্রিয়তোষের কলার চেপে ধরে টেনে তুলল। তারপর গালে সজোরে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলল, শালা, এখানে মজা লুটতে এসেছ!

দ্বিতীয়জন সঙ্গে সঙ্গে ধাঁ করে প্রিয়তোষের তলপেটে একটা ঘুসি চালাল।

প্রিয়তোষ নির্বিকার দাঁড়িয়ে রইল। লোকদুটো বেটে খাটো। সে ইচ্ছে করলে লড়ে যেতে পারত ওদের সঙ্গে। এককালের ফুট-বলার, স্পোর্টসম্যান প্রিয়তোষ রায়। বক্সিংও শিখেছিল কিছুকাল। ওর ঘুসির নিশানা এখনো অব্যর্থ।

তবু, প্রতিবাদহীন দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ যেন সহনশীলতার পরীক্ষা দিচ্ছিল।

প্রথম আক্রমণকারী বলল, বের কর শালা কি আছে। নইলে জানে খতম করে দেব—

প্রিয়তোষ হাতঘড়ি খুলে ফেলল। বুকপকেট থেকে অবশিষ্ট টাকা কটা বের করল।

দ্বিতীয় আক্রমণকারী বলল, কি, আর কিছু নেই?

প্রিয়তোষ মাথা নাড়ল।

প্রথম আক্রমণকারী কলার ছেড়ে দিয়ে দুহাত প্রিয়তোষের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তবু একবার দেখে নিই। শালার ভদ্দরলোকদের আজকাল বিশ্বাস করতে নেই—

প্রিয়তোষ তখন হাসছিল মনে মনে। যেন বলতে চাইছিল : তোমরা বোকা! তোমরা আমার কতটুকু নিলে! কতটুকু নিতে পারো! একটা সস্তাদামের ঘড়ি। কয়েকটা টাকা। ব্যাস্! আর কিছু নয়! আমার ভালবাসা! আমার দুঃখ আমার স্বপ্ন—এসব কি ছিনিয়ে নিতে পারো তোমরা। যদি পারতে—

দ্বিতীয় আক্রমণকারী বলল, পাগল নাকি বে! বিড়বিড় করে কি সব বলছে গ্যাখ্—

প্রথম আক্রমণকারী বলল, পাগল না হাতি! দেখছিস না, মাল টেনে টঙ হয়ে আছে—

দ্বিতীয় আক্রমণকারী শুধোল, কিরে আর পেলি কিছু?

প্রথম আক্রমণকারী বলল, নারে, তেমন কিছু নয়। কিছু খুচরো পয়সা আছে—

দ্বিতীয় আক্রমণকারী বলল, ছেড়ে দে। ও আর নিতে হবে না। চাঁদুকে বাড়ি ফিরতে হবে তো—

মেয়েমানুষটি হেসে উঠল, মাইরি শালা, লোকটা পুরুষমানুষই নয়। কিছুতেই গরম হয় না!

এখন চারিধারে অন্ধকার। আরো অন্ধকার। নিকষ। নিশ্ছিদ্র। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ। নিঃস্ব, রিক্ত। একা।

এখন যেদিকে এগোও শুধু ঘাসে-ছাওয়া মাটি। মাঠ। ময়দান।

এখন যেদিকে ইচ্ছে তুমি বল নিয়ে ছুটতে পারো। তোমার প্রতিপক্ষ নেই কেউ। নেই কোন গোলপোষ্ট। দর্শকও নয়। শুধু তুমি একা। অন্ধকারে।

প্রিয়তোষ অনির্দ্দেশ্য হাঁটতে লাগল। টালমাটাল। জটাদার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। জটাদা বলেছিল ঃ আসলে, তুই বুড়িয়ে গেছিস প্রিয়। যে স্পোর্টসম্যান সে কি কখনো ছোটখাটো বাধা পেয়ে পেছিয়ে পড়ে! লড়ে যায় শেষপর্যন্ত—

পায়ের তলায় মখমলের মত নরম ঘাসে-ছাওয়া মাটি। প্রিয়তোষের বুকের অতল থেকে খানিকটা বাতাস বুড়বুড়ি কেটে উঠে এল। অমুর কথা মনে পড়ে গেল তার। ছেলেটা শেষপর্যন্ত লড়ে গিয়েছিল। থামে নি। লড়তে লড়তে এই বাংলাদেশেরই কোথাও এমনি ঘাসে-ছাওয়া মাটিতে রক্তবমি করতে করতে প্রাণটাকে উগরে দিয়েছিল।

প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু হল। কিছুই চোখে পড়ছে না অন্ধকারে। তবু, ঝুঁকে হাত বাড়াতে ঘাসে-ছাওয়া মাটির স্পর্শ পেল সে। যেমন পেত একসময়। যখন ফুটবলার ছিল। খেলা শুরু হবার আগে জার্সি পরে মাঠে নেমে এমনি ঝুঁকে মাটি স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাত সে।

এখন, ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়। বর্ষা শেষ হয়ে আসছে। একমুঠো ঘাস টেনে তুলল প্রিয়তোষ। ঘাসের সঙ্গে কিছু চোরকাঁটা উঠে এল হাতে। শুকনো চোরকাঁটা। মনে পড়ে গেল প্রিয়তোষের, চোরকাঁটা শুকিয়ে গেলে সেবারের মত খেলার মরশুম শেষ হয়ে আসে।

কান্নার মত করে নীরবে হাসতে চাইল প্রিয়তোষ। ললিতমোহন বেশ বলেন ঃ এখন ঘোর কলি। মানুষ মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে হে! দুনিয়াটা একটা আজব কয়েদখানা!

প্রিয়তোষ একটা সিগ্রেট ধরাল। দেশলাই-কাঠি অন্ধকারে জ্বলে উঠতে তীক্ষ্ণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রিয়তোষের মুখ।

সে ফের চলতে লাগল। তার পদক্ষেপ ক্রমশ সুসম হয়ে উঠছিল। মস্তিষ্ক উষ্ণতা পাচ্ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া নতুন করে ভাবতে শুরু করল প্রিয়তোষ।

সুহাসিনীর মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। অব্যক্ত বেদনায় প্রিয়তোষের বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠল। সবকিছু তচনচ হয়ে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে সব। তবু এখনো কি আশায় বুক বেঁধে আছেন সুহাসিনী! এখনো কাক-ডাকা ভোরে উঠে উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। স্নান করে ঠাকুরের সিংহাসনের কাছে বসছেন জোড়হাতে; সন্ধ্যা হলে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে তারাদের ফুটে ওঠা লক্ষ্য করে আঁচলে গিঁঠ দিচ্ছেন। দুপুরের দিকে ছুটে যাচ্ছেন কালীতলায়। প্রসাদী ফুল নিয়ে এসে ছোয়াচ্ছেন মুমূর্ষু ললিতমোহনের মাথায়। কি আশায়! তবে কি সুহাসিনী এখনো সুদিনের স্বপ্ন দেখেন। এখনো—

প্রিয়তোষ জ্বলন্ত সিগ্রেটটা সজোরে ছুড়ে দিল মাটিতে। না, সবকিছু সে ব্যর্থ হতে দেবে না। দিতে পারে না। অন্নুর বুকের রক্ত। সুহাসিনীর স্বপ্ন। ললিতমোহনের সারাজীবনের সংগ্রাম। কিছুতেই না।

প্রিয়তোষ ফের দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকল। যেন, এখনই হুইসেল বেজে উঠবে। খেলা সুরু হয়ে যাবে নতুন করে।

দমবন্ধ করে প্রিয়তোষ ভাবতে চাইল: সুহাসিনী এখন কোথায়! বাতাবীলেবু গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। তার ফেরার অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন। প্রিয়তোষের সাড়া পেলেই আলুথালু ছুটে আসবেন। যেমন ছুটে আসেন প্রতিদিন। এসে ছোট্ট একটা প্রশ্ন করেন, কিরে প্রিয়, অন্নুর কোন খবর পেলি?

আজ আর মাকে এড়িয়ে যাবে না প্রিয়তোষ। ললিতমোহনের

কথাই ঠিক। তিনি বলেন : এড়াতে চাইলেই কি এড়ানো যায় রে? যা সত্য তাকে বেশিদিন আড়ালে রাখা যায় না। বরং, সত্যকে গোপন করতে গেলে সংকট আরো বেড়ে যায়।

বুকের ভেতর বজ্রপাত হলেও প্রিয়তোষ টলবে না। না, আজ আর সে গোপন রাখবে না কিছু। সে মাকে বলবে সরাসরি। যতই কঠিন হোক না কেন সেকথা। মা, মিথ্যে তুমি অমুর আশায় পথ চেয়ে বসে আছো। অমু কোনদিন ফিরবে না। অমু বেঁচে নেই মা।

আগের সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল প্রিয়তোষ। একবার চোখ তুলে তাকাল চারপাশে। বাড়ি ফেরার দিকটা নিশ্চিতভাবে ঠাহর করে নিল। তারপর, রণপা পরে দ্রুত গতিতে মানুষ যেমন এগোয়,— তেমনি সে বড় বড় পা ফেলে অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে, এগুতে লাগল সামনের দিকে।